ভারত—দেশ ও দেশবাসী

পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ

শচীন্দ্রলাল ঘোষ
অনুবাদ
শিশির কুমার সরকার

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, নয়াদিল্লি

ভূমিকা

1947 সালে ঐতিহাসিক বঙ্গভূমি দ্বি-খণ্ডিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। জন্মলগ্ন থেকেই রাজ্যটি নানা বাধা-বিঘ্নে বিকল। রাজ্যের ভাগে পড়েছে অখণ্ড বাংলার এক তৃতীয়াংশ জনাকীর্ণ শিল্প অঞ্চল। তার ওপর আগে থেকেই ছিল অর্থনৈতিক সঙ্কট, সমাজ-ব্যবস্থায় বিপর্যয়—যেগুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আরো প্রকট হয়ে আসছিল। কৃষিবহুল দু' তৃতীয়াংশ নাগালের বাইরে চলে গেল, অথচ দলে দলে উদ্বাস্তুদের আগমন হতে থাকল আগেকার পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আর ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে ভিড় জমাতে লাগল চাকবির উমেদাররা। এসব মিলে পশ্চিমবঙ্গের লোক সংখ্যা আরো বাড়তেই লাগল। অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা ছিলনা, তাই ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি। প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যেরও অকুলান ছিল। এসবের পরিণতি 1966 সাল থেকে তীব্রভাবে প্রকাশ পেল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শিল্প কেন্দ্রে ও সমাজের অন্যান্য স্তরে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা বিবেচনা করে গভর্ণমেণ্টের অবশ্য কর্তব্য ছিল অর্থনৈতিক পুনরুন্নয়নের জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে জোরদার পরিকল্পনা গ্রহণ করা, দুঃস্থ মানবের ডাকে সাড়া দেওয়া। পশ্চিমবঙ্গের সমস্যার আসল কথাটা হল এই যে, 1947 সাল থেকে যেটুকু উন্নতি হয়েছে—উন্নতি যে কিছুটা হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই—তা জীবিকার সংস্থানে ও খেয়ে পরে বেঁচে থাকবার মত বেতন দেবার বৃহৎ প্রয়োজনের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। দেরিতে হলেও গভর্ণমেণ্ট বাস্তব অবস্থাটা এতদিনে বুঝতে পেরেছেন, কাজও সে-মতো শুরু হয়েছে। 1971 সাল থেকে এক নতুন আশার আলো দেখা দিয়েছে। জনগণের ভিতর সহযোগিতার একটা নবচেতনা দেখা যাচ্ছে, তাদের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি প্রকট হচ্ছে সাংস্কৃতিক ও বিচারবুদ্ধিমূলক নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াকলাপে। আর এগুলিই তো দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি পুনরুজ্জীবনের আশার আলো দেখিয়ে চলবে।

যে ঐতিহ্য ও ঐতিহাসিক-সংস্কার-চেতনা বাঙ্গালীর চরিত্রকে স্বকীয় বৈশিষ্টমণ্ডিত করেছে, সে বিষয়ে বাঙ্গালীও অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসীদের মতোই গভীরভাবে সচেতন। এই ছোট পুস্তিকাখানায় পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সংস্থান, ইতিহাস, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা ও বর্তমান সমস্যাগুলির একটি মোটামুটি চিত্র আঁকবার প্রয়াস আছে। তথ্যগুলি সরকারী ও প্রামাণিক বেসরকারী সূত্রে প্রাপ্ত। গ্রন্থকার নিউদিল্লীস্থিত পশ্চিমবঙ্গের তথ্য-অধিকারক শ্রী পি. কে. ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তথ্য-চয়নে তাঁর প্রভূত সহায়তার জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শচীন্দ্রলাল ঘোষ

সূচীপত্র

চিত্র-সূচী

প্রদেশ—পশ্চিমবঙ্গ

1947 সালের ভারতীয় স্বতন্ত্রতা আইন ও র‍্যাডক্লিফের রোয়েদাদ অনুযায়ী ব্রিটিশ ভারতের অখণ্ড বাংলাদেশ বিভক্ত হল পশ্চিমবঙ্গ ও তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে। 1947 সালের 15 আগষ্ট ভারতের অঙ্গীভূত প্রদেশ হিসেবে এমনিভাবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি হল। উত্তরে সিকিম ও ভূটান, পূর্বে আসাম ও বাংলাদেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে উড়িষ্যা, বিহার ও নেপাল একে ঘিরে আছে। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের তিনটি আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা—উত্তরে, পূবে, পশ্চিমে। রাজ্যটির স্থিতি উত্তর অক্ষাংশের 27.13'15" ও 21.25'24" এবং পূর্ব-দ্রাঘিমার 85.48'20" ও 89.53'-4" এর অন্তর্বর্তী।

বিভাগের সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ছিল মোট 78,000 স্কোয়ার কিলোমিটার —শাসন-ব্যবস্থায় 14টি জেলায় ভাগাভাগ করা। 1950 সালে দেশীয় রাজ্য কুচবিহার ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সে-এলাকাও এসে গেল। 1954 সালে চন্দন নগর নামের ফরাসী উপনিবেশটুকু পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গীভূত হয়। তারপর 1956 সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইন অনুযায়ী পাশের কয়েকটি বাংলা ভাষাভাষী বিহারের এলাকা নিয়ে আরো দুটো জেলার সৃজন হল। পশ্চিমবঙ্গের এখনকার মোট আয়তন 87,676 স্কোয়ার কিলোমিটার (34,214 স্কোয়ার মাইল), 1971 সালের লোকগণনা মতে মোট জনসংখ্যা 44,440,095।

রাজ্যটির প্রশাসনিক জেলা 16টি,—তিনটি বিভাগ সমষ্টিভুক্ত করা। জেলাগুলির নাম এই :—বর্ধমান বিভাগ—বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া ; জলপাইগুড়ি বিভাগ—কুচবিহার, দার্জিলিং, পশ্চিম দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও মালদহ ; প্রেসিডেন্সী বিভাগ—কলকাতা, হাওড়া, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া ও 24 পরগণা।

1947 সালে এক ভাষাভাষী বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ভাগ হল দুটি স্বাধীন ভূমিখণ্ডে। সংখ্যাগুরু অমুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ভারতভুক্ত হল আর পাকিস্তানে গেল মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ। দুইদেশের সীমা-রেখা স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ্ নামে একজন ইংরেজের সালিশি অনুযায়ী প্রধানত সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর নির্ধারিত হল। দিনাজপুর, মালদহ, নদীয়া ও যশোহর জেলাগুলিকে ভাগ করতে হয়েছিল। কিন্তু শাসন-ব্যবস্থার সুবিধের জন্য এবং আরো অন্যান্য কারণে অমুসলমান প্রধান খুলনা ও মুসলমান প্রধান মুর্শিদাবাদ জেলা যথাক্রমে পূর্ব-পাকিস্তানের ও পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়ল। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন শেষমেষ দাঁড়াল

অবিভক্ত বাংলার তিনভাগের একভাগ। দুটো খণ্ড। উত্তরখণ্ডের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও পরে কুচবিহার জেলার সঙ্গে স্থল পথে রাজ্যটির বাকি অংশের যোগাযোগের পথ প্রায় কিছুই রইলনা—পার্শ্ববর্তী বিহার প্রদেশর মাঝ দিয়ে ছ'ড়া। দিনাজপুর জেলার নকশালবাড়ির কাছে মাত্র এক চিলতে 15 কিঃ মিঃ ভূমিভাগ দুই অংশের যোজনার কাজ করত। ওই জেলার একটি বড অংশ পূর্ব-পাকিস্তানে পড়েছে মুসলমানদের স্থানীয় সংখ্যা-গরিষ্ঠতার জন্য। আরো দূরে, দক্ষিণ খণ্ডে, রাজ্যটিকে আবার কার্যত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মধ্য অঞ্চলটি মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর নিয়ে একটি ছোট ভূমিখণ্ড, যার সঙ্গে বৃহদায়তন দক্ষিণভাগের একটি অতি সরু যোগভূমি হল ফরাক্কায়। এই যোগভূমিটি দিয়ে গঙ্গা নদী বয়ে যাচ্ছে দু'ভাগ হয়ে—একটি হচ্ছে ভাগীরথী (হুগলী নদী) পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে, আর একটি পদ্মা—চলে গেছে বাংলা দেশে। নদীর এই দু'টি ধারারই সঙ্গম স্থল বঙ্গোপসাগর।

গোটা ব্যাপারটাই নিঃসন্দেহে একটু জোড়াতালি দেওয়া গোছের ছিল। ছোট রকমের হলেও বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিহিত হল 1956 সালের রাজ্য পুনর্গঠন আইনে। ভাষাগত কারণে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার পূবদিকের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের সামিল হল। এরূপে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও উত্তরভাগের ভিতর একটা মোটামুটি কাজ চলা গোছের যোগ-সেতুর ব্যবস্থা হল। বিহারের পুরুলিয়া জেলার একটা মোটা অংশও ভাষাগত কারণে এদিকে এসে গেল। এমনি করে সংশোধিত হয়ে হয়ে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রূপায়ণ হয়েছে। আসামের বাংলা ভাষা-ভাষী গরিষ্ঠ গোয়ালপাড়া জেলা কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এসে যায়নি। ভাষাগত ভিত্তিতে রাজ্যগুলির এলাকার পুনর্বিন্যাস এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের মন জুগিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-দক্ষিণে লম্বায় প্রায় 600 কিঃ মিঃ। চওড়ায় সব চেয়ে আয়ত প্রশস্ত বিন্দুতে 300 কিঃ মিঃ। মানচিত্রে রাজ্যটাকে দেখায় একটা বেঢক জন্তুর মত—চাপা, লম্বা মাথা, হাডগিলে গলা, ক্ষীণ মধ্যাম, সরু কোমর, তলার দিক বেজায় মোটা।

প্রাকৃতিক গঠন

ভৌমী পশ্চিমবঙ্গের বেশীর ভাগটাই সমতল, পলিমাটির তৈরি। মোটামুটি এর মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল গাঙ্গেয় ভূমি। সম্ভবত এদেশ ঐতিহাসিক গঙ্গারাষ্ট্রের বা গঙ্গারিডির (গঙ্গা হৃদি) অংশীভূত ছিল। দার্জিলিং জেলার উত্তর ভাগটা পাহাড সংকুল, কোথাও বা সুউচ্চ পর্বত। এর উত্তর সীমা ঘিরে হিমালয় পর্বতমালা থাকে থাকে চলে গেছে। উচ্চ পর্বতশ্রেণী নিচের দিকে পাহাড় শ্রেণীতে নেমে নেমে এসেছে। জলপাইগুডির সীমানায় পৌঁছে পাহাড়গুলি গড়ান গতিতে ডুয়ার্সের সাঁৎসেঁতে সমভূমিতে বিলীন হয়ে গেছে। নেপালের সীমায় সিঙ্গালিলা পর্বতশ্রেণী প্রায় 3,700 মিটার উঁচু, ঘন বনময়। প্রচুর রডোডেনড্রন ফুলের গাছ। পর্বতমালা

যখন নেমে নেমে সমতলভূমি স্পর্শ করেছে, তখন নিবিড় বনরাজি কুঞ্জকাননের রূপ নিয়েছে—স্থান হয়েছে চা-বাগানের। নিচের দিকে তরঙ্গায়িত সমতলভূমির এখানে সেখানে ছোট ছোট অরণ্যময় পাহাড়, আর পূর্ব-হিমালয় থেকে নেবে আসা অগণিত উচ্ছ্বলা নদী। ডুয়ার্স-এর বনরাজি চিরসবুজ ঘন লতাগুল্মে সমাচ্ছন্ন। সেখানে আছে বন্য পশু—যেমন রয়েল বেঙ্গল টাইগার, গণ্ডার, হাতী, হরিণ, অজগর ও অন্যান্য সাপ। ধ্বংসকামী শিকারীদলের অনধিকার প্রবেশে বন্য-পশুকুল এতটা নিঃশেষ হয়েছে যে তাদের রক্ষার জন্য জলঢাকা নদী অঞ্চলে একটি সংরক্ষিত পশু নিবাস তৈরি করতে হয়েছে।

মালদহ ও পশ্চিম-দিনাজপুর জেলা নিয়ে মালদহ অঞ্চলের মধ্যভাগ বা "মালদহ-ঝোলা" ভৌগোলিক হিসেবে নিচের গাঙ্গেয় উপত্যকার চেয়ে আরো বেশি পুরাকালের বলে এর ভূমি-ভাগের উচ্চতা একটু বেশি। পাহাড়ী নদী একে অবিরাম জলের যোগান দেয়। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় পাহাড়ী নদী হল সর্পিল-গতি মহানন্দা। মহানন্দা ফরাক্কার একটু সামনে বাংলাদেশে গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে।

দক্ষিণ ভাগের সুরু হয়েছে উত্তরদিকে, যে—স্থান থেকে গঙ্গানদী মালদহ-মুর্শিদাবাদের সীমা নির্দেশ করে দিয়েছে। এই ভূভাগে আছে ভৌগোলিক হিসেবে বেশ স্পষ্ট দুটি অঞ্চল। যাকে বলা হয় "পশ্চিম মালভূমির ঝালর বা প্রান্ত", তাহল পুরুলিয়া জেলা আর বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম অংশ নিয়ে। এই মালভূমির সবচেয়ে উঁচু ডগা পুরুলিয়া জেলার গোরাবুরু পাহাড়। এই স্থানটি উচ্চতায় 677 মিটার। সবচেয়ে নিচু পয়েন্ট সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে 85 মিটার উপরে এবং মেদিনীপুর জেলায় এইখানেই মালভূমিটির শেষ। সুবর্ণরেখা নদীর উত্তর তীরে উচ্চতা এসে দাঁড়িয়েছে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 50 মিটার উপরে। এই মালভূমি উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় করদ রাজ্যপুঞ্জের শেষ অংশ। ভৌগোলিক ভাবে যে বিন্ধ্য পর্বতমালা ভারতবর্ষকে আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যে (ডেকান) ভাগ করেছে এই মালভূমির ভিতরই সে পর্বতমালা বিলীন হয়ে গেছে।

দক্ষিণ ভাগের বাকী অংশটা একটা বিস্তির্ণ পলিমাটির দেশ। বস্তুত, পশ্চিম মালভূমি-প্রান্ত এবং দার্জিলিং জেলার পাহাড় শ্রেণীর নিচুর দিকটা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সমস্তটাই একটা নিরবচ্ছিন্ন সমতলভূমি। মুর্শিদাবাদ জেলার উপরদিক থেকে প্রবাহিত গঙ্গানদীর দুই শাখার একটি হল ভাগীরথী (হুগলী)। এই ভাগীরথী নদী দক্ষিণ অঞ্চলটিকে দু'ভাগে ভাগ করেছে। হুগলী নদীর পশ্চিম তীরের সমতল ভূমিভাগের অনেকখানিই নদীর পলি থেকে উদ্ভূত। এই পলি বয়ে নিয়ে এসেছে হুগলী নদীতে মেশা একগুচ্ছ পাহাড়ী নদী। এদের উৎপত্তি স্থান পশ্চিমী পর্বতমালা। এই ভূমিভাগ গাঙ্গেয় বদ্বীপের অংশবিশেষ। এই নদীগুলির প্রধানটি হল দামোদর—যাকে বলা হয় বাংলার "অশ্রুনদী"। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলা

দেশ—এই উভয় দেশে বয়ে-যাওয়া গঙ্গার উপনদীগুলি হুগলী নদীর পূর্বতীরের সমতল ভূমিভাগ ধৌত করে যাচ্ছে। এই সমতল ভূমিভাগগুলির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এগুলিতে মাঝে মাঝে অগভীর জলের হ্রদের মত থাকে, যাকে 'দহ' বা বাঁওড় বলা হয়। নদীর শাখা প্রশাখা কোথাও কোথাও উপরে ও নীচে পলিমাটি বা তলানিতে রুদ্ধ হয়ে গিয়ে এগুলির সৃষ্টি করে। সমতল ভূমিভাগগুলির আর একটা বৈশিষ্ট্য হল 'বিল' নামের নিচু জলাভূমির সৃষ্টি হওয়া। এগুলি বর্ষাকালে জলমগ্ন হয়ে যায়।

নদীর প্রান্তভূমিরও দু'রকমের বৈশিষ্ট্য আছে। হুগলী নদীর পশ্চিমে কাঁথি নামে মেদিনীপুর জেলাস্থিত সমুদ্র তীরবর্ত্তী অঞ্চলে দেখা যায় বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ী ও বিল। তার মধ্যে মধ্যে কেয়াগাছের ঝোপ-ঝাড়। এর ফুল থেকেই বিখ্যাত কেওড়া গন্ধ-সার তৈরি হয়।

সুন্দরবন

সমগ্র 24 পরগনা জেলার প্রায় এক চতুর্থাংশ এবং দক্ষিণ ভাগের সমস্তটা নিয়ে হুগলী নদীর মোহানা। এই মোহানায়ই অবস্থিত বৈশিষ্ট্যময় গ্রীষ্মপ্রধান ভূভাগ-সুলভ সুন্দরবন। এই বনের বেশির ভাগটাই কিন্তু পড়েছে লাগোয়া বাংলাদেশের জেলা খুলনা ও বরিশালে। এই অঞ্চলটি পুরোপুরি পলিমাটির এবং প্রধান প্রধান নদীপথ থেকে বেরিয়ে আসা ছোট ছোট নদী প্রবাহের তন্তুজালে কন্টকিত। প্রায় সমগ্র অঞ্চলটিই জলাভূমি ও চোরাবালিতে ছাওয়া। সমুদ্রের খুব কাছে জঙ্গলগুলি নিবিড় ও দুর্ভেদ্য। সুন্দরী গাছের বর্শার মতো সুচালো ডাল অতর্কিত ভাবে বিঁধে যায়। আর জমিও জলকাদায় জবজবে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিতাবাঘ, গণ্ডার, বন্যশূয়র, হরিণ, বানর, অজগর, নানাজাতের গোখরো কেউটে ও অন্যান্য সাপ এবং বিবিধ প্রকারের পাখীতে সুন্দরবন পরিপূর্ণ হয়ে আছে। নদী ছেয়ে আছে কুমীর, হাঙ্গর ও নানাপ্রকার মাছে। যদিও জঙ্গল আছে বলে তীরভূমি ভাঙ্গন থেকে খানিকটা রক্ষা পায়, তবু প্রায়ই জোয়ারের সময় সমুদ্রের নোনাজলের আক্রমণ আর বর্ষাকালে নদীর প্রবল জলপ্রবাহ জঙ্গল-প্রান্তের ভূমিভাগের দৃশ্যপট প্রায়ই অনেকটা বদলে দেয়। এখানে মানুষে আর প্রকৃতিতে একটা বিরামহীন সংগ্রাম চলছে ধানী জমিকে লবনাক্ত জল আর সমুদ্রের অতি দ্রুত ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করবার জন্য। বড় বড় মাটির বাঁধ তৈরী হচ্ছে কৃষি-জমিগুলি ঘিরে। মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রমে এই চকগুলিকে রক্ষা ও দৃঢ় করছে বিক্ষুব্ধ নদীর আক্রমণের বিরুদ্ধে। পশ্চিমবঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির প্রবল চাহিদার জন্য বনভূমির বাইরের দিকটা দ্রুতগতিতে বৃক্ষশূন্য হয়ে আসছে।

দামোদর ও হুগলী নদীর মধ্যভাগে বাংলাদেশের সীমা অবধি পেছনদিককার ভূমিভাগে ছড়িয়ে আছে হুগলী নদীর মৃত ও মৃতপ্রায় জলপ্রবাহগুলি। ভূগোলবিদগণ এই ভূমিভাগকে বলেন 'মরিবান্ড ডেলটা' অর্থাৎ মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ।

জলপ্রবাহের গতিমুখ বদলে যাওয়ায় এবং গেল-শতাব্দীতে ভাগীরথীর স্রোতো-পথের গতি পরিবর্তন হেতু রাজ্যের কৃষিসমৃদ্ধির অবনতি ঘটেছে। বাংলাদেশেও এই সমস্যা অনুরূপ ভাবে আছে। সমস্যাটির মোকাবিলা করছেন পূর্ত বিজ্ঞান-বিশারদগণ।

ভূমিখণ্ডের জন্ম হল কী ভাবে

পশ্চিমবঙ্গের উত্তর সীমান্তের হিমালয় পর্বতমালাকে ভূতত্ত্ববিদগণ লক্ষকোটি বৎসরের ভূ-পরিবর্তন পরম্পরায় একটা অর্বাচীন সৃষ্টি মাত্র বলে মনে করেন। এ পর্বতমালা ছাড়াও আছে মধ্যপশ্চিম অঞ্চলের মালভূমি-প্রান্ত। এ মালভূমি গঙ্গোয়ানা নামে পরিচিত ভূ-ভাগের অংশবিশেষ। গঙ্গোয়ানা ভূ-ভাগটি পৃথিবীর খুব পুরানো পৃষ্ঠতল। এই পৃষ্ঠতলের সৃজন হয়েছিল যখন আমাদের এই পৃথিবী সবে নতুন এবং হিমালয় থেকে আজকালকার বঙ্গোপসাগর অবধি সমস্ত ভূ-ভাগটা যখন ছিল একটা বিস্তীর্ণ সাগর যার নাম দেওয়া হয়েছে 'টেথি সী'। পৃথিবীর পৃষ্ঠতল যখন প্রচণ্ড উত্তপ্ত ছিল এবং জীবজগতের ও পরে মানবজীবনের সৃষ্টি ও স্থিতির অনুকূলে ক্রমশ শীতল হয়ে আসছিল, তখন সংকোচনের চাপের উৎক্ষেপণে ঐ উঁচু শৈলান্তরীপের রকমারি পরিবর্তন হয়ে যায়। মালভূমি-প্রান্তের নিচু স্তরটা তল এই পুরানো পাথরস্তূপের গাঁথুনি। গঙ্গোয়ানা পাথরস্তূপের লাইনটা বস্তুত মাটির অতলতল দিয়ে পূর্বদিকে চলে গেছে এবং আবার মাথা তুলেছে গিয়ে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে যথাক্রমে আসাম ও মেঘালয়ের গারো ও খাসিয়া পাহাড় রূপে। এই হল ভূতত্ত্ববিদদের রত্ন-ভাণ্ডার—যার কোঠায় কোঠায় ধাতব-তেলের সমাবেশ আছে বলে অনুমান করা হয়।

প্রবল বারিপাতে এবং অবিরাম ঝড়ঝাপটায় সেই বহু প্রাচীন শিলাখণ্ডস্তূপের খাঁজগুলি পাথর-কুচিতে ভর্তি হয়ে হয়ে পরে শক্ত পাথরের সামিল হয়ে যায়। এমনিধারা ঘটেছিল মালভূমি প্রান্তেও, আর তারই জন্য আজ সেখানকার এত খনিজ সম্পদ। হিমালয় এবং উত্তর দিকের পাহাড়ী এলাকা যে-শ্রেণীর পাথর দিয়ে গড়া তা অপেক্ষাকৃত নতুন। ঐ যুগের অঙ্গার উৎপাদক গাছগাছড়া—যেগুলি পরে মাটির স্তরের নিচে একেবারে তলিয়ে গিয়েছিল—সেগুলি উত্তাপে এবং চাপে কয়লাতে রূপান্তরিত হল। ঐ কয়লার সমাবেশ মধ্য মালভূমি অঞ্চলে ও নিম্ন-হিমালয়ের কোন কোন এলাকায় দেখা যায়।

পুরাতন 'টেথি সী'র উত্তর ভাগে যখন হিমালয় পর্বতের গঠন হতে লাগল তখন জলের বড় বড় খাতগুলিতে ধোয়াট মাটির সমাবেশ হয়ে হয়ে ভূমি-ভাগের সৃজন হল এবং প্রবল জল প্রবাহ ঐ মাটিকে ভূমিকম্প ও বরফ শীতল থেকে উষ্ণ আবহাওয়ার নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে বঙ্গভূমি-স্থানে চালান করে দিতে লাগল। বঙ্গভূমি-স্থানের উপরস্থ তখনকার সাগরজল ঐ মাটিতে চাপা পড়তে সুরু করল। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগে হিমালয়জাত দুই নদী—গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র—তাঁরাও এলেন,

তাঁদের মিলিত ধোয়াট মাটি সাগরজলে ঢেলে ঢেলে সৃজন করলেন পলিজ বঙ্গদেশ প্রাঙ্গণ। পশ্চিমবঙ্গের ভূমিভাগের বেশির ভাগটা গঙ্গা নদীর দৌলতেই গঠিত হয়েছিল। আশ্চর্য নয়, গঙ্গাকে তাই দেবরূপে ভজনা করা হয়---মা গঙ্গা, যিনি মানুষকে মুক্ত করেন পাপ থেকে অশুচিতা থেকে।

নদ-নদী আর জলপথ

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার পাহাড-অঞ্চল তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীর গভীর খাত দিয়ে দু'ভাগ করা। এই নদীর গতি উত্তর থেকে দক্ষিণে, নদীর খাত থেকে দু'তিন কিলোমিটার উঁচু পাহাড়ী তটের ভিতর দিয়ে। এই নদী কয়েকটি ছোট ছোট জল-প্রবাহ দ্বারা পুষ্ট হচ্ছে, কিন্তু এদের প্রধানটি হল রঙ্গিত জলপ্রবাহ। রঙ্গিত কিছুদূর অবধি জেলাটির উত্তর সীমানা নির্ধারণ করছে। তিস্তা নদী দার্জিলিং-এর দক্ষিণে সেভোক নামক স্থানে সমতল ভূমিতে ছাডা পেয়ে পবল বেগে বয়ে চলেছে সোজা-সুজি দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং শেষে মিলে গেছে বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র নদের সঙ্গে। তিস্তা নদী থেকে ছোট, হিমালয় জাত, অন্যান্য নদী হল জলঢাকা, তরশা, সংকোশ ও রায়ডাক। এদের মধ্যে তরশা (দোর্দণ্ড) হল ভয়ানক বিক্ষোভপূর্ণ। কতবার এর উপর গড়া ভারী কংক্রিট সেতু ভাসিয়ে নিয়ে গেল! হিমালয়ের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জল-নিকাশী নালীগুলির প্রায় সমস্ত বর্ষার জল কুড়িয়ে নিয়ে এই নদীগুলি বর্ষাকালে উদ্দাম মূর্তি ধারণ করে। নিচের সমতল ভূমিভাগে শুকনো ঋতুতে নদীগুলিতে জলযান চলাচল করতে পারে, কিন্তু সব সময়েই এদের বিশাল বিস্তার ভয় জাগিয়ে তোলে। তিস্তা তো জায়গায় জায়গায় পাঁচ কিঃ মিঃ চওড়া।

মহানদীর উৎস দার্জিলিং শহরের নিচে "ডাউ হিল ফরেষ্টের" ঝরণাগুলি থেকে। মহানন্দা পাগলাঝোরা নামক সুদৃশ্য জলপ্রপাত সৃষ্টি করে পড়েছে দক্ষিণ দার্জিলিং জেলার ঢালু সমতলে। এর তিনটি এরকম উপনদী আছে—বালানদী, বালাসন আর মশচ্ছি। মহানন্দা মালদহ জেলার ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে এসে পড়েছে বাংলাদেশে, পদ্মায়।

মহানন্দা আর তার সঙ্গে সমতলের নদী টাঙ্গন, পুনর্ভবা ও আত্রাই পশ্চিমবঙ্গের মধ্য অঞ্চলের জলের যোগান দিচ্ছে। প্রথম দুটি একত্র মিলে পরে এসে পড়েছে মহানন্দায়। আত্রাই মিলেছে পদ্মার সঙ্গে, বাংলাদেশে।

দুটি নদী শাখা প্রশাখা নিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে বয়ে যাচ্ছে। একটি আছে মালভূমি খণ্ড ও পশ্চিম দিকের গাঙ্গেয় সমতল ভূমির জন্য, আর অন্যটি শুধুমাত্র গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ভাগের জন্য। প্রথম অঞ্চলটিতে অনেক নদী পশ্চিম মালভূমি থেকে জন্ম নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব মুখী হয়ে ভাগীরথীতে গিয়ে পড়েছে। গঙ্গার প্রধান পশ্চিম-মুখী শাখা এই ভাগীরথী দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ঐ নদীগুলির সবচেয়ে উত্তরেরটি হল ময়ূরাক্ষী। ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর ও কোপাই এর উপনদী। নদীগুলি শুধু বর্ষাকালেই পূর্ণ থাকে এবং বাকী সারা বৎসর প্রায় শুকনো। ময়ূরাক্ষী বর্ধমান

জেলায় কাটোয়ার প্রায় 20 কিঃ মিঃ উত্তরে ভাগীরথী নদীতে পড়েছে। একটু দক্ষিণে অজয় নদ বিহারের পাহাড়ে জন্ম নিয়ে মালভূমি প্রান্তের ভিতর দিয়ে চলার পথে বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলার সীমা নির্দেশ করে কাটোয়ায় ভাগীরথীর সঙ্গে মিলেছে। এই নদীর মতিগতিও এ অঞ্চলের অন্যান্য পাহাড়ী নদীর মত—বর্ষাকালে উদ্দাম, বাকী সারা বৎসর প্রায় শুকনো। অন্য তিনটি ছোট নদী—খাড়ি, বাঁকা ও বেহুলা এককালে দামোদরের উপনদী ছিল, কিন্তু এখন পথহারা, আঁকা-বাঁকা। মালভূমি প্রান্তের সবচেয়ে বড় নদী দামোদরও বিহারের পাহাড়ে জন্ম নিয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে পরে দক্ষিণ মুখী হয়ে হুগলী নদীতে মিশে যাচ্ছে। দামোদর নদী পাহাড়ের বড় বড় নালী-নালা ক্ষেত্র থেকে বৃষ্টির জল বহন করবার সময় সঙ্গে নিয়ে আসে বহু পরিমাণ পলিমাটি। ঘন ঘন বন্যা ও উপনদীগুলির গতিপথ পরিবর্তনের জন্য বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায়ই ধ্বংস ও ছন্নছাড়া হয়ে যায়। এটা ঘটে শুধু ভাঙ্গনের ধ্বংস লীলায় নয়, কৃষিজমিতে কর্দমাক্ত বালুকার সমাবেশের জন্যও। এসব কারণে দামোদরকে বলা হয় বাংলার 'অশ্রুনদী'। দামোদরের স্রোতকে বশে আনবার জন্য মানুষের সুনিপুণ হাতের পরিকল্পনায় বর্ধমানের পানা-গড়ের দক্ষিণ থেকে হুগলী নদীর সঙ্গে দামোদরের সঙ্গমস্থল 24 পরগনার নিচুভাগে ফলতার বিপরীত দিক পর্যন্ত দুই পাড় ধরে বাঁধ বেধে দেবার ফল দাঁড়াল এই যে দামোদরের পলিমাটি নদীর বুকেই জমা হতে লাগল। নদীর গর্ভ তীরভূমিভাগের উপরে উঠে গেল। খর জলস্রোতের সময় বাঁধগুলি ভেঙ্গে গিয়ে জল উপচে পড়তো। তাতে আরো প্রবল বন্যার আবির্ভাব ঘটল। 1943 সালের ভীষণ বন্যায় কর্তাদের টনক নড়লো। আরো বেশি ক্ষতি যাতে না হয় তা তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন। ফলে হল, দমোদর ভ্যালী প্রকল্পের পরিকল্পনা এবং রূপায়ন।

আরো দক্ষিণে রূপনারায়ণ নদ। দ্বারকেশ্বর ও শিলাই অথবা শিলাবতী নদীর মিশ্রণে এর জন্ম। হুগলী নদীর মোহানার কাছে হলদিয়ায় এই নদী হুগলীর সঙ্গে মিলেছে। কোলাঘাট পর্যন্ত এর বিশাল পরিসরের কারণ হল জোয়ারের সময় মোহনার জলস্ফীতি। হলদিয়ার সুবিধাজনক পরিস্থিতির জন্য এখানে একটা বড় রকম জাহাজঘাটা এবং শিল্প সংস্থা বানাবার কাজ চলছে। এতে জাহাজ নির্মাণ স্থান, নৌ-ঘাঁটি, পেট্রোলিয়াম পরিশোধনাগার এবং সার-উৎপাদন কারখানাও থাকবে। আরো দক্ষিণে হল কংসাবতী বা কসাই এবং সুবর্ণরেখা নদী। সুবর্ণরেখার জন্ম উড়িষ্যার পাহাড়ে এবং উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের সীমানা পথ ঘিরে এ নদী বয়ে যাচ্ছে।

দক্ষিণবঙ্গের বাকী অঞ্চল রাজ্যটির ভূমিভাগের বেশি অংশ জুড়ে আছে। এটি গাঙ্গেয় উপত্যকায়। এখানে অগুন্তি জলনালী পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বেশীর ভাগ স্থানে ছড়িয়ে আছে। গঙ্গা উত্তর প্রদেশের পশ্চিমে হিমালয় থেকে জন্ম নিয়ে উত্তরের সমতল ভূমির উপর দিয়ে মধ্যহিমালয়ের নদীগুলির জলরাশি বহন করে নিয়ে আসছে। পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানায় রাজমহল পাহাড়ের মাঝ দিয়ে

এই নদী পশ্চিমবঙ্গের সমতলে পড়েছে। চলার পথে গঙ্গা পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলকে ঘিরে নিয়ে অনেকগুলি শাখানদীর সৃজন করে গেছে। মূল স্রোতধারাকে পদ্মা বলা হয়। পদ্মা বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলেছে। এই দুই নদীর—ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার—মিলিত জলরাশি জগতের একটি মহাকায় সঙ্গম, বালুকা-পলির ভিতর দিয়ে বাংলাদেশের নোয়াখালি জেলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে বিলীন হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের এলাকায় প্রধান শাখানদী হল ভাগীরথী। নিচের দিকে এর নাম ইংরেজরা দেন হুগলী। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর থেকে সুরু করে ভাগীরথী দক্ষিণগামী এবং কলকাতা বন্দরের পাশ দিয়ে সাগরে পড়েছে। সাগরমুখে হলদিয়ায় ভাগীরথীর সঙ্গে রূপনারায়ণের মিলন হয়েছে। অন্যান্য প্রধান শাখানদী—ভৈরব ও জলঙ্গী—এ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত বিশালকায় জলপ্রবাহ ছিল। ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগে আর্যদের আগমন ও মুসলীম আক্রমণ ভাগীরথী ও ভৈরবের গতিপথ অনুসরণ করেই চলেছিল। কিন্তু ভূকম্পন ও বেশি পরিমাণ পলিমাটি সমাবেশের ফলে ভূমি-পিঠের সমতলতার পরিবর্তন ঘটে। ফলে, ভৈরব, জলঙ্গী ও তাদের উপনদীগুলি নির্জীব হয়ে শুকিয়ে যায়। এমন কি ভাগারথীও একটা উপচে-পড়া নালার মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদ্মাই নিয়ে যাচ্ছে গঙ্গার জলরাশির বেশির ভাগ। ভাগীরথী পশ্চিমবঙ্গের জীয়ন-কাঠি; সুবৃহৎ কলকাতা বন্দরের বাস্তুদেবী। এই নদী জলযানের প্রধান অন্তর্দেশীয় গতিপথও। এজন্য ফারাক্কা বাঁধের পরিকল্পনা হল। এই বাঁধ শেষ হয়েছে মাত্র 1974 সালে। বাঁধটি ভাগীরথী নদীখাতে যথেষ্ট জলের যোগান দেবে যাতে করে ক্রমে ক্রমে জমে ওঠা পলিমাটি সহজভাবে উৎখাত করা সম্ভব হবে। বৃহদাকায় জাহাজ কলকাতা অবধি চলে আসবার এবং বড় বড় যন্ত্রচালিত জলযানের উত্তর-বিভাগের গভীরে প্রবেশ করবার পথও সুগম হবে। বাঁধের উপর দিয়ে একটা রাস্তা ও রেলওয়ে লাইন বসানো হয়েছে যার ফলে বিহারের মধ্য দিয়ে ঘোরানো রাস্তার উপর নির্ভর না করে এবং দেশ বিভাগের আগেকার বাংলাদেশের রাস্তা না নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য ও উত্তর অঞ্চল এবং আসামের সঙ্গে আবার সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

গঙ্গার শাখাগুলির শোচনীয় অবস্থার দরুন দামোদর এবং ভাগীরথীর মাঝের ত্রিকোণ ভূভাগ এবং উত্তর দিকটার যতদূর পর্যন্ত জোয়ারের জল ওঠে ততদূর জল-নিকাশন খুব কম এবং যে স্থানগুলি বদ্ধ জলের ছোট ছোট খানাখন্দে ভরা। ফরাক্কা বাঁধের ভিতর দিয়ে ভাগীরথীতে প্রচুরতর জল প্রবেশে জীর্ণ-উপনদীগুলি সজীব হবে কিনা তা সন্দেহ-জনক, কারণ, জলের সমস্তটাই দরকার হবে শুধুমাত্র ভাগীরথীর খাতকে চাঙ্গা রাখবার জন্যই।

24 পরগনা জেলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণাংশ জোয়ার-ভাঁটার খেলার স্থল। এখানে কখনো ভাগীরথী-হুগলী সাগরমুখী, আবার কখনো সাগর থেকে বিপরীতগামী। এই জোয়ার ভাঁটা নিয়মমত ছ'ঘণ্টায় পালাক্রমে আসে

যায়। কিন্তু মাত্র বর্ষাকালে প্রবল জলসম্পাতে যখন নদীর জল অববাহিকাগুলিতে উপচে পড়ে, তখন শুধু সাগরের দিকে জলের একমুখী গতিই থাকে। এই ঋতুতে মস্ত ভূ-ভাগ, প্রায় কলকাতা সহরতলীর কাছাকাছি পর্যন্ত, জল-প্লাবিত হয়। কিন্তু বিশেষ কোন বাধা না থাকলে বেনো জল তাড়াতাড়ি নেমে যায়। কিন্তু এরূপ বাধার সৃজন হয় যখন সংশ্লিষ্ট পয়ঃ-প্রণালীগুলি জোয়ার ভাঁটার আসা যাওয়ায় পলিমাটি-রুদ্ধ হয়ে যায়। আসল কারণটা হল, বর্ষা ছাড়া অন্য সময় ভাগীরথীতে জলের প্রবাহ ক্ষীণ থাকা। নদীর মূল ধারায় পলিমাটি সমাবেশে এমন সঙ্কটজনক অবস্থার সৃজন হয়েছে যে কলকাতা বন্দর অবধি জলপোত যাতায়াত খুব কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে সেখানে গড়ে উঠেছে বালুতট, আর সাগর থেকে নোনাজলের আক্রমণ 24 পরগনা জেলার বাইরে অবাধ হাত বাড়িয়েছে। সাগর-সঙ্গমের কাছাকাছি নদী নালাগুলি অবশ্যি চওড়া এবং পলিমাটি থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। বর্ষার শেষের ও শরৎকালের পূর্ণিমায় সাগর থেকে যে বান ডেকে আসে তা মোহানা অঞ্চলে কখনো কখনো ছ'মিটারেরও বেশি এবং আরো উপর দিকে, কলকাতায়, প্রায় তিন মিটার উঁচুতে ওঠে। এর রেশ 24 পরগনার সীমা অবধি অনুভব করা যায়।

এই অববাহিকা খণ্ডের অন্যান্য প্রধান জলপ্রবাহ হল মানগঙ্গা বা বড়তলা সপ্তমুখী, ঠাকুরাণ, মাতলা, গোসাবা এবং রায়মঙ্গল। রায়মঙ্গল দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্তরেখা চিহ্নিত করে আছে। সুদিনে সবগুলি জলনালী দেশী নৌকায় বা ষ্টিমারে ভ্রমণের পক্ষে নিরাপদ ও মনোরম। তখন শ্রীমণ্ডিত সুন্দরবনের এক পরমাশ্চর্য রূপ চোখে পড়ে। কিন্তু বর্ষায় এগুলি ভয়-ভীষণ—স্রোতের উদ্দামতায়। তার উপর আছে শরতের গোড়ার দিকে প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে ঘূর্ণিবাত্যা—কখনো কম কখনো বেশি। এই ঘূর্ণিবাত্যা যখন অতি উদ্দাম, তখন তার পেছনে পেছনে আসে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, যাতে ভেসে যায় নিম্নভূমির ভূমি—সম্পত্তি, বিনষ্ট হয় জন-জন্তু-জীবন। কিন্তু স্থানীয় লোকদের এমনধারা ঘটনা কম বেশী গা-সওয়া হয়ে গেছে। ভূমিভাগের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ এবং ধানের ফসল ফলানোর জন্য প্রকৃতির এই নির্দয় নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাদের অধ্যবসায় উচ্চতম প্রশংসার যোগ্য।

আবহাওয়া

পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া গ্রীষ্মমণ্ডলীয়। ক্ষণস্থায়ী শীতকালে ছাড়া সমতলভূমি গরম। উত্তরদিকের পার্বত্যদেশ যদিও সমুদ্রপিঠ থেকে উচ্চতা হেতু শীতল কিন্তু সেখানে আবার আবহাওয়ায় আর্দ্রতা বেশি। যদিও প্রাচীন সংস্কার অনুযায়ী বলা হয় ঋতু ছ'টি—বসন্ত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত (হাল্কা শীত) ও কনকনে শীত—আসলে কিন্তু প্রাধান্য মাত্র চারটি ঋতুরই—গ্রীষ্ম, বর্ষা, বর্ষা-উত্তর শরৎ, আর শীত। গ্রীষ্মকাল থাকে মার্চের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি অবধি। তখন

দিনের বেলার তাপমাত্রা রাজ্যটির বিভিন্ন স্থানে থাকে 38° সে থেকে 45° সে। সবচাইতে বেশি তাপ দেখা যায় মালভূমিপ্রান্তে এবং আসানসোল, দুর্গাপুর শিল্পসংস্থা এলাকায়। এই অঞ্চল শুকনো খটখটেও। বনজঙ্গল লোপাট করায় এবং অপেক্ষাকৃত বেশি শুষ্কতার দরুন এটা ঘটেছে। সুখের বিষয়, ওখানে রাত্রি-বেলাটায় স্বস্তি ফিরে আসে, তখন বঙ্গোপসাগর থেকে জলকণাবাহী শীতল দক্ষিনী হাওয়া বইতে থাকে। তাপমাত্রার উচ্চতা হেতু কখনো কখনো সমতল ভূমিতে নিম্নচাপের আবর্তন সৃষ্ট হয়, সকল দুঃখ কষ্টের পরিপূরণ করে হঠাৎ দেখা দেয় ক্ষণস্থায়ী "নর-ওয়েস্টার" বা কালবৈশেখীর ঝড়, সঙ্গে থাকে প্রবল বারিপাত। এই গ্রীষ্মকালীন ঝড় আবার লণ্ডভণ্ড করে যেতে পারে, কিন্তু মোটের উপর এটা কৃষিকাজের পক্ষে উপকারী। কারণ, এতে গরমী মৌসুমের ফল-ফলারিতে রসের যোগান হয়, প্রথম পর্যায়ের আউস ধান তাড়াতাড়ি পাকিয়ে তোলে, আর বর্ষাকালীন প্রধান শস্য ধান ও পাটের জমি চাষ করবার সুবিধে করে দেয়। দার্জিলিং জেলার পাহাড়গুলি গরমকালে সুশীতলতায় মনোরম। উঁচু টিলাগুলি কখনো কখনো ঘন কুয়াশায় ঢাকা থাকে! কিন্তু পরিষ্কার দিনগুলিতে বাঞ্ছিত দর্শন দান করে কাঞ্চনজংঘার মহামহিমময় তুষার কিরীট, সিকিমের পূর্ব প্রান্তের গিরিমালা এবং দিকে দিকে বনময় পাহাড়পুঞ্জ ও গিরিসঙ্কটের শ্যামলিমা।

জুনের মাঝামাঝি বর্ষা নেমে আসে মহা প্রতাপান্বিত রাজার মত—সঙ্গে থাকে নীল কালো মেঘ বাহিনী। খোদ বর্ষা আসবার প্রায় দু'সপ্তাহ আগে থেকেই ছোটখাটো বর্ষার আনাগোনা হতে থাকে। এগুলিকে বলে "ছোট মৌসুম" যা গ্রীষ্মের প্রখরতা কমিয়ে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বর্ষাধারা একমাত্র বঙ্গোপসাগরের মৌসুমী বায়ু থেকেই উৎপন্ন হয়। জলভরা মেঘ উত্তর দিকে চলতে থাকে এবং পরে হিমালয় প্রাচীরে ব্যাহত হয়ে পর্বতপৃষ্ঠে, ডুয়ার্সে মুষলধারে ভেঙ্গে পড়ে। এ স্থানগুলিতে রাজ্যের গড়পরতা বৃষ্টিপাতের চেয়ে অধিক বৃষ্টি হয়ে থাকে। এই গড়পরতা বৃষ্টিপাত সারা বৎসরে সাকুল্যে 178 সে মি ; বর্ষাকালের গড় হল 125 সে মি। উত্তরের পর্বতমালা বর্ষাকালে 400 সে মি এর অধিক বৃষ্টি পায়, ডুয়ার্স পায় প্রায় 300 সে মি, মালভূমি প্রান্ত 250 সে মি-এর কম এবং বাঁকুড়া জেলা গড়ে 218 সে মি। বাঁকুড়া জেলা অঞ্চলে অনাবৃষ্টি লেগেই থাকে। একমাত্র জলসেচনের খুব বড় গোছের কোন পরিকল্পনাই স্থানীয় কৃষিসম্পদের পূর্ণ-উন্মেষ ঘটাতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও উড়িষ্যা দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আওতায় পড়ে। মাঝে মাঝে বর্ষার বিরতি অসাধারণ ঘটনা নয়। ফল স্বরূপ, এসব স্থানে বর্ষাঋতুর বৈশিষ্ট বৈচিত্রপূর্ণ। বিশেষ করে ঋতুর শেষে বা শরতের প্রথমে, নিম্নচাপের বায়ুর সমাবেশ হয়ে ঘূর্নিবাত্যার সৃষ্টি হয়। সৌভাগ্যের বিষয়, আজকাল আবহাওয়াতত্ত্ববিদগণ বঙ্গোপসাগরের মধ্যে ঘূর্নিবাত্যার সংগঠন, গতিপথ, গতিবেগ ও কেন্দ্রস্থান নির্ণয় করতে সমর্থ হন। পূর্বাহ্লেই সাবধান করায় প্রবল ঘূর্ণিবাত্যার

ধ্বংসলীলা ও পরবর্তী জলোচ্ছ্বাস থেকে বহু ধনসম্পত্তি ও জীব-জন্তু রক্ষা করা সম্ভবপর হচ্ছে।

সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি আবহাওয়ায় একটা মনোরম পরিবর্তন সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হতে থাকে। বৃষ্টি বাদল চলে যায়, আকাশ পরিষ্কার ও নীলবর্ণ হয় আর তুলতুলে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে ভেসে যেতে থাকে। বন্যার নামগন্ধ নেই, নদীভরা কিন্তু প্লাবন ছাড়া, গরম স্যাঁতসেঁতে ভাবের জায়গায় থাকে পরম উপভোগ্য আরামদায়ক শীতলতা। শরতের বাংলায় পালা-পার্বণের মরশুম। মাঠে মাঠে সোনালী ধানে পাক ধরে, শরতের শেষে ফসল কাটার ধুমধাম। বাগবাগিচায়, বিলে, পুকুরে রাশি রাশি ফুল যাদের সেরা হল জলপদ্ম, কুমুদফুল। প্রথম প্রভাতে ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় মুক্তাবিন্দু শিশির কণা, যাকে লুটে নিয়ে যায় সূর্যকিরণ। এটা হল দুর্গাপূজা উৎসবের প্রথাগত ঋতু। তারপর আসে লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা আর দীপাবলী, যখন প্রতিটি হিন্দু ঘরেই সারি সারি দীপের মেলা। পালা-পার্বণের শেষ হয় ভাই-ফোঁটায় আর জগদ্ধাত্রী পূজায়। উৎসব আনন্দের পালা শেষ হতে হতেই নভেম্বরের মাঝামাঝি শীতের মরশুম সুরু হয়।

সমতলভূমিতে শীতকাল হাল্কা ধরণের। প্রায় তিন মাস স্থায়ী হয়, গড়ে সর্বনিম্ন তাপ ১৫° সে-র নিচে নামে না। শীতের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ঠাণ্ডা, শুকনো উত্তুরে হাওয়া যাতে আবহাওয়ার আদ্রতা বেশ কমে যায়। শীতকাল হল রবিশস্যের মরশুম। ডাল, আলু, শাকসব্জী, দার্জিলিংজাত কমলালেবু আর ইদানীং গম—এসব হল রবিশস্য। দিনের তাপমাত্রা কমে যায় বলে স্বাস্থ্যদায়ক রৌদ্রসেবন সম্ভবপর হয়। প্রায়শ ডিসেম্বরের শেষ এবং জানুয়ারীর পয়লা সপ্তাহে মেঘবৃষ্টির কিছুটা ঝামেলা এসে যায়। সেই দূরের আরব সাগর থেকে ধেয়ে আসা পশ্চিমী মৌসুমীবায়ুর আগমনই এর সূচনা করে। রবিহীন কনকনে ঠাণ্ডার দিনগুলির সাময়িক অস্বোয়াস্তির অবশ্য ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় কৃষিজাত শস্যের উপর বৃষ্টির জলের সুফল ফলনে। পাহাড়েই শীতের দাপটটা বেশি। বৃষ্টির দিনগুলিতে পর্বতের উঁচু সীমায় কখনো কখনো তুষার পড়ে, বরফ জমে।

ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকে আবহাওয়া উষ্ণতর হতে থাকে, আর তখন অল্পকিছু সময়ের জন্য বসন্তের আবির্ভাব ঘটে। পাতাঝরা গাছে গাছে তখন নতুন নতুন সবুজ পাতার সমারোহ, আর ফুলের বাহার। খুব বেশি চোখে পড়ে পলাশ আর শিমূল ফুল। এগুলি গ্রামাঞ্চলে রাশি রাশি ফুটে থাকে, চারিদিকে মহামহোৎসবের আবহাওয়া। যূথী, চামেলী, মল্লিকা, চম্পক প্রভৃতি অন্যান্য একটু সাধারণ রকমের অথচ সুগন্ধী ফুলের সজ্জাও এ-সময় দেখা যায়। কিন্তু এই মন্দমধুর দিনগুলি বড় ক্ষণস্থায়ী। ঝাঁ ঝাঁ করে গরম পড়ে, আর এপ্রিলের সঙ্গে সঙ্গে ভীমবিক্রমে দেখা দেয় চটচটে গ্রীষ্মকাল। আবার সুরু হয় বাৎসরিক ঋতুর পরে ঋতুর খেলা।

বাঙ্গালী জাতি

জাতির উপাদান

জাতির ঠিকঠিকুজীর কথা বলতে গেলে পশ্চিমবঙ্গবাসী ও অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে মিল দেখা যায়। মিলটি হল পাঁচটি পৃথক জাতিধারার সংমিশ্রণ। সর্বাধুনিক নৃতত্ত্ব-গবেষণা মতে এই জাতির সবচেয়ে পুরানো উপাদান অস্ট্রেলিয় জাতিধারা। এই আদি রূপটিকে কোনো কোনো বিশেজ্ঞরা বলে থাকেন 'নিষাদিক' এবং এটি খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় মালভূম-প্রান্তের আদিবাসীদের মধ্যে আর তারও ওদিকে ছোটনাগপুর ও মধ্য ভারতে। তাদের মাথা লম্বাটে, গায়ের চামড়া কালো, নাক মোটা, আর দেহের উচ্চতা কম। "নেগ্রিটোজ" বা "নিগ্রোয়িডস" ইত্যাদি নানা মার্কা মারা নাম তাদের দেওয়া হয়। এদের দৈহিক গঠনের বিশিষ্টতা সুস্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় প্রধানত চাষী এবং "অপরিচ্ছন্ন" জিনিষ নিয়ে যাদের কারবার এমন "নিম্নজাতে"র বাঙ্গালীদের ভিতর। এরা ইতিহাসের পূর্ববর্তী যুগে পশ্চিম না পূব থেকে এদেশে এসেছিল তা সঠিক বলা যায় না।

ভিন দেশীদের প্রবেশের পরবর্তী দফায় এল লম্বাটে মাথাওয়ালা জাতির লোক,—তাদের আরো উঁচু গড়ন, সূচলো নাক, উন্নত চিবুক আর কণ্ঠা। এরা দ্রাবিড় জাতীয়। এসেছিল বোধহয় উত্তর ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভাগ থেকে। এদের পিছু পিছু পারস্যের মধ্য দিয়ে এল পশ্চিম এশিয়া থেকে গোল মাথাওয়ালা সুমেরিয়ান বা আর্মানী। কোন সময় এই দুই জাতি বঙ্গদেশে এসেছিল এবং আদিবাসীদের সঙ্গে মিলে গিয়েছিল,—সে প্রশ্নটা থেকেই যাবে।

পরবর্তী দলের লোক যারা বঙ্গের পশ্চিমভাগে এসেছিল তারা গোল মাথা, আলপাইন বা ইন্দো-এরিয়ান জাতির। তাদের রং ফরসা, আধাবৃত্তাকার মুখ, ধারালো নাক এবং লম্বা দেহ। পঞ্চম জাতি ধারা মঙ্গোলিয়, এদের নিদর্শন মেলে পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অধিবাসীদের ভিতর—এটি তিব্বতী গোষ্ঠীগত। মঙ্গোলিয় কাটছাঁট উত্তরবঙ্গের জেলাসমূহের হিন্দু ও মুসলমান গ্রাম্য লোকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে দেখা যায়। ডুয়ার্স সমতলভূমির রাজবংশী আর কোচ-রা বর্মী-ধাঁচের পূর্ব মঙ্গোলিয়দের কিছু কিছু গঠনভঙ্গীও অতিরিক্তভাবে নিয়েছে।

পাঁচটি জাতিধারা অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে গেছে। শুদ্ধমাত্র একটি জাতির গঠন-চিহ্ন জনগণের ভিতর প্রায় নেই। 1951 সালের লোকগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী মোটের উপর অবশ্য বলা যায় যে বাঙ্গালী "জাতির প্রধান দৈহিক গঠন-চিহ্ন হল ভূমধ্য সাগরীয় স্ত্রী-জাত্য লম্বাটে মাথা—যাতে আমাদের দ্রাবিড়ী যোগাযোগ প্রকট হয়,

আর ভূমধ্যসাগরীয় গোল মাথা—যাতে আমাদের উত্তর ভারতীয়দের সঙ্গে সান্নিধ্য রেখেছে। রাজ্যের তথাকথিত নিচু জাতের ভিতর এই চিহ্নগুলি তেমন প্রকট নয়, বিভিন্ন পরিমাণের অস্ট্রেলিয় উপাদানই সেখানে বেশি দেখা যায়।" রিজলের মতে "পূর্ব ভারতে কাহারও সামাজিক মর্যাদা তাঁর নাকের পরিসরের সঙ্গে বিপরীত ভাবে ওঠা নামা করে। আমরা যদি কতকগুলি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের নাকের গড়নের তালিকা করি যাতে সূচালো নাক থাকবে তালিকার উপরে আর চাপা নাক থাকবে নিচে, তবে দেখা যাবে যে তালিকায় নাকের মাপের সঙ্গে শ্রেণীগত মানমর্যাদা সমান সমান।" যদিও এই স্থূল ব্যঙ্গাত্মক উক্তি রিজলের পরবর্তী নৃতত্ত্ববিদদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ধোপে টেকে না, এটা বলা অসত্য হবে না যে তথাকথিত আর্য রক্তের সমাবেশের উপর মোটামুটি সমগ্র ভারতবর্ষে সামাজিক মর্যাদার আসন ঠিক হত। জাতি বিভাগে এই "আর্য রক্ত" কথাটা কট্টর ব্রাহ্মণত্বের একটা অবাস্তব, অলীক সৃষ্টি।

জনসংখ্যা

1971 সালের লোকগণনা মতে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যা 8,88,80,095 জন। এতে দেখা যায় গত দশ বৎসরে 27.24-শতাংশ বেড়েছে। এই বৃদ্ধি সর্ব-ভারতীয় 24.57 শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বেশ বেশি। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা সর্ব-ভারতের লোক-সংখ্যার 8.12 শতাংশ, বঙ্গের আয়তন সর্বভারতের আয়তনের মাত্র 2.7 শতাংশ। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অবশ্য 1951-61 দশকের বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক কম। সেটা ছিল—বঙ্গে 32.8 শতাংশ আর তামাম ভারতে 21.5 শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের অপেক্ষাকৃত অধিক জনবৃদ্ধি যে স্বাভাবিক কারণ ছাড়াও অন্য কিছু কারণে তা সুস্পষ্ট। তখনকার পূর্ব পাকিস্তান ও পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি থেকে গত বিশ বছর ব্যাপী অবিরাম দেশান্তরীদের আগমন হতে থাকে। সীমান্তের জেলাগুলির লোকবৃদ্ধির দিকে নজর করলেই এটা স্পষ্ট হবে—কুচবিহার 38.47 শতাংশ, পশ্চিমদিনাজপুর 39.46 শতাংশ, মালদহ 32.13 শতাংশ, মুর্শিদাবাদ 28.48 শতাংশ, নদীয়া 29.98 শতাংশ, 24 পরগনা 36.33 শতাংশ, এবং জলপাইগুড়ি 28.90 শতাংশ। বস্তুত, উর্বর কৃষি-প্রধান জেলাগুলিতে মোট গড়পড়তা লোক সংখ্যার বেশি বৃদ্ধি হয়, আর কম হয় কলকাতা সহর আর সহরতলীতে (বৃহত্তর কলকাতায়)। সে সব স্থানে বৃদ্ধির হার 19.66 শতাংশ। কলকাতা ও হাওড়ার শিল্পবাণিজ্য কেন্দ্রে লোকবৃদ্ধি কম হয়—যথাক্রমে 7.31 ও 18.72 শতাংশ।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির এই সামগ্রিক উচ্চ হারের কিছুটা কারণ মৃত্যুসংখ্যা কমে যাওয়া। স্বাধীনতার পূর্বে বড় রকমের লোকক্ষয় হত ম্যালেরিয়ায়—প্রতি হাজারে 3.6 জন, 1948 সালে। তা নেমে এসেছে 0.001 জনে। বসন্ত: 0.57 থেকে 0.003 জন প্রতি হাজারে। কলেরা থেকে মৃত্যু উল্লেখনীয় ভাবে কমেছে। শিশু-মৃত্যুর হার আগের হারের ভগ্নাংশ মাত্র।

লোকবৃদ্ধি বিশেষভাবে দেখা যায় বর্ধমান জেলার নতুন শিল্প-সংস্থা এলাকায়। রাজ্যটির সহরাঞ্চলে মোট 27.85 শতাংশ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সহর দুর্গাপুরের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি দেখা গেল 57.75 শতাংশ। আসানসোলের 53.21 শতাংশ— আগের দশকে ছিল 35.57 শতাংশ। এক শতাব্দী আগে থেকেই পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলগুলিতে চাকরি-বাকরির খোঁজে আসা বাইরের লোকের ভিড় জমে থাকত। শিল্প এলাকায় লোক-বৃদ্ধির উচ্চহারের এটাও একটা কারণ।

পশ্চিমবঙ্গের বর্গ কিঃ মিঃ প্রতি জনসংখ্যা 507 জন। 1961 সালে ছিল 398 জন; অর্থাৎ বসতি ঘন হয়েছে শতকরা 21.8 ভাগ বেশি। পশ্চিমবঙ্গ আজও ঘন-সন্নিবেশের দিক থেকে ভারতের দ্বিতীয় রাজ্য। প্রথম স্থানে রয়ে গেছে কেরল— প্রতি বর্গ কিঃ মিটারে 548 জন। নিচের তালিকা থেকে দেখা যাবে কলকাতা ও তার আশে পাশেই ঘন-বসতি সবচেয়ে বেশি।

	1971 সালে লোকসংখ্যা	প্রতি বর্গ কিঃ মিটারে লোকসংখ্যার ঘনত্ব	শতকরা বৃদ্ধির হার
বৃহত্তর কলকাতা	70,40,345	12,420	19.7
কলকাতা কর্পোঃ এলাকা	31,41,180	30,497	7.3

বৃহত্তর কলকাতাকে যদি আসাম থেকে উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ পর্যন্ত সমস্ত পূর্ব-ভারতের এবং মধ্যপ্রদেশ ও পার্বত্য হিমালয়ের নেপাল, ভুটান আর সিকিম রাজ্যের কাজকর্মের প্রধান কেন্দ্রস্থল বলে ধরা যায়, তবে বৃহত্তর বোম্বাই এর 42.9 শতাংশ বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার লোকবৃদ্ধির হার সন্তোষজনক নয় মনে হবে। এটা মনে রাখতে হবে যে বৃহত্তর কলকাতা, বা ঠিকভাবে বললে, কলকাতা কেন্দ্রী সহর ও সহরতলী হল কম করে 74টি সহরের বাইরের এলাকা—যাদের পৃথক পৃথক মিউনিসিপ্যালিটি আছে। কলকাতা করপোরেশন এলাকায় লোকবৃদ্ধির হার কম থাকাটা সহরের আর্থিক প্রগতির চিহ্ন বলা যায় না। কারণ, উপনগরীর এলাকাগুলির অনেক বিস্তার হয়েছে। তাদের নতুন নতুন মিউনিসিপ্যালিটি। মূল সহরের আর সহরতলী অঞ্চলগুলির এই দু'রকমের পরিস্থিতির কারণ, সহরের বর্তমান পরিসরে, আরো লোকবসতির স্থানাভাব এবং প্রায় 100 কিঃ মিটারের বেশি দূরেও সহরতলীতে যাবার সুবিধাজনক যানবাহনের বন্দোবস্ত থাকা। অর্থনৈতিক অন্যান্য কারণও নতুন আগন্তুকদের সহর থেকে বাইরে থাকবার মতিগতি যুগিয়েছে। এই মনোভাব সৃষ্টি হয় 1951 সালে। ঐ সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে একটা বড় রকমের বাস্তুভিক্ষু দলের আগমন হয়। তাদের অধিকাংশই কলকাতার আশে পাশে বসতি নেয়।

প্রতি হাজার পুরুষে মেয়েদের সংখ্যার অনুপাত 1961 সালের 878 জন থেকে 1971 সালে 892 জনে বেড়ে গেছে। কলকাতার সহরতলীতে বেড়ে গেছে 651 থেকে

696 জন। শিল্পসংস্থা অঞ্চলে ঐ বৃদ্ধি এরূপ ঃ—24 পরগনায় 880 ঃ 866, হাওড়ায় 836 ঃ 808, কলকাতায় 638 ঃ 612, বর্ধমানে 887 ঃ 858। এর কারণ এই হতে পারে যে আগের মতো কর্মিদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার রীতিতে ব্যতিক্রম ঘটছে। এই অনুমানের স্বপক্ষে দেখা যায় যে মেয়েদের সংখ্যার অনুপাত কমে গেছে বীরভূমে (971 ঃ 973), পুরুলিয়ায় (965 ঃ 973), বাঁকুড়ায় (961 ঃ 981) এবং মেদিনীপুরে (944 ঃ 952)। এই জেলাগুলি নতুন শিল্পকেন্দ্রগুলির পার্শ্ববর্তী। এবং এখান থেকে পুরুষ কর্মিগণ কেন্দ্রগুলিতে বসবাস করতে চলে এসেছে। অন্য রাজ্য থেকেও কর্মিগণ শিল্পকেন্দ্রগুলিতে সপরিবার বাস করতে শুরু করেছে কিনা তা অবশ্য সঠিক জানা নেই।

নগরের ও সমগ্র প্রদেশের লোকসংখ্যার অনুপাত প্রায় সমানই রয়েছে—1971 সালে 24.59 শতাংশ আর 1961 তে 24.5 শতাংশ। এটা ঘটেছে সহর অঞ্চলের সংখ্যা-বৃদ্ধি সত্ত্বেও। এই দশকে 42-টি নতুন মিউনিসিপ্যালিটির পত্তন হয়েছে। সহর গড়ে ওঠায় তেমন অগ্রগতি হচ্ছে না বোধহয় এই কারণে যে আর্থিক অবনতি ঘটেছে বলে সহরে আর তেমন কাজকর্মের সুযোগ সুবিধে নেই। বর্ধমান জেলায়, যেখানে অধিকাংশ নতুন শিল্পসংস্থা স্থাপিত, সেখানে সহরের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হল 59.57 শতাংশ, 1961 সালে ছিল 19.97 শতাংশ, কিন্তু কৃষিপ্রধান পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় লোকসংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেড়েছে—75.34 শতাংশ (1961 ঃ 36.56 শতাংশ)। সুতরাং কোনো সিদ্ধান্তে আসবার আগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিচার বিবেচনা গভীরভাবে করা দরকার।

কৃষিকাজে নিযুক্ত লোকদের সংখ্যা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, গ্রামীণ কৃষকদের শতকরা হার নেমে 31.75 শতাংশেও দাঁড়িয়েছে (1961 : 38.5 শতাংশ)। কৃষি মজুরদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার বেড়ে হয়েছে 25.75 শতাংশ (1961 : 15.3 শতাংশ)। অন্য শ্রমিকদের হার কমে দাঁড়িয়েছে 42 শতাংশ 1961 সালে ছিল 46.2 শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গের লোকগণনার পরিচালকের মতে "এইগুলি রাজ্যটির কর্ম-তৎপরতার ধরনধারণের একটা বড় রকমের পরিবর্তন সূচনা করে—যে পরিবর্তন আশাপ্রদ নয়।" নিজেদের কোনো নিজস্ব চাষ-জমি নেই এরূপ কৃষিমজুরদের ভিতর মেয়েদের সংখ্যা বেশি হওয়া একটা লক্ষনীয় ব্যাপার। মেয়ে-মজুরদের সংখ্যা বেড়ে 38.21 শতাংশ হয়েছে, (1961 ঃ 21.1 শতাংশ)। অন্যত্রও এখন মেয়ে-কামিনদের সংখ্যার হার অধিক—48.93 শতাংশ (1961 ঃ 42.1 শতাংশ) অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন কর্মীদের সংখ্যা সাধারণভাবে কমে যাবার পরিপ্রেক্ষিতে (42.50 শতাংশ, 1961 ঃ 46.2 শতাংশ) অনুমান হয় যে শ্রম-শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে ভাঁটা পড়েছে যা দেখা গিয়েছিল ঐ দশকের শেষভাগ থেকেই। সেন্সাস রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে "মনে হয় যে বস্তুত শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে মন্দার ফলে গ্রাম থেকে আসা বহু নিঃসঙ্গ কর্মিকে আবার গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছে। গ্রাম ছেড়ে আসবার

তাড়না সহর ছাড়ার তাড়নার কাছে হার মেনেছে—এই সহরই বরাবর ছিল কাজ আর চাকুরির কেন্দ্রস্থল।

কৃষকদের সংখ্যা কমতির আর কৃষিমজুরদের সংখ্যা বাড়তির এটাই একমাত্র কারণ নয়। এই দশকে কৃষিশিল্পে টাকা খাটিয়ে বড় বড় কৃষিসংস্থাগুলি বাড়ানোর ও উন্নত করবার ঝোঁক এসে গেছে। তাতে করে ছোট চাষীদের এহেন অবস্থায় এনে ফেলা হয়েছে যে সরকারীভাবে না হলেও কার্যত তাদের ছোট ছোট জমিখণ্ড-গুলি বড় বড় জোতদারদের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। গত দু'শতকে চাষ-জমির মোট আয়তন 44.5 লক্ষ হেকটর থেকে 52.7 লক্ষ হেকটর হয়েছে—প্রায় 15 শতাংশ বেড়েছে। ধান্য উৎপাদন ঐ সময়ে 40 লক্ষ টন থেকে 60 লক্ষ টনে উঠে গেছে। বৃদ্ধির হার প্রায় 50 শতাংশ। এটা সম্ভব হয়েছে জল সেচনের, সার প্রয়োগের এবং উন্নততর বীজ বপনের ব্যাপক ব্যবস্থায়। কিন্তু তবু গড়পড়তা ফলন প্রতি একরে মাত্র 0.5 টনের সামান্য উপরে। "ইকনমিকস এণ্ড সায়েণ্টিফিক রিসার্চ ফাউনডেশন"-এর মতে কৃষি সংস্থাগুলির দশ-বার্ষিক আয় বৃদ্ধি মাত্র 124.3 শতাংশ এবং সর্বভারতীয় গড় হল 142.6 শতাংশ আর পাঞ্জাবের (সবচেয়ে বেশি) 241.6 শতাংশ। মনে হয়, শস্য-ফলনোর সঠিক কৌশল প্রয়োগে এবং জমি-জমার উপযুক্ত বিধিব্যবস্থায় এই ফলন প্রতি বৎসর একরে 3 টন থেকে 4 টন হওয়া উচিত। এই সমস্যা নিয়ে আরো কিছু অন্য পরিচ্ছেদে বলা হবে।

কেন্দ্র-শাসিত ও অন্যান্য অঞ্চলের ভেতর চণ্ডীগড়, দিল্লী ও পণ্ডিচেরীতে সহরের লোক সংখ্যার ঘনত্ব যথাক্রমে 2251, 2722 ও 982 প্রতি বর্গ কিলোমিটারে। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনকয়ের ঘনত্ব 994। কলকাতা সহরের ঘনত্বের পরিমাণ প্রতি বর্গ কিঃ মিটারে 30,497—লক্ষণ বড় ভীতিপ্রদ।

শিক্ষিতের সংখ্যা

1971 সালে লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকের সংখ্যা ছিল 1,46,88,745—যারা "পড়তে পারে এবং সাধারণ একখানা চিঠি লিখতে পারে"। মোট জনসংখ্যার অনুপাতে এটা হয় 33.05 শতাংশ। 1961 সালের 29.82 শতাংশ থেকে 12.88 শতাংশ বেশি। এই শতাংশ 5 বছরের নিচের বয়সীদেরও হিসাবের সামিল করে। তবু, এই দশকে রাজ্যসরকারের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কথা বিবেচনা করলে এই বৃদ্ধি মোটের উপর সন্তোষজনক বলা যায় না। সুখের বিষয়, লেখাপড়া জানা মেয়েদের সংখ্যার হার বৃদ্ধি হয়েছে—22.08 শতাংশ (1961 ঃ 16.96 শতাংশ)—বৃদ্ধির হার 30.19 শতাংশ পুরুষদের শিক্ষা বৃদ্ধির হার কিন্তু মাত্র 6.89 শতাংশ। কলকাতা সহরে ওই বৃদ্ধি মামুলী—মোটের উপর 1.8 শতাংশ। সারা প্রদেশের শিক্ষিতা মেয়ে-দের গড়পড়তা হার বৃদ্ধি থেকে 11টি জেলা অধিকতর বৃদ্ধির হার দেখিয়েছে। সেগুলি হল ঃ যথাক্রমে পশ্চিম দিনাজপুর 64.78, পুরুলিয়া 62.3, মেদিনীপুর 59.24, মালদহ 54.97, জলপাইগুড়ি 50.15, বীরভূম 46.21, দার্জিলিং 45.8, মুরশিদাবাদ

44.26, বাঁকুড়া 42.55, 24 পরগনা 36.63 আর বর্ধমান 35.04 শতাংশ মাত্র পাঁচটি জেলা গড়পড়তার অধিক শিক্ষিত পুরুষের হার দেখিয়েছে—পশ্চিম দিনাজপুর 22.34, জলপাইগুড়ি 19.62, মালদহ 16.77, পুরুলিয়া 16.23 আর মুর্শিদাবাদ 14.13 শতাংশ. কলকাতার বৃদ্ধির হার হল মাত্র 0.94 শতাংশ, কলকাতায় অবশ্য সমগ্র লোকসংখ্যার 60.35 শতাংশ শিক্ষিত। এ বিষয়ে কলকাতা অগ্রণী—শিক্ষিতা মেয়েদের সংখ্যা মোট শিক্ষিতদের 54.40 শতাংশ।

শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের 1971-72 সালের নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ শিক্ষার চিত্র নিম্নের তালিকায় দেখা যাবে :—

	প্রাথমিক শিক্ষা	মাধ্যমিক শিক্ষা	উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা
স্কুলের সংখ্যা	36,979	7,045	205 (কলেজ)
ছাত্র সংখ্যা	43,51,089	19,26.349	2,47,635
শিক্ষক সংখ্যা	2,28,928	71,000 (প্রায়)	—

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা 7 : কলকাতা, যাদবপুর, বর্ধমান, কল্যাণী, উত্তরবঙ্গ, রবীন্দ্রভারতী, ও বিশ্বভারতী (শান্তিনিকেতন)

মেডিকেল কলেজের সংখ্যা 7 : বৎসরে 755 ছাত্রের স্থান হয়।

ইনজিনিয়ারিং ও টেকনিকেল কলেজের সংখ্যা 6 : (খড়গপুর আই আই টি সমেত)।

ছয় থেকে 11 বৎসরের স্কুলগামী শিশুদের শতকরা সংখ্যা 73.3। খোদ সরকারী তহবিল থেকে প্রাথমিক শিক্ষা বাবদ খরচ 29.35 কোটি টাকার মতো। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র গ্রামাঞ্চলে এবং 89 টি মিউনিসিপাল এলাকার 17টিতে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে বালিকাদের সংখ্যা শতকরা 37.6। বিনামূল্যে পাঠ্য-পুস্তক সরবরাহ করার কাজ চালু হয়েছে।

কলকাতা সহ গ্রাম ও সহুরে এলাকাগুলিতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। প্রায়ে 1.48 কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে খরচ হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির ভিতর 1,941টি বহুমুখী বিদ্যায়তন। তাদের 4,519টি বিভিন্ন রকমের পাঠ্যসূচী। শিক্ষক-শিক্ষণ মহবিদ্যালয় বা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ-এর সংখ্যা বর্তমানে 120। আর আছে সর্বসমেত 1200 ছাত্র নেবার উপযোগী 21টি নিম্ন কারিগরী বিদ্যালয় এবং ডিপ্লোমা দেবার অধিকারী 25টি "পলিটেকনিক"।

তাদের মধ্যে একটা মেয়েদের জন্য। নিম্নলিখিত ইনজিনিয়ারিং কলেজগুলি আছে,—শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (ইঃ কঃ), জলপাইগুড়ি ইঃ কঃ, নর্থ ক্যালকাটা ইঃ কঃ, দুর্গাপুর রেজিয়নাল ইঃ কঃ (কেন্দ্রীয় যোজনায়), ইণ্ডিয়ান

ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজি খড়গপুর (কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা গঠিত) এবং কলেজ অফ ইনজিনিয়ারিং এণ্ড টেকনলজি, যাদবপুর। আর আছে ইনস্টিটিউট অফ সেরামিক টেকনলজি, ও কলেজ অফ লেদার টেকনলজি—দুটিই কলকাতায় অবস্থিত, ডিগ্রী কলেজ। বহরমপুরে ও শ্রীরামপুরে এক একটি করে টেকস্টাইল টেকনলজি কলেজ আছে।

বয়ঃপ্রাপ্তদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের মূল চেষ্টা হল পুনরায় নিরক্ষর হবার সম্ভাবনা দূর করা। 4,500 এরও অধিক সোশ্যাল এডুকেশন সেন্টার বা সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্র বসানো হয়েছে এবং নতুন শিক্ষাপ্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপনের উদ্যোগ চলছে।

তবু, গত দু'দশকে লোকসংখ্যার বিস্ময়কর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতি তেমনি জোরালো হয়নি, আরো উপযোগ, আরো চেষ্টা চাই।

ধর্ম

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের (1971) অধিকাংশকেই (34,611,864) মোটামুটিভাবে হিন্দু শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। সংখ্যালঘু (9,064,338) বেশ কিছু সংখ্যক মুসলীমও আছে। অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হল—খৃষ্টান (251,752) এবং বৌদ্ধ (121,504)। ছিটে-ফোঁটা কয়েকটি শিখ (35,084) ও জৈন (32,203) মণ্ডলীও দেখা যায়। বাকী অন্যান্য ধর্মের মিলিত লোকসংখ্যা 194,120। নানা শ্রেণীর একেশ্বরবাদী ও বহু ঈশ্বরবাদী থেকে সুরু করে অনেক ধর্ম সম্প্রদায় হিন্দু নামে অভিহিত। সবচেয়ে বড় মণ্ডলী হল প্রধানত চৈতন্য-ভক্ত বৈষ্ণববাদীদের। ছোটখাট ভক্তিবাদী মণ্ডলীর ভিতর সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে সহজিয়া সম্প্রদায় এই সম্প্রদায় বাউল বা বৈরাগী নামের যাযাবর গোষ্ঠী। এরা জাতিকুল ভেদ ও চলিত সামাজিক রীতিনীতি মানে না। এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় মহাযানী বৌদ্ধ-ধর্মবাদের পরবর্তী কালীন ভাষ্য থেকে। তারপর নাম করা যায় শাক্ত আর শৈবদের। আচারগত ব্রাহ্মণ্যধর্ম যা বৈদিক আর্যধর্ম পদ্ধতি থেকে সৃষ্টি হয়েছে, তা মাত্র অল্প কিছু ব্রাহ্মণদের মধ্যে পালিত হত। বঙ্গদেশে আচরিত সাধারণ হিন্দুধর্ম হল আর্য-পূর্বদের, শেষ দিকের বৌদ্ধদের আর ব্রাহ্মণদের আচার-বিচার-বিশ্বাসের সংমিশ্রণ। এতে স্থানীয় প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে বর্তমান। এই প্রভাব শুধু যে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যেই দেখা যায়, তা নয়,—মুসলীম ও খৃষ্টানদের ভিতরও এটা বিশেষভাবে বিদ্যমান। ভক্তিবাদ—যার মার্জিত রূপ হল বৈষ্ণববাদ—বঙ্গদেশের ধর্ম-চর্চার ক্ষেত্রে একটা প্রাচীন বৈশিষ্ট্য, এবং বোধহয় সম্প্রদায় নির্বিশেষে জনগণের ধর্ম-বিশ্বাসের সবচেয়ে জোরালো উপাদান। মোটামুটি রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে একটি উচ্চস্তরের ভাবাবেগ-প্রধান মানব-ধর্ম। স্থানীয় হিন্দু সন্ন্যাসী এবং মুসলীম পীরগণ ধর্ম-ব্যবস্থার সংগঠন ও পরিচালনায় ধর্ম-শাস্ত্র থেকে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতেন। শাস্ত্রীয় ও স্থানীয় ছোটখাট দেবদেবীদের মানুষের মূর্তিতে কল্পনা করা হত। মানুষেরই মত

জেলার নাম	1-1-1966-এ জমির পরিমাণ (স্কোঃ মিঃ)	লোক সংখ্যা, 1971—জেলা হিসাবে				
		পুরুষ	নারী	মোট	গ্রামীণ	সহরে
দার্জিলিং	3,005	406,775	358,902	765,677	585,786	179.891
জলপাইগুড়ি	6.233	927,713	824,458	1,752,171	1,581,261	170,910
কুচবিহার	3,339	735.757	676,391	1,412,148	1,315.416	96,732
পঃ দিনাজপুর	5,365	957,811	888.404	1,846,215	1,672.683	173.532
মালদা	3,713	826,966	787.604	1,614.570	1,546,156	68,414
মুর্শিদাবাদ	5.324	1.501.322	1,440,803	2.942,125	2,699,256	242,869
নদীয়া	3,922	1,143.367	1,085,655	2,229,022	1,810.283	418,739
২৪ পরগণা	13,767	4,565,777	4,015,966	8,581,743	5,648.805	2,932,938
হাওড়া	1.489	1,318,270	1,101,825	2,420,095	1,406,063	101,432
কলকাতা	*26	1,917,501	1,223,679	3,141,180	—	3,141,180
হুগলী	3,148	1,512,728	1,361,051	2,873,779	2,112,578	761,201
বর্ধমান	7,035	2,077,216	1,843,179	3,920,395	3,025,106	895,289
বীরভূম	4,552	903,118	876,687	1.779,805	1,654,567	125,238
বাঁকুড়া	6,884	1,037,671	997,602	2,035,273	1,883,210	152,063
মেদিনীপুর	13,618	2,836.722	2,678,598	5,515,320	5,092,320	423,000
পুরুলিয়া	6,256	819,530	791,047	1,610.577	1,478,206	132,371
পঃ বঙ্গ	87,676	23,488,244	20,951,851	44,440,095	33,511,696	10,928,399

* প্রেসিডেন্সি সহর মাত্র

শ্রমজীবীদের শ্রেণী-ভাগ

	মোট কর্মী সংখ্যা	চাষী	চাষী-মজুর	অন্যান্য কর্মী
লোক সংখ্যা	2,606,996	4,003,249	3,245,656	5,358,091
পুরুষ	11,484,499	3,858,909	2,816,731	4,808,859
নারী	1,122,497	144,340	428,925	549,232

তাঁদের অনুভূতি বিশেষ করে, প্রেম-প্রীতির বিভিন্ন লীলাখেলায় অতিমানব রূপে তাঁরা চিত্রিত হতেন। বৈষ্ণববাদে নরনারীর প্রেমের স্বর্গীয় প্রতিবিম্ব কৃষ্ণ রাধায়, শাক্তদের সন্তান-স্নেহে। হিন্দুধর্মের বহু শাখায় এই সামাজিক আচারবিচার বরাবর জাতিভেদ প্রথা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে—মাঝে রয়েছে একদিকে সমগ্র হিন্দুসমাজ আর অপরদিকে অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায়ের দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের বেড়া।

জাতিভেদ প্রথা

বঙ্গদেশে ও ভারতের অন্যত্র জাতিভেদ প্রথা একটা বিশিষ্ট সংস্কার। এ প্রথা শুধু হিন্দুদের ভিতরই আছে বললে ভুল হবে। বংশানুক্রমে মাত্র নিজেদের মধ্যেই খাওয়াদাওয়া বিবাহাদি করে এসেছে এমন এক এক মণ্ডলীর লোক নিয়ে এক একটা জাতি। এরা আগের দিনে নিজেদের জাত ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকত। আর. পি. চন্দ মহাশয় বলেন "গাত্রবর্ণ অথবা শ্রেণীগত বাস্তব বা অবাস্তব পার্থক্য, আর বংশগত পেশা জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি করেছে"। কোনো কোনো পণ্ডিতদের মতে আর্য-পূর্বদের মধ্যে পেশাদারী সংস্কার এবং গুপ্তকৌশল রক্ষার্থে আগে থেকেই একই মণ্ডলীর ভিতর বিবাহাদি আবদ্ধ থাকত। তাঁদের বিশ্বাস এই যে, ব্রাহ্মণ-আর্যগণ দক্ষিণ ভারতের রীতিনীতি থেকে এই জাতিভেদ প্রথা গ্রহণ করেন। আর্যগণ যখন উত্তর ভারতে বসতি আরম্ভ করেন তখন দক্ষিণে স্থানীয় দ্রাবিড়ীয় সভ্যতা সক্রিয় ছিল। সম্ভবত ব্রাহ্মণগণ এই প্রথাটিকে এমনিভাবে গুছিয়ে নিয়েছিলেন যে তাতে একটা দৈবী-প্রেরণার রং ধরেছিল। নানা প্রকার সেকেলে নিষেধ নিয়মের কড়াকড়ি, "মানা" (কোনো লোকের বা জিনিষের উপর অলৌকিক ক্ষমতা আরোপ করা), 'প্রেতাত্মা' কল্পনা—এ সব ঐতিহাসিক যুগের প্রথম ভাগে জাতিভেদ প্রথাকে শক্ত কাঠামোয় বসিয়েছিল। হাটন-এর মতে "বর্ণ ব্যবস্থাকে বলা চলে বিশেষ পরিস্থিতির প্রয়োজন মতো একটা সামগ্রিক সমাধান। এই বিশেষ পরিস্থিতি বলতে বোঝায় এলাকা বিশেষে যে বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থা, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতি মিলিত হয়েছে সেগুলো পরস্পরকে এড়িয়ে চলেনা অথচ স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চায়"।

এটা স্পষ্ট বোঝা যায় যে জাতিভেদ প্রথা আর্যদের পূর্ব-গাঙ্গেয় ভূমিতে প্রবেশ

করবার আগে থেকেই অন্যান্য অঞ্চলের মত বঙ্গদেশেও লোকজনের ভিতর প্রচলিত ছিল, তখন ও পরে জাত আর পেশা একই কথা ছিল। এটাও মনে হয় যে, সমাজে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে, জাতিভেদ প্রথা কখনো দৃঢ় পায়ে দাঁড়ায়নি। বঙ্গদেশে কোনো রাজবংশই বহুকাল রাজত্ব করেনি এবং "এখানেই ছিল ভারতের ললিতকলা, শিল্প, বাণিজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। হরেক রকম কাজ-কারবার ছিল এখানে, আর ছিল সর্বদা রাজায় প্রজায় মন কষাকষি"। (এ. মিত্র, "সেন্সাস ১৯৫১, দি ট্রাইবস্ এণ্ড কাস্টস অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল")। সন্দেহ নেই যে, বংশ ও বর্ণ এবং একের পর এক নানা ধাঁচের বিজেতাদের আগমণ জাতিভেদ প্রথার আচারগত গোঁড়ামি বাড়াবার সাহায্য করেছিল।

ব্রাহ্মণ্যবাদ গোড়ার দিকে পূর্ব ভারতে সুদৃঢ় ছিল না। বৌদ্ধ আমলে যখন গাঙ্গেয় উপত্যকা জলে-স্থলে ব্যবসায় বাণিজ্যে রমরমে, তখন পেশাদার জাতগুলি জাঁকিয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদ যখন রাজদণ্ড হাতে প্রবেশ করল তখন ঐ পেশাদার জাতগুলির বাঁধন শক্ত হতে লাগল। যারা ব্রাহ্মণিক হিন্দুশাসকদের ইচ্ছানুসারে চলত না, তাদের বণিকদের (ব্যবসায়ী ও মহাজন) মত "নিচু জাতে" চালান করে দেওয়া হত। কতকগুলি সরকারি নিষেধাজ্ঞাও তাদের বিরুদ্ধে জারি হত। পরে, ব্রাহ্মণগণ দেখলেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধীদের সঙ্গে একটা কাজ চলা গোছের আপোষ-মীমাংসায় এলে তাঁদের নিজেদেরই লাভ, এই বিরোধীরা হল শৈব, শাক্ত আর বৈষ্ণবরা। এরূপে বঙ্গদেশ অগণিত জাতি উপজাতির বাসভূমি হয়ে উঠল। এরা বর্ণবিভাগের নিয়মকানুনমাফিক নয়, কিন্তু বংশগত পেশা অনুযায়ী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। ঐ সব পেশার কর্ম-কৌশল ও গুপ্তজ্ঞান বাইরের লোভী প্রবেশ-প্রার্থীদের হাত থেকে সতর্কে রক্ষা করা হত। মাত্র ঊনবিংশ শতক থেকে ব্রিটিশ শাসকদের কূটনীতি অনুযায়ী বংশানুক্রমিক পেশাদারীতে ভাঙ্গন ধরায় পেশাভিত্তিক জাতিত্বের গাঁথুনিতে প্রবল ঘা লেগেছে। অনেকেই কুলগত পেশা ছেড়ে নতুন জীবিকার পেছনে ছুটেছে। পশ্চিমবঙ্গে জাতিভেদ প্রথা বিংশ শতক থেকেই একটা আমূল পরিবর্তনের মুখে ছিল। দেশ স্বাধীন ও দ্বিখণ্ডিত হবার পর অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যা পরিবর্তনের কারণে জাতিতে জাতিতে সংমিশ্রণ ব্যাপারটা আরো ত্বরান্বিত হয়ে উঠেছে।

প্রচলিত জাতির পাঁতিতে সবচেয়ে উঁচুতে হল ব্রাহ্মণরা। নৃতত্ত্বের বিচারে না হলেও তাঁরা নিজেদের খাঁটি আর্য-গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত বলে মনে করেন। বস্তুত, যজন-যাজন, সংস্কৃত চর্চা, বিশেষ করে শাস্ত্র চর্চা,—এসবে তাঁদের একচেটে অধিকার থেকে আসছিল। এটা ছিল ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত। ঐ আন্দোলনের সময় থেকে অন্যান্য বর্ণের লোকরাও মূল সংস্কৃতে ও বাংলা অনুবাদে ধর্মশাস্ত্র পড়তে লাগলেন। শ্রেণীবিভাগে তারপর হলেন বৈদ্যরা। তাঁরা ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঠিক তার নিচের বর্ণের সম্মেলনে উদ্ভূত বলে ধরা হয়। এঁরা বংশানুক্রমে হিন্দু ভেষজ বিদ্যা (আয়ুর্বেদ) ও তার প্রয়োগবিধির চর্চা করতেন।

তাঁদের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানের যুক্তি দেখিয়ে তাঁরা দ্বিজত্বের দাবীও করেছেন। শ্রেণীবিভাগে তৃতীয় স্থানে কায়স্থরা। এঁরা উঁচু বর্ণদের মধ্যে সংখ্যায় খুব বেশি। এঁদের একদল আবার ক্ষত্রিয় বংশীয় বলেও দাবি করেন। কায়স্থ বর্ণ যে বেশ প্রাচীন তা প্রতিপন্ন হয় এই থেকে যে শেষের যুগের পুরাণ ও সংহিতায় তাঁদের উল্লেখ দেখা যায়, বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত ভৌগোলিক খণ্ডে তাঁরা ছড়িয়েও আছেন। তাঁরা বংশানুক্রমিক "বাবুগিরি" কাজ করেন—কেরানীগিরি, হিসাব সংরক্ষণ, সরকারি মুন্সীগিরি ইত্যাদি। বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ কিন্তু অন্যান্য অঞ্চলের সমবর্ণের লোকদের সঙ্গে বিবাহ সম্পর্ক পাতাতে পারেন না। শেষের যুগের পুরাণগুলিতে কায়স্থরা "সৎ শূদ্র" বা "ভালশূদ্র" শ্রেণীতে স্থান পেয়েছেন। এই পুরাণগুলির উৎপত্তি বঙ্গদেশে বলেই মনে হয়।

বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণরা বিবাহাদি ব্যাপারে পাঁচটি সবর্ণে বিভক্ত—রাঢ়ী, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তসতী ও মধ্যশ্রেণী বংশগত। প্রাধান্য এবং তথাকথিত খাঁটি রক্ত অনুযায়ী এই সবর্ণগুলির অনেক শাখা প্রশাখা আছে। কায়স্থরা চারটি সবর্ণ উপশ্রেণীতে বিভক্ত—উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। তাঁদেরও ব্রাহ্মণদের মতো নানা শাখা প্রশাখা। বৈদ্যরা সংখ্যায় কম। উচ্চ পেশা ও বৃত্তিতে তাঁদের সংখ্যা অনুপাতে বেশি মাত্রায়। লক্ষ্য করা যায় যে, তিনটি উচ্চ বর্ণের লোকরাই ধর্ম বিশ্বাসে প্রধানত শাক্ত। "নিচু" বর্ণের বেশির ভাগই চৈতন্য সম্প্রদায় ও অন্যান্য শ্রেণীর বৈষ্ণব। বৈদ্য, কায়স্থ ও "নিচু" বর্ণের সম্পন্ন শ্রেণীর লোকরা বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণদেরই অনুসরণ করেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাঁদের আদিম পূর্ব-পুরুষদের থেকে নেওয়া কিছু কিছু অনুষ্ঠান।

হিন্দু সমাজের তিন-চতুর্থাংশের অধিক ভাগকেই শূদ্র আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সুবিদিত অর্থে শূদ্র জাতিসমূহের ভিতর কায়িক শ্রমের কাজে লিপ্ত সকলকেই ফেলা যায়। দ্বাদশ শতকে বঙ্গদেশে হিন্দু রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হলেও সুদক্ষ শিল্পীরা সমাজের বেশ উঁচু পর্যায়ে স্থান পেতেন বলে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বৈশ্যদের সমতুল্য বিরাট বংশানুক্রমিক ব্যবসায়ী শ্রেণীর শাসকদের হুকুমে শূদ্র শ্রেণীতে স্থান পাবার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই শূদ্রদের আবার তাঁদের নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন স্তর, সবর্ণ ও মণ্ডলী আছে। "শুচি" শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের দাক্ষিণ্য পেতেন তাঁদের পূজাপার্বনের কাজে। ঝাড়ুদারি, চামড়ার কারিগরি ইত্যাদি "অশুচি" কাজে লিপ্তরা হল প্রকৃত হরিজন। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে ভক্তিবাদের পুনরুত্থান হলে জাতি পাঁতির কঠোরতার একটু লাঘব হল, যদিও তা আসলে লোপ পেল না। বর্তমানে জাতিভেদ কিন্তু ক্রমে ক্রমে লক্ষণীয় ভাবে লুপ্ত হয়ে আসছে। এর কারণ, অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রতিক্রিয়া, তার সঙ্গে বিশেষ করে যুক্ত রয়েছে উদার মানবিকতার ভিত্তিতে নূতন করে বুদ্ধিবাদের পুনর্বিন্যাস।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন রামমোহন রায় (1772—1833) তাঁর ধর্ম

ও সমাজের মূল সংস্কারের বাণী শোনাতে শুরু করেন, তখন থেকেই জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জনমত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সমর্থন করতেন বৈদান্তিক একেশ্বরবাদ, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভেদের বিলোপ। তিনি চেয়েছিলেন যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থা। তাঁর পরেই রামকৃষ্ণ পরমহংস (1836—86) ধর্মসাধনার সকল পথই সমান সত্য বলে সর্বজনীন ঈশ্বরবাদের প্রচার করেন। সব সাধনাই ঈশ্বর-সাধনা, সাধনার সকল পথই ঈশ্বরে পৌঁছে দেয়—এই ছিল তাঁর মত। রামকৃষ্ণের উপদেশের নৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য তাঁর প্রতিভাবান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (1863—1902) বেশ জোরালো ভাবে প্রচার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষকে এটা বুঝিয়েছিলেন যে উচ্চ বর্ণের শাসনের দিন চিরতরে চলে গেছে এবং আগামীকালের ভারত এতদিনের দলিত বিমর্দিতদের মধ্যে থেকেই উঠবে। উচ্চ বর্ণের লোকরা, যাঁরা এতদিন বর্ণগত নানা সুখ সুবিধা ভোগ করে আসছিলেন, স্বামীজী তাঁদের বোঝালেন যে এতগুলি লোককে সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা কত অন্যায়। এ বিষয়ে স্বামীজী রামমোহনের ব্রহ্মবাদীদের চেয়েও অগ্রসর ছিলেন। লোহার মতো শক্ত মাংসপেশী, ইস্পাতের ন্যায় ধাতসহ স্নায়ু-সংগঠন করে জনকল্যাণে আত্মনিয়োগ করবার জন্য যুবকদের প্রতি স্বামীজীর আহ্বান বঙ্গদেশের ও দক্ষিণ ভারতের যুব সমাজে এক নৈতিক সঞ্জীবনী সুধার কাজ করেছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (1861—1941) বিশ্বজনীনতাব গান গাইলেন যার ভিত্তি ছিল মানব ধর্মের তত্ত্বে। এই তত্ত্ব মানুষে মানুষে কোন সমাজ-গত বিভাগ স্বীকার করত না। এই সংস্কার আন্দোলনে আরো প্রেরণা যোগালেন মহাত্মা গান্ধী জাতিভেদ ও অন্যান্য বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন জাগিয়ে।

বঙ্গদেশের সমাজ ক্ষেত্রে শ্রেণী-চেতনা এখন আর তেমন হিসেবের মধ্যে নেই, কিন্তু একেবারে মরেনি। একটু মার্জিত ভাবে "সবর্ণ বিবাহ" প্রথা এখনো আছে। যদিও জাতিভেদ প্রথার বৃত্তি-বিভাগ প্রায় নেই-ই, কায়েমী অর্থনৈতিক স্বার্থ এখনো প্রথাটিকে বেশ জিইয়ে রাখছে।

আরো একটা বড় রকমের সমস্যা আছে—সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ। এই সমস্যাই 1947 সালে বঙ্গদেশের জাতিসংহতিতে রাজনৈতিক বিভাগ আনে। মুসলীম সমাজের ভিতরও একটা বিভেদ দেখা যায়—আদি ও অমিশ্রিত মুসলমান এবং সংখ্যাগুরু নির্জলা দেশী মুসলমানদের ভিতর। কিন্তু এ-হেন বিভেদের কড়াকড়ি যেমনটা হিন্দুদের মধ্যে তেমনটা আর কোথাও দেখা যায় না। তেমনি খৃষ্টানদের ভিতরও দু'দলের মধ্যে স্পষ্ট লাইন টানা আছে—যাঁদের মধ্যে কম বেশি ইউরোপীয় রক্ত আছে, আর যাঁরা দেশ ধর্মান্তরিত—বেশির ভাগ কৃষক শ্রেণী থেকে উদভূত।

লোকগণনার কর্তাদের মতে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামদেশে 82,105টি ভজন স্থান আছে। সহরতলী এলাকায় আছে 7,770টি। কলকাতাতে 815টি। মেদিনীপুর প্রথম স্থানে—গ্রাম অঞ্চলে 15,205টি। সেন্সাস রিপোর্টে আছে "গ্রামাঞ্চলে

জীবনযাত্রার ধরণ নতুন গড়ে ওঠা ও পরিবর্তনশীল সহুরে হালচাল থেকে অধিকতর সুদৃঢ় এবং স্থিতিশীল।"

পোষাক পরিচ্ছদ

সাধারণ বাঙ্গালী পোষাক হল ধুতি এবং একটা সেলাই করা আচ্ছাদন—সার্ট, পাঞ্জাবী কুর্তা অথবা আধা-আস্তিন ফতুয়া। সহুরে লোকরা এখন সুবিধাবোধে এবং অর্থনৈতিক কারণে পাজামা ও প্যান্ট পরতে শুরু করেছে। পদমর্যাদার নিশানা হিসেবে অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিসম্পন্নরা পাশ্চাত্য পোষাক গ্রহণ করছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আচকান পাজামা আর শামলা পাগড়ী ছেড়ে। কিন্তু মোটামুটি সর্বত্রই কোনো প্রকার শিরস্ত্রাণ নেই—মুসলমানরা অবশ্য নামাজের সময় এবং ধর্মানুষ্ঠানে মাথা ঢেকে রাখেন। মেয়েরা সর্বত্র কোমর থেকে গোড়ালি পর্যন্ত লম্বা শাড়ি সুষ্ঠু ভাবে পরেন। ঊর্ধ্বদেশ নানা প্রকারের ব্লাউজে ঢাকা।

খাওয়া-দাওয়া

বাঙ্গালী প্রধানত ভাত খায়। খুব ধর্মশীল হিন্দু ছাড়া সকলেই প্রধান খাদ্য-সামগ্রী হিসেবে মাছ খায়। বাঙ্গালী মিষ্টিপ্রিয় এবং দুধের ছানা থেকে তৈরী মিঠাই খেতে ভালবাসে,—সামর্থ্যে কুলোলে। সে মিঠাইও বিভিন্ন ছাঁদের বেরিয়েছে। আর একটা প্রয়োজনীয় খাদ্য-সামগ্রী হল ডাল, এ থেকেই প্রয়োজনীয় প্রোটিনের যোগান হয়। হরেকরকম শাকসব্জী ও মরশুমী ফল তাদের খাদ্য-তালিকা পূর্ণ করে। 1947 সাল থেকে ক্রমান্বয়ে চাল সরবরাহে ঘাটতি হেতু গমজাত জিনিষের ব্যবহার বেশি হচ্ছে। মোটের উপর অবশ্য বাঙ্গালী-খাদ্যে পুষ্টিসাধক গুণ খুবই কম। কিন্তু সংশোধন দুঃসাধ্য—পুষ্টিকর খাদ্যের সরবরাহ কম এবং সে-হেতু তা দুর্মূল্য। দরিদ্র বলে অধিকাংশ লোকই তা কিনতে পারে না। বাঙ্গালী অন্যান্য পানীয় থেকে চা পছন্দ করে। মিষ্টি মেশানো চা-পান দূর পাড়াগাঁয়েও চালু হয়েছে। চূন খয়ের ও সুপারিসহ পান খাওয়া সর্বত্র প্রচলিত। সেরূপ চলতি তামাক খাওয়াও —হয় সাদাসিধে বিড়ির রূপে অথবা মাতগুড় ও মসলা মিশ্রিত করে হুকোয়। সিগারেট খাওয়া গ্রাম দেশেও ছড়িয়ে পড়েছে—কিন্তু এখনো সেটা বড়মানুষী। তালের রসের তাড়ি এবং ঘরে তৈরী মদ্য পানের চলন প্রধানত শিল্প-শ্রমিক মহল ও উপজাতির মধ্যেই আবদ্ধ আছে।

ভাষা

পশ্চিমবঙ্গ ভাষা ভিত্তিক রাজ্য, অর্থাৎ রাজ্যের অধিকাংশ লোকেরই মাতৃভাষা বাংলা। প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সমস্ত লোকের মাতৃভাষাও বাংলা। ভারত উপমহাদেশের বাংলা ভাষাভাষীর মোটসংখ্যা 12 কোটির কম নয়। দার্জিলিং জেলার লোকদের ভাষা নেপালী ও ভুটিয়া। কলকাতা বন্দর ও শিল্পাঞ্চল এবং

দুর্গাপুরের ইস্পাত কারখানা

দুর্গাপুর বাঁধ

রাণীগঞ্জের কর্মব্যস্ত কয়লাখনি
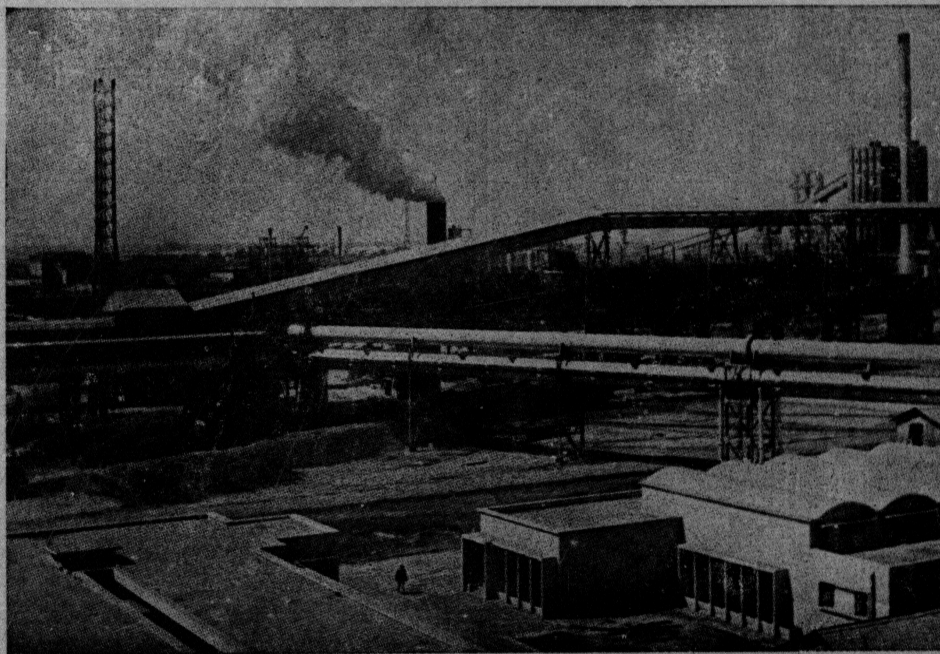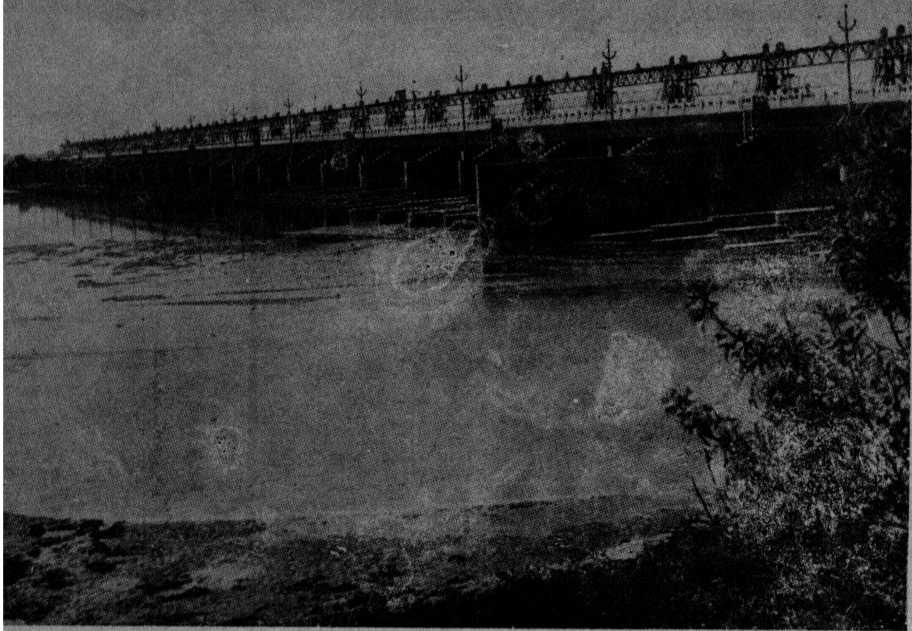
এ্যালুমিনিয়ম কারখানায়
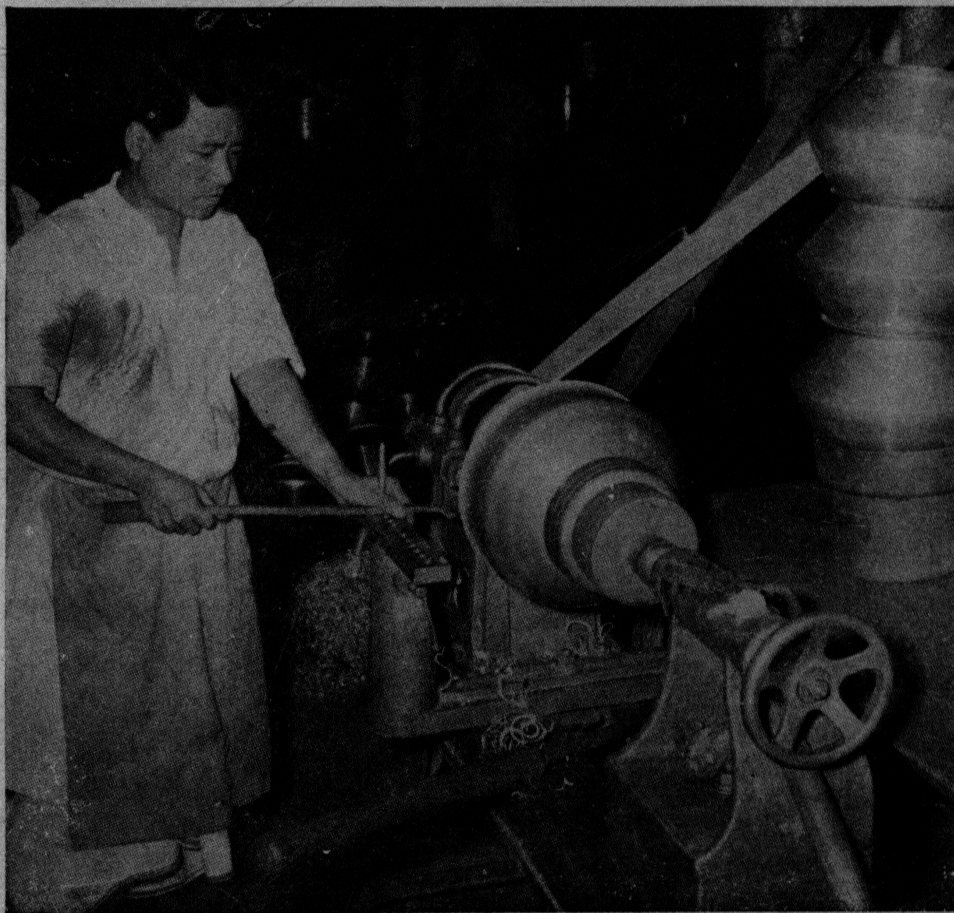
চা পাতা তোলা হচ্ছে

দুর্গাপুর-আসানসোলের এলাকাও বহুকাল যাবৎ পার্শ্ববর্তী হিন্দী ও ওড়িয়া ভাষাভাষী প্রদেশ থেকে আগন্তুক লোক আমদানি করেছে। কলকাতা নগরীর পত্তন থেকেই এর অধিবাসীরা বহু ভাষা-ভাষী। লোকগণনার রিপোর্ট মতে 1901 সালে বাঙ্গালী কলকাতায় টেনেটুনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। 1961 সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যটির ভাষাগত চিত্র এইরূপ (মোট জনসংখ্যা 34,926,279) ঃ

বাংলা	29,408,246
হিন্দী	1,894,039
ওড়িয়া	212,890
ইংরেজী	39,325
সাঁওতালী	1,121,447
বর্মী	242
চীনা	10,384
নেপালী, ভুটিয়া ইত্যাদি	2,259,706

একটা পৃথক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার উত্থান হয় সম্ভবত নবম এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। উৎস ছিল পুরাতন অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়ী আঞ্চলিক ভাষা, বৌদ্ধধর্ম বাণী-বাহক আঞ্চলিক প্রাকৃত ভাষা, সংস্কৃত, এবং সর্বোপরি সৌরসেনী বা পশ্চিমী উত্তরভারতীয় উপভাষার পূর্বদেশী অপভ্রংশ। এই পূর্বদেশী অপভ্রংশ হল মাগধী উপভাষা। যতদূর জানা যায়, সবচেয়ে পুরাতন বাংলা কবিতা এই মাগধীতেই রচিত হয়। এসব রচনা হল বৌদ্ধধর্মের কথা নিয়ে চর্যাপদ—সহজিয়া বৌদ্ধ যাজকদের ছন্দোময় গাথা, এবং অন্যান্য গীতি কবিতা। ঐ উপভাষাগুলির সংমিশ্রণে আদিম বাংলা ভাষার রূপায়ন হয়। এই আদিম বাংলা মধ্যযুগীয় বাংলা থেকে পৃথক—যেমনভাবে পৃথক আদিম ইংরেজী মধ্যযুগীয় ইংরেজী থেকে। আজও বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বহু আর্য-পূর্ব উপভাষার শব্দ রয়ে গেছে, যা আদিম উপ-জাতীয় লোকদের কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়। বাংলা ভাষার বর্ণমালা ঐ ভাষা এবং আঞ্চলিক মনোভাবের বিকাশের মতোই সমান পুরানো। একটা আলাদা অক্ষর-লিপির প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, যখন বর্ণমালার দশ রকম অক্ষরকেই বাংলা অক্ষর বলে ধরা হত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কম করেও চব্বিশটি অক্ষরের ছাঁদকে নিঃসন্দেহে বাংলা বলা যেত। কিন্তু মুসলীম রাজত্বের প্রথম ভাগে কোনোপ্রকার কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসনের ও সংগঠিত পণ্ডিত মণ্ডলীর কর্তৃত্বের অভাবে—পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা প্রধানত সংস্কৃত নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন—এই লিপির ছাঁদের বহু অদল বদল ঘটে। এ অবস্থাটা থেকে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ছাপাখানার আবির্ভাব পর্যন্ত। তখন অক্ষর-লিপিগুলির বর্তমানে চলিত রূপায়ন করা হয়, আর বাংলা ভাষা আধুনিক যুগে প্রবেশ করে।

বাংলা বর্ণমালায় তেরটি স্বরবর্ণ আর ঊনচল্লিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। এর উপর, অক্ষরলিপিগুলিতে অনেক যুক্ত-অক্ষর আছে, যা স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের এবং

ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জন বর্ণের সংমিশ্রণে তৈরী। এই সংমিশ্রণগুলির অনেকগুলিরই লেখন ভঙ্গীর কোনো সুসম্বদ্ধ রীতি নেই। বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল স্তরে শিক্ষা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করায় এবং জনসাধারণে্য খবরের কাগজের বহুল প্রচার হেতু টাইপিং ও লাইনো টাইপিং-এর সুবিধার্থে সম্প্রতি রোমান হরফের পদ্ধতিতে যুক্ত-অক্ষরগুলিকে যুক্তিযুক্ত ভাবে ঢেলে সাজার চেষ্টা হচ্ছে।

বাংলা কথ্য ভাষার অনেক আঞ্চলিক বিভিন্নতা আছে। সর্বত্র বিশিষ্ট লোকদের কথ্যভাষা অবশ্য কলকাতার বিশিষ্টদের ভাষার অনুসরণ করে চলতে চায়। এই কথ্য ভাষাটির জন্ম নদীয়া-শান্তিপুরের স্থানিক ভাষা থেকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংস্কৃত শব্দ ও রচনাশৈলী-বহুল যে মার্জিত ভাষা সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত, এই স্থানিক ভাষা তাকে প্রায় বাতিল করে দিয়েছে। সাহিত্যে কথ্য ভাষার ব্যবহার শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ এই শতকের দ্বিতীয় দশকে। খবরের কাগজ রেডিও ইত্যাদি গণপ্রচার-যন্ত্রেও এই কথ্য ভাষার ব্যবহার হেতু তথ্য, জ্ঞান ও বিচার-বিশ্লেষণ প্রচারের ক্ষেত্রে এর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক বাংলা ভাষার শব্দ-সম্ভার খুবই সমৃদ্ধ। সংস্কৃত, ফারসি, হিন্দী, উর্দু, ইংরেজী, পর্তুগীজ, গ্রীক (সংস্কৃতের মাধ্যমে), আরবী, ডাচ, তুর্কী, ফ্রেঞ্চ, জাপানী, মলয়ালি ও বর্মী প্রভৃতি ভাষা থেকে শব্দ এতে স্থান পেয়েছে। সংস্কৃত শব্দ ভাণ্ডার থেকে শব্দ চয়ন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একটানা চলে আসছে সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও অনুভূতিকে ভাষায় রূপ দেবার জন্য। বঙ্গদেশে প্রায় সাত শতক ব্যাপী মুসলীম রাজত্বে সরকারি কাজে ফারসি ভাষার ব্যবহার হত এবং ঘরোয়া কথা-বার্তায় ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনগণের মধ্যে এ ভাষার চলন ছিল। এ সব কারণে বাংলা ভাষায় ফারসি শব্দের প্রবেশ ঘটে। উর্দুর সম্পর্কেও সেই কথা, যদিও উর্দু এবং হিন্দুস্থানী থেকে শব্দের আহরণ শেষের দিকে হয় এবং তা পার্শীর মত এতটা ব্যাপক ছিল না। এই শব্দগুলি চলতি তালিকাভুক্ত হয়ে গেছে—কিছুটা বদলে বা না-বদলে। তেমনি অনেক ইংরেজী ও ইয়োরোপিয়ান শব্দ নতুন জিনিষকে, নতুন চিন্তাধারাকে প্রকাশের জন্য ব্যবহারে এসে গেছে। দেখা যাচ্ছে যে বাংলা শব্দ-মালায় নানা ভাষা থেকে নানা শব্দ অবাধে চয়ন করা হয়েছে। তাদের উচ্চারণ ও বানান স্থানিক আকার নিয়েছে, অর্থেরও কখনো কখনো এদিক সেদিক হয়েছে। অন্যান্য ভাষা থেকে শব্দ ও বাচনভঙ্গী চয়নের এই উদারতার জন্য বাংলা ভাষা আজ শব্দ-সমৃদ্ধ এবং পৌরুষপূর্ণ।

প্রাকৃতিক-সম্পদ

(ক) ভূমি-সম্পদ

কৃষি

পশ্চিমবঙ্গের প্রাকৃতিক সম্পদকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায় :-

(ক) ভূমি-সম্পদ, (খ) খনিজ-সম্পদ, (গ) জল-সম্পদ। গ্রামাঞ্চলের লোকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরই, অর্থাৎ সমগ্র রাজ্যের লোকসংখ্যার প্রায় 50 শতাংশ লোকেরই জীবিকা হল কৃষিকাজ—ভূমিতে ফসল ফলানো। ভূমিকে কৃষিকাজে লাগানোর ব্যাপারে এ প্রদেশ ইতিমধ্যেই ভারতের মধ্যে অন্যতম প্রধান। কাজেই এজন্য আরো অতিরিক্ত ভূমি সংগ্রহ করার সুযোগ বড় কম। মোট 88 লক্ষ হেকটারের শতকরা বিভাগের হার নিচে দেখান হল,

		শতকরা
1.	মোট কর্ষিত ভূমি	62.9
2.	অনাবাদী ভূমি	3.1
3.	বনভূমি	12.5
4.	কর্ষন বহির্ভূত ভূমি	14.6
5.	অন্যান্য অকর্ষিত ভূমি	6.9

ধান উৎপাদনে এককালে ভারতের শস্যাগার বলে খ্যাত বঙ্গদেশ 1940 সালের পর থেকেই ঘাটতি অঞ্চল বলে গণ্য হয়েছে। এর কারণ, ক্রমাগত লোকবৃদ্ধি, আর কৃষিকাজে সেকেলে রীতিনীতির প্রচলন। 1947 সালে দেশ দ্বিখণ্ডিত হলে এই শোচনীয় অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। কারণ, প্রধান ধানী-জমির জেলাগুলি পড়ে গেল পূর্ব পাকিস্তানে। নতুন পশ্চিমবঙ্গে বাস্তুহারাদের আগমনে জনসংখ্যার চাপ বেড়ে যেতে লাগল, আর আরো জমি পাটচাষে লাগান হতে থাকল পাট-শিল্প চালু রাখবার জন্য, এবং বিদেশীমুদ্রা উপার্জনের খাতিরে। এই পাটশিল্প এতকাল প্রধানত পূর্ববঙ্গ থেকেই পাটের রসদ পেয়ে আসছিল। খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধির অন্য এক কারণ হল প্রায় ষাট লক্ষ লোকের কাজকর্মের খোঁজে অন্য রাজ্য থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের হিড়িক। খাদ্যশস্যের ঘাটতি ইদানীং সুফলা-বছরেও কুড়ি লক্ষ টনের মত।

ফলনের উন্নতি হলে এই ঘাটতির অনেকটাই মুছে ফেলা যায়। কিন্তু সেকেলে কৃষি পদ্ধতি, বর্ষা-নির্ভর জল সরবরাহ ও জমির নিজস্ব উর্বরতার উপর ভরসা,

দো-ফসলীতে অবহেলা—এসব কারণে এখন ধানের গড়পড়তা ফলন প্রতি একরে মাত্র .05 টনের কিছু বেশি। আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে এবং যথোচিত উৎসাহ পেলে এই ফলন বাড়িয়ে তিন টনে দাঁড় করানো যেত। কর্মোদ্যম বাড়াতে হলে চাই ভূমি-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন, প্রয়োজনীয় ঋণ দান, বীজ-শস্য, সার, সেচন—এসবের ব্যবস্থা, আর চাই কর্মকৌশল ও মুনাফার স্থির সম্ভাবনা। সরকার মাত্র সেদিন প্রয়োজনীয় কাজে নেমেছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ধান ছাড়া অন্য প্রধান শস্য হল পাট। মোট কর্ষিত প্রায় 55 লক্ষ হেকটার জমির 48 লক্ষ হল ধানের এবং প্রায় 5 লক্ষ হেকটার হল পাটের। কর্ষিত জমির শতকরা 80 ভাগে একবার ফসল ফলান হয়, 20 ভাগেরও কমে দু'বার। প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে যতটুকু জল পাওয়া যায় তার অতিরিক্ত জলের সেচ-ব্যবস্থাও অপ্রচুর। শতকরা মাত্র 23 অংশ কর্ষিত জমিতে জল সেচনের ব্যবস্থা আছে—তামিলনাড়ে 46 অংশে এবং পাঞ্জাবে 44 অংশে।

গত দুই দশকে ধানের উৎপাদন 40 লক্ষ টন থেকে বেড়ে 60 লক্ষ টন হয়েছে (1969-70)। প্রধান ধান-শস্য আমন বপন করা হয় বর্ষা আসবার সঙ্গে সঙ্গে আর কাটা হয় নভেম্বর-এ। আউস শীঘ্র ফলে—এপ্রিল-মে মাসে বপন, অগাস্টে ঘরে তোলা। এ জাতের ধানের ফলন ও খাদ্যগুণ অপেক্ষাকৃত কম। বোরো ধান জলা জমিতে শীতের প্রথমে বপন করা হয় এবং কাটা হয় বসন্তকালে। এর চাউল মোটা, এতে খাদ্যগুণও খুব বেশি।

পাট জন্মে বর্ষাকালে পলিমাটির জমিতে যা জলে প্লাবিত হয়। শণ বা মেস্তা জাতীয় আঁশবহুল অন্যান্য কৃষিজাতের সঙ্গে মিলিয়ে 1969-70 সালে তন্তুজের মোট ফলন হয়েছিল 67 লক্ষ টনের বেশি। এটা ঘটেছিল এই শস্য সম্পূর্ণভাবে বর্ষার জলের উপর নির্ভর হেতু ফলনের ওঠানামা থাকা সত্ত্বেও। পূর্ব বৎসরের ফলন হয়েছিল মাত্র 28 লক্ষ টন।

পরবর্তী কাঁচা বা নগদী টাকা উপায়ী শস্য হল চা। চা জন্মায় দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলায়, পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহার জেলায়ও কিছুটা উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে 87,600 হেকটার জমিতে চায়ের আবাদ হয় বলে অনুমান। মোট শস্যের পরিমাণ বাৎসরিক 87,000 ও 103,000 টনের মধ্যে। চা-বাগানগুলি চুক্তিবদ্ধ ও বহিরাগত ঠিকে মজুর দ্বারা চালানো হয়ে আসছে স্বাধীনতা লাভের প্রায় এক শতক পূর্ব থেকে। বাগানগুলির ঔপনিবেশিক মালিকরা অবিশ্বাস্য নিচু হারে বেতন দিতেন, আর অমানুষিক অত্যাচার করতেন। স্বাধীনতার পর মালিকানা ভারতীয়দের হাতে চলে এসেছে এবং উদার শ্রমিক-আইনে মজুরদের প্রতি আরো সহানুভূতিমূলক আচরণের বন্দোবস্ত হয়েছে।

তৈলবীজ পশ্চিমবঙ্গে কোনো একটা প্রধান শস্যের মধ্যে গণ্য নয়। 1.64 লক্ষ হেকটারের মত জমিতে এর চাষ হয়। ফলন হয় প্রায় 0.77 লক্ষ টন (1968-69)।

গমের ফলন বাড়তির দিকে, প্রধানত মালভূমি-প্রান্তে ; হিসেবে 9.0 লক্ষ টনের একটু বেশি 1970-71 সালে। 1968-69-এ ছিল 1.33 লক্ষ টন। ভুট্টার ফসল, যা হয় প্রধানত দার্জিলিং জেলার পাহাড় অঞ্চলে, তারও উৎপাদন বাড়তির দিকে। 1969-70 সালে ছিল 45.500 টন—পূর্বের বৎসর ছিল 32.000 টন।

আর একটা অপ্রধান ফসল আখ। এর উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। আখ থেকে গুড় তৈরী 1968-69 সালে 1.48 লক্ষ টনে দাঁড়িয়েছে—পূর্ব বৎসরের থেকে 18,000 টন বেশি।

বহুব্যবহৃত ও বড় রকমের ফসল আলুর ফলন হয় শীতকালে। এর ফলন 1968-69 সালে 8.47 লক্ষ টনে ওঠে- পূর্ব বৎসর থেকে শতকরা 24 ভাগ বেশী।

ডাল উৎপাদনের দিকে এযাবৎ খুব বেশি নজর দেওয়া হয়নি। বাঙ্গালীর খাদ্য-তালিকায় ডালের স্থান একটি অতি উপকারী প্রোটিন যোগানদার হিসেবে। কলাই, মটর সহ সমস্ত প্রকারের ডালই শীতের শস্য। বর্তমানে আবাদী জমির প্রায় 10 শতাংশ মাত্র ডালের। আমন ধানের জমিতে দ্বিতীয় ফসল হিসেবে ডাল ফলানোর লাভদায়কতার কথা কৃষি বিভাগের কর্তারা প্রচার করছেন। এসব জমি আমন ধান ওঠাবার পর অনাবাদী পড়ে থাকে।

নারকেল এবং সুপারি সমুদ্রের কাছের জেলাগুলির স্যাঁতসেঁতে ও সামান্য নোনা জমিতে প্রচুর উৎপন্ন হয়। পাকা ও সবুজ অবস্থায় নারকেলের শাঁস খাদ্যের পরিপূরক হিসেবে অত্যন্ত সমাদৃত। কিন্তু পাকা ফল থেকে তেল নিষ্কাশনের কাজ প্রায় হয়ই না। এই তেল মিষ্টি এবং খাবার যোগ্য। দক্ষিণ ভারতে রান্নার কাজে এই তেলের ব্যবহারই প্রধান। বাঙ্গালীরা সর্ষের তেল পছন্দ করেন, কিন্তু বঙ্গদেশে সর্ষের চাষ হয়না। সুপারির শাঁস পানের সঙ্গে রুচিকর হিসেবে খাওয়া হয়। এই পান চাষ করা হয় দেশে বিক্রী আর অন্য প্রদেশে রপ্তানীর জন্য।

পশ্চিমবঙ্গে নানাজাতীয় ফল জন্মে। এর ভিতর আছে আম, কলা, পেঁপে, কাঁঠাল, আনারস, লিচু ও পেয়ারা। এগুলি বরাবর বাড়ি ঘরের বাগানেই জন্মানো হয়। কিন্তু সহর অঞ্চলে চাহিদা বৃদ্ধি হেতু সুরক্ষিত বাগিচায় এসব ফলের চাষ আবাদ ও ফলন ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

দার্জিলিং-এর পাহাড় অঞ্চলে চমৎকার কমলালেবু জন্মে। সম্প্রতি ছোট খাটো প্রকল্পে এসব পাহাড়ে আপেল, আলুচা (প্লাম), পীচ ইত্যাদি চাষের চেষ্টায় সুফল হচ্ছে। মোটামুটিভাবে নগর ও সহরতলীগুলিতে ফলের সরবরাহ অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমদানীর উপর নির্ভর করে।

পশ্চিমবঙ্গের উর্বর ভূমি ঘরোয়া প্রয়োজন মেটাতে বা রপ্তানীর জন্য বহু প্রকার শাকসবজীর চাষের উপযুক্ত। লাউ, কুমড়ো, কাঁচাকলা, বেগুন এবং আরো অনেক অনেক সবজী, যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটোর মত শীতকালীন সবুজ সবজী, নটে, পালংয়ের মত পাতার শাক প্রচুর পরিমাণে জন্মে। একটা বিশেষ সুখাদ্য হল পটল (পরওয়ল)। পটল দো-আঁশ মাটিতে বর্ষাকালে ভাল জন্মে। অধিকাংশ

বাঙ্গালী আমিষাশী হলেও প্রচুর শাক সবজী এবং তরি-তরকারিও খেয়ে থাকেন। ক্রমশ লোকবৃদ্ধি ও মাথাপিছু ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি হেতু অবশ্য বাজারে এ সব তরি-তরকারির দাম ও চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে।

মধু উৎপন্ন হয় প্রধানত সুন্দরবনে। বন্য মৌমাছির চাক থেকে মধু আহরণ করা হয়। উত্তর ভাগের পাহাড়ে মৌমাছি পালন গ্রাম-শিল্প হিসেবে নতুন প্রচেষ্টা এবং সরকারের উৎসাহ সত্ত্বেও এখনো বিশেষ উন্নতি দেখাতে পারেনি। লাক্ষা জন্মে প্রধানত পুরুলিয়া জেলায় ও মালভূমি প্রান্তের কোনো কোন স্থানে। লাক্ষা পলাশ গাছের কীট থেকে প্রাপ্ত একপ্রকার রেসিন বা রঞ্জন। বহু শিল্পে এর ব্যবহার হয়। এর রপ্তানীও বেশ। তুঁতফল গাছ ও অন্যান্য গাছের রেশম পোকার গুঁটি থেকে প্রাপ্ত রেশম কৃষি-শিল্প হিসেবে প্রধানত মালদহ, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে উৎপাদিত হচ্ছে।

পশুপালন

পশ্চিমবঙ্গ হাঁস ও মুরগীর ডিমের একটি প্রধান উৎপাদন স্থানে পরিণত হয়েছে। হরিণ ঘাটায়, টালিগঞ্জে এবং জলপাইগুড়ি ও মেদিনীপুর জেলার সরকারি ফার্ম গুলিতে এবং সর্বত্র ছোট ছোট বেসরকারি খামারে সহর অঞ্চলের রপ্তানীর জন্য ডিম ও পাখির মাংস বিক্রী-যোগ্য করা হচ্ছে। সহরের দিকে এসবের চাহিদা বেড়ে চলেছে। সংখ্যাগুণতিতে রাজ্যটিতে দুধেল এবং ভক্ষ্য পশু যথেষ্ট কিন্তু হরিণ ঘাটার সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়া দুধের যোগান হয় বেসরকারি ঘাঁটি থেকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে যথোপযুক্ত খাবার পশুদের দেবার চেষ্টা নেই, তাদের স্বাস্থ্য বিধি-সম্মত ভাবে পালন করাও হয় না। দুধের উৎকর্ষ এবং উৎপাদনের পরিমাণ কাজে কাজেই খুব কম—বিশেষ করে কলকাতায় ও তার আশেপাশে। দেশী জাতের গরুর স্থানে ক্রমে ক্রমে পাঞ্জাব ও হরিয়ানার উচ্চতর জাতের গরুর আমদানী হচ্ছে। কিন্তু দুধের সরবরাহ যথেষ্ট বাড়াবার জন্য আরো অনেক কিছু করবার আছে—প্রধানত কলকাতাসহ বিশেষ করে সহুরে এলাকায়। আর একটি বড় সমস্যা হচ্ছে কৃষিকাজে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বলদ ও বুড়ো, দুধ দানে অপারগ গরুগুলির একটা সুরাহা করা। গরুর সঙ্গে একপ্রকার পূজ্য পূজক ভাব জড়িত হওয়ায় এবং গোমাংসে হিন্দুর প্রথাগত নিষেধ থাকায় এই বেকার পশুগুলি পশ্চিমবঙ্গের পশু-খাদ্য যোগানের ব্যবস্থায় একটা বোঝা বিশেষ।

বাঙ্গালীর খাদ্য তালিকায় মাংসের স্থান মাছের পরে। সম্ভ্রান্ত হিন্দুর কাছে পছন্দের মাংস হ'ল পাঁঠার মাংস, শূয়র মাংস নিষিদ্ধ। তথাকথিত ছোট জাতের মধ্যে অবশ্য শূয়র মাংস প্রিয়। এ দুটির ব্যবসাই বর্তমানে শৃঙ্খলাহীন এবং ঘরোয়া। সুষম পশুখাদ্যের অভাব এবং দেশী জাতের নিম্নমানের পশুর প্রজনন—এই কারণ-গুলি মাংসের খাদ্যগুণ এবং পরিমাণ ব্যাহত করেছে। মাংসের চাহিদা সরবরাহের হারকে দ্রুত ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পশুপালন ক্ষেত্রে বিশেষ উপজাত দ্রব্য হল পশুর চামড়া। এই চামড়া বিশেষ প্রক্রিয়ায় মোলায়েম করা হয়।

বনসম্পদ

পশ্চিমবঙ্গের শতকরা তের ভাগের কিছু কম ভাগ অরণ্যভূমি। এর ভিতর গ্রাম্য-জনপদের বনজঙ্গল ধরা হল না। বিশেষ তিনটি অরণ্যভূমি হল (1) উত্তরবঙ্গের হিমালয়ের, তার পায়ের দিকের এবং ডুয়ার্স সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য, (2) মালভূমি প্রান্তের বিলীয়মান অরণ্য, (3) সাগর-মোহানা অঞ্চলের সুন্দরবন। চা-বাগান তৈরীর কাজে কাটাকুটি ছাড়া উত্তরের অরণ্যগুলিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়নি। উত্তরের উচ্চ ভূ-ভাগের প্রধান প্রধান বৃক্ষ হল দেওদার, বার্চ, ফার, বিভিন্ন প্রকারের ওক, মেগ্‌নোলিয়া এবং রডোডেনড্রন। ডুয়ার্স সমতলের প্রধান প্রধান বৃক্ষ হল শাল, চম্পা, ছিলৌনি, খদির, গামহার এবং টুন। বাঁশ ঝাড় প্রচুর। ডুয়ার্সের অরণ্য ভেষজ গাছে সমৃদ্ধ—যার মধ্যে আছে বিশিষ্ট গুল্ম সর্পগন্ধা (রাউলফিয়া)।

মালভূমি-প্রান্তের অরণ্য লোকসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে পাতলা হয়ে আসছে। আগের ঘন শালবন ঝোপঝাড়ে পরিণত হয়েছে। প্রধান প্রধান বৃক্ষ হল মহুয়া, পলাশ, শিমূল, হলদু, হরা এবং বাঁশ।

সুন্দরবনও মানুষের হঠকারিতায় ফাঁকা হয়ে আসছে। এখানে প্রধান বৃক্ষ হল সুন্দরী বা লাল গরান কাঠ। এই অঞ্চলের সমস্ত বৃক্ষেরই একটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল এই যে এরা নোনা আর কাদামাটিতে ভাল জন্মে। অন্যান্য বৃক্ষ হল গরান, গেঁয়ো, বহিন, ধুন্দাল ও গর্জন। সুন্দরী গাছের কাঠ থেকে গাড়ীর চাকাব পাখি বা দণ্ড তৈরী হয়। সব গাছেই গ্রামাঞ্চলের লোকের ব্যবহারের যোগ্য শক্ত আঁশের কাঠ তৈরী হয়। এক রকম প্রকাণ্ড ফার্ণ বা গোল গাছ খুব দেখা যায়। এর পাতা চালা-ঘর নির্মাণে ব্যবহার হয়। নদী ও খালের পাশে হামেশাই চোখে পড়ে সরু গুঁড়ি-ওয়ালা হিন্তাল গাছ, যার আর এক নাম নিপা পাম। হোগ্‌লার পাতা প্রচুর জন্মে। হোগলার পাতা দিয়েই দরিদ্ররা কুঁড়েঘর তৈরি করে। আর জন্মে কেয়ার ঝাড়।

ওই সব সমতল অঞ্চলে অর্থকরী আবাদ শুরু হয়েছে। সেগুণ আর শালগাছ রোপণ হচ্ছে। আম ও কাঁঠাল গাছের সুদৃঢ় কাঠও গৃহস্থালীর কাজে আসে। কোক কয়লাব উপস্থিতি ক্রমশ জ্বালানী কাঠের ব্যবহার কমিয়ে এনেছে। জনপদ সমূহে আরো বৃক্ষ-রোপণের প্রয়োজনীয়তা জরুরী বলে মনে হয়—এখন যখন কৃষিভূমির পরিমাণ প্রায় চরমে পৌঁছেছে। যদিও পশ্চিমবঙ্গের বৃক্ষ সম্পদ নগণ্য নয়, এর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ এখনো জ্বালানী কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ভূমির ভাঙ্গন নিবারণ-কল্পে জল প্রবাহের দু'পাশে নতুন গাছ লাগানো দরকার। মালভূমি-প্রান্তের অনুর্বর জমি আবার সুফল ফলাতে পারে যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা মত বনের বিন্যাস করা যায়।

(খ) খনিজ সম্পদ

পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি প্রান্ত খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ—বিশেষ করে কয়লায়। দার্জিলিং

শহরের পাদদেশেও কয়লা কিছু কিছু দেখা যায়। মালভূমিপ্রান্তে অন্য প্রধান খনিজ দ্রব্য হল ইঁট তৈরী করবার মাটি। অল্প কিছু চীনা মাটি, চুনাপাথর, ডলোমাইট, বেলে পাথর, ছাঁচের মাটি, চকমকি পাথর, গিরিমাটি, সাজিমাটি, তামা, লোহা, ম্যাঙ্গানিজ, উলফ্রাম ও আর্সেনিকও আছে। কিন্তু এগুলির অধিকাংশই এবং কয়লা ও ইঁটের মাটি অধিকতর পরিমাণে দেখা যায় বঙ্গদেশের বাইরে বিহার, উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশ অবধি বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণীতে।

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদের শতকরা 99 ভাগই কয়লা। গত শতকে রানীগঞ্জের চারদিকে কয়লার খনি আবিষ্কারের ফলে রেলওয়েতে দেশের নানা দিকে মাল চালানোর দ্রুত ব্যবস্থা হয়। আর হয়, কয়লার খনিগুলির পার্শ্ববর্তী দুর্গাপুর আসানসোল ও বন্দর নগরী কলকাতার চারদিকে নানা শিল্পসংস্থার প্রতিষ্ঠা। পশ্চিমবঙ্গের খনি-মজুদ কয়লা সমগ্র ভারতের মোট কয়লার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং বৎসরে কয়লার উৎপাদন সর্বভারতীয় উৎপাদনের প্রায় 30 শতাংশ। কয়লার খনিগুলিতে প্রায় 125,000 লোক কয়লা তোলার কাজ করে। কয়লা তোলার কাজে যন্ত্রপাতির প্রয়োগ করে কয়লাশিল্পে কর্মী নিয়োগ কমিয়ে আনবার সম্ভাবনা প্রযোজক মণ্ডলী চিন্তা করে দেখছেন। 30 জানুয়ারি, 1973 সাল থেকে সমস্ত কয়লার খনি সরকারি পরিচালনার অধীনে আনা হয়েছে।

কয়লার খনি অঞ্চলে কিছু কিছু লোহার স্তরের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায় পার্শ্ববর্তী বিহার ও উড়িষ্যায়—বিশেষ করে উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার গরুমহিষানি পাহাড় শ্রেণীতে। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর ও আসানসোলের কাছে কুলটি, বিহারের জামসেদপুর, উড়িষ্যার রাউরকেলা, মধ্যপ্রদেশের ভিলাই—এসব স্থানের ইস্পাত কারখানাগুলিতে লোহার কাঁচা মাল সরবরাহ হয়।

পশ্চিমবঙ্গের খনিজ সম্পদকে আরো সুষ্ঠুভাবে কাজে খাটানো দরকার। এই শিল্পের সব কিছু খতিয়ে দেখবার জন্য প্রচুর খরচ হতে পারে,—অল্প সময়ে মুনাফার আশা যদিও নেই। মুস্কিল হয়েছে বোধ হয় এখানেই।

(গ) জল-সম্পদ

সেচন

পশ্চিমবঙ্গেই হোক কি পূর্ববঙ্গেই হোক, বাঙ্গালী-জীবনে নদীর ভূমিকার কথা বলে শেষ করা যায় না। পরিবহন ও যোগাযোগের উপায় হিসেবে রেলওয়ে ও রাজপথ যদিও পশ্চিমবঙ্গে নদীর প্রাধান্য খাটো করে দিয়েছে, তবু সমুদ্রতীরের 24 পরগনা জেলা অঞ্চলে নদী এখনো পরিবহনের একমাত্র পন্থা। নদী এখনো কৃষি-জাত দ্রব্য উৎপাদনের জন্য স্বাভাবিক জল সরবরাহের প্রধান উপায় এবং বাঙ্গালীর

একটি প্রধান খাদ্য মাছের উৎস। বর্তমানে 55.76 লক্ষ হেকটার কৃষিভূমির শতকরা 29 ভাগে জলসেচনের সুব্যবস্থা আছে। 1969-70 সালে সরকারি প্রকল্পে সেচিত ভূমির পরিমাণ ছিল 7.32 লক্ষ হেকটার এবং এ ছাড়া আরো 8.5 লক্ষ হেকটার জমিতে নলকূপ, পুকুর, খাল ইত্যাদি দ্বারা সেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে এই প্রদেশে বৃষ্টিপাত যদিও প্রচুর, তবু তা ঋতু অনুযায়ী এবং বছর বছর বিভিন্ন অনুপাতের। বারিপাতের আঞ্চলিক বৈষম্যও বেশি। শ্রমের সাফল্যের জন্য চাষীদের বরুণ দেবতার দয়ার উপর নির্ভর করতে হয়। বর্ষার জলের বেশির ভাগই আবার দ্রুত নিষ্কাশিত হয়ে যায় এবং তা শুকনো ঋতুতে কাজে খাটানো যায় না। সমস্যা হল জল জমিয়ে রাখবার আর সুশৃঙ্খল ভাবে সারা বছর তার বিতরণ ব্যবস্থা করবার। তা হলেই শীত এবং গ্রীষ্মকালে প্রধান ও অপ্রধান—এই দু'রকম শস্যই উৎপন্ন হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান জলসেচন ব্যবস্থা বড় অসমভাবে করা হয়েছে। সুযোগ-সুবিধাটা প্রধানত রাজ্যের পশ্চিম ভাগেই আবদ্ধ। উত্তর ভাগটার দিকে সমুচিত নজর দেওয়া হয়নি। দ্বিতীয়ত, মাত্র আমন ধানের ভাল ফলনই হল এই সুযোগ সুবিধের মূল লক্ষ্য। তৃতীয়ত, নলকূপের দ্বারা মাটির নিচ থেকে জল তোলবার ব্যবস্থা মাত্র প্রাথমিক অবস্থায়।

1943 সালের সর্বনাশা দামোদর-বন্যার পর ভারতের ইংরেজ সরকার "দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন" (ডি. ভি. সি.) প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক লাভ। প্রধান উদ্দেশ্যটি সাধনের জন্য দামোদর ও তার উপনদীগুলির জলবাহী খাতগুলিতে পাঁচটি বাঁধ তৈরী করা হয়েছে। এর চারটি হল সীমান্ত বরাবর বিহার প্রদেশে। বাঁধগুলি দ্বারা সৃষ্ট জলাধার গুলিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের শিল্প-ব্যবস্থার প্রয়োজন মেটাবার জন্য ডি. ভি. সি. এলাকায় প্রতিষ্ঠিত বৈদ্যুতিক আর তাপ সৃষ্ট বিজলী-শক্তি সংগ্রাহক ষ্টেশনগুলি থেকে মোট 200 মেগাওয়াট শক্তি সংগ্রহ করা যাবে। জল-সেচনের ব্যবস্থা হয়েছে দুর্গাপুরে দামোদরের উপর একটি বড় বাঁধ নির্মাণ করে। এই বাঁধটির প্রধান দু'টি খাল বাঁধের উভয় প্রান্ত থেকে বেরিয়েছে। বড়টি প্রথমে উত্তরমুখো, পরে পূর্বমুখো হয়ে হুগলী নদীতে পড়েছে, এবং বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জল-সরবরাহ করছে। অন্য খালটি বাঁকুড়া জেলার কিছু অংশে জল-সেচনের কাজে লাগে। আশা করা যায় যে, এই খালগুলির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হলে প্রায় 4,00,000 হেকটার জমির সেচন কাজ চলবে। কিন্তু শীতকালে খালের জল প্রকল্পটির হিসেবের অনেক নিচুতে থাকে। কলকাতা থেকে রানীগঞ্জ অবধি জলযান চলার যোগ্য জলপথ তৈরির রঙ্গীন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার ভয় ছিল, তাই হল। বন্যার জল নিয়ন্ত্রণে বিশেষ একটা লাভ হল ম্যালেরিয়া রোগ দমন। এই রোগ বহু বৎসর যাবৎ বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়া জেলাকে বিধ্বস্ত করে আসছিল। প্রধানত বিহারে অবস্থিত জলাশয়গুলিতে মাছের চাষ করবার কাজ

হাতে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এ যাবৎ ফল তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। ডি. ভি. সি. অঞ্চলকে পর্যটকদের দর্শনীয় স্থান হিসেবে রূপায়িত করা হয়েছে কিন্তু প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থানগুলি বঙ্গদেশের সীমানার ওপারে।

পরবর্তী প্রধান প্রকল্প হল ময়ূরাক্ষী প্রকল্প। মশানজোড়ে একটা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে নদীর উপর দিয়ে, খানিকটা বিহারে। সেখানে একটি 4 মেগাওয়াট হাইড্রো-ইলেকট্রিক বিদ্যুৎজনন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। ব্রাহ্মণী, দ্বারকা, বক্রেশ্বর এবং কোপাই নামে নদীর উপনদীগুলির উপর দিয়ে কতগুলি বাঁধ দাঁড়িয়েছে। সমস্ত মিলে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 26,000 হেকটার জমিতে সেচ হচ্ছে। প্রকল্পটি সার্থক হয়েছে, খরিফ এবং রবিশস্য উভয়ই এখন কৃষকরা আদায় করে।

কংসাবতী বা কাঁসাই নদীতে বাঁধ তোলার এক প্রকল্পে মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার প্রায় 300,000 হেকটার জমিতে সেচ হচ্ছে। এই সবগুলি প্রকল্প মিলে মোট সেচযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় 3.2 লক্ষ হেকটার। অন্য একটি মধ্যম রকমের প্রকল্প হল পূর্ণিয়া জেলার সাহারাজোর নদীর জল নিয়ন্ত্রিত করা।

জল সেচনের প্রয়োজন অবশ্য মেটানো যায় মাত্র অনেকগুলি মধ্য ও ছোট আকারের প্রকল্প দ্বারা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মুখ্য পরিকল্পনা তৈরী হচ্ছে এবং সেটা সম্পূর্ণ হলে জেলামাফিক প্রকল্প বানাবার কাজ শুরু হবে। যে-প্রকল্পগুলি ইতিমধ্যেই রূপ নিয়েছে তার মধ্যে আছে ঃ উত্তর বঙ্গে তিস্তা বাঁধ প্রকল্প (4.5 লক্ষ হেকটার), দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে সুবর্ণরেখা প্রকল্প (0.8 লক্ষ হেকটার), পুরুলিয়া জেলায় আপার কংসাবতী ও বন্ধু প্রকল্প (0.6 লক্ষ হেকটার), বীরভূম জেলায় হিংলো প্রকল্প (0.13 লক্ষ হেকটার), বাঁকুডা জেলায় মালিয়াজোড়, গন্ধেশ্বরী— দ্বারকেশ্বরী, কুমারী ও সালি প্রকল্প (0.21 লক্ষ হেকটার), পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় টাঙ্গন প্রকল্প (8,500 হেকটার), মেদিনীপুর জেলায় দালাং প্রকল্প (4,050 হেকটার) এবং জলপাইগুড়ি জেলায় জরদা প্রকল্প। এগুলি সব মিলে প্রায় 9.3 লক্ষ হেকটার জমিতে সেচ-ব্যবস্থা করবে। এছাডা, নদী থেকে জল নিয়ে, গভীর ও অগভীর নলকূপ থেকে খনিত কূপ এবং ছোট ছোট খালের দ্বারা অতিরিক্ত আরো 7.8 লক্ষ হেকটার জমির সেচ কাজ চলতে পারে।

দার্জিলিং জেলার পাহাড়ী নদীগুলি জলচালিত বিদ্যুৎশক্তি জন্মানোর পক্ষে সবচেয়ে বিশেষ উপযোগী। কিন্তু তা এখনো খতিয়ে দেখা হয়নি। উত্তরবঙ্গে একমাত্র বিশিষ্ট বিদ্যুৎ প্রকল্প হল জলঢাকা নদীর উপর। তিস্তা নদীর সম্ভাব্য বিদ্যুৎ সম্পদ এখনো পরিমাপ করা হয়নি, কিন্তু এর থেকে সর্বসাকুল্যে কমপক্ষে 500 মেগাওয়াট পাবার সম্ভাবনা। এ শুধু উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির গৃহস্থালির ও শিল্প সংস্থাগুলিরই প্রয়োজন মেটাবে না, অংশত মধ্যবঙ্গেরও প্রয়োজন মেটাবে।

মৎস্য সম্পদ

পশ্চিমবঙ্গে মাছের উৎপাদন কম নয়। যেখানে জল সেখানেই কোন না কোন

জাতের মাছ,—খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের মাছ। সুস্বাদু জলের মাছ, যাতে রুই-জাতীয় মাছের বাছা বাছা জাতি (রুই, মৃগেল, কাতলা, কালবাউস ও সরপুঁটির মতো ছোট কার্প) মিষ্টি জলের নদীতে স্বাভাবতই দেখা যায়। আর এই মাছ পালন করা হয় বদ্ধ জলে, যেমন পুকুরে, বাঁওড়ে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ভাগীরথীর তীরবর্তী লালগোলা, মিষ্টি জলের মাছ জড়ো করবার বিশিষ্ট আড়ত। সুস্বাদু ইলিশ মাছের মতো সামুদ্রিক মাছ বাচ্চা জন্মদানকালে জোয়ার জলের শেষ সীমা অবধি উঠে আসে। সমুদ্রের উপকূলেই তাদের স্বাভাবিক আনাগোনা বেশি। জোয়ারের এলাকায় অন্যান্য উপাদেয় মাছও দেখা যায়, যেমন, ভেটকি ও এক শ্রেণীর ভারতীয় স্যামন। আরো বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সুস্বাদু কই মাছ সহ প্রচুর অন্যান্য ছোট মাছ। নদী, খাল, জলাভূমি ছাড়াও এ অঞ্চলে উঁচু বাঁধ দিয়ে ঘেরা মানুষের তৈরী প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভেড়ি আছে। এখানে মিষ্টি জলের মাছের চাষ হয়। গলদা চিংড়ি, ছোট চিংড়ি, বাগদা চিংড়ি, কাঁকড়া ও কচ্ছপ সাধারণত প্রচুরভাবেই এই জোয়ার জলের এলাকায় জন্মে। সুন্দরবনের খাঁড়িতেও বহু পরিমাণ মাছ পাওয়া যায়, বিশেষতঃ শরৎ ও শীতকালে। এ সময় ধীবররা জেলে-ডিঙ্গীতে মাছ ধরে—তাদের জীবন যদিও নদীতে মানুষখেকো কুমীর, হাঙ্গর এবং ডাঙ্গায় বাঘ দ্বারা বিপন্ন থাকে। মূল্যবান চামড়ার জন্য কুমীর শিকার করা হয়। এই চামড়া রপ্তানী হয়। শীতকালে মাছ শুকোনো একটা বিশেষ বৃত্তি।

সমুদ্রকূলে মাছ শিকার এযাবৎ রসুলপুর ও দীঘার মধ্যবর্তী মেদিনীপুর জেলার কূলভাগে প্রায় 30 কিঃ মিটার অবধি বিস্তীর্ণ। মাছ-শিকারের সেকেলে পদ্ধতি এখনো অধিক ভাবে চালু। সুন্দরবন কূলে মাছ-শিকার ব্যবসা এ যাবৎ সম্প্রসারণ হয়নি। বেশকিছু পরিমাণ হাঙ্গর ধরা হয় এবং কাঁথির কাছে জুনপুটে ভিটামিন-সমৃদ্ধ হাঙ্গরের যকৃতের তেল নিষ্কাশন করার একটা কারখানা আছে। দূর-সমুদ্রে মাছ শিকার আনুষঙ্গিক সুবিধা সুযোগের অভাবে এখনো সম্প্রসারিত হয় নি। এই প্রচেষ্টায় অনেক সুফল ফলবার সম্ভাবনা ছিল। রাজ্য সরকার সমুদ্রোপকূলে একটা মাছের বন্দর নির্মাণের সঙ্কল্প করেছেন, তাতে বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে সমুদ্রের মাছ সংরক্ষণ, পরিষ্করণ এবং বিক্রয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা থাকবে।

কলকাতা এবং শিল্পাঞ্চলগুলিতে ব্যবহৃত মাছের বেশির ভাগই বরাবর বাংলাদেশ থেকে সরবরাহ হত। সেজন্য 1947 সালে দেশ দ্বিখণ্ডিত হবার পর থেকে মাছের অকুলান চলে আসছে। অন্যান্য প্রদেশ থেকে আমদানী মাছে প্রয়োজনের খানিকটা পূরণ হয়েছে মাত্র। তাই মাছের দাম তুঙ্গে উঠেছে। মাছের ব্যবসা দ্রুত এবং যথোচিত উন্নতি করা এবং বণ্টন রীতিতে বেসরকারি এক চেটিয়া অধিকার প্রথার উচ্ছেদ করবার প্রয়োজন জরুরী। উৎপাদন এবং বণ্টন ক্ষেত্রে সমবায় প্রচেষ্টার আশু প্রয়োজন বিশেষ ভাবে অনুভূত হচ্ছে।

ইতিহাস ও সমাজ

ভাগের সঙ্গে মোকাবিলায় 1947 সালের 15 আগস্ট একটা নতুন ভারতের রাজ্য হিসাবে হঠাৎ গড়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ। এর এখনো ঐতিহাসিক কৌলীন্য নেই। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির বাংলা, যার অংশ পশ্চিমবঙ্গ, তার একটা বহু পুরাতন ইতিহাস আছে। ভারত উপ-মহাদেশের সংস্কৃতির বিচিত্র মর্মরপ্রস্থে এই বাঙ্গালী জাতির দান স্তরে স্তরে। একটা জাতির ইতিহাস হল সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত লোকমণ্ডলীর সামাজিক ইতিহাস। বাঙ্গালীদের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক প্রগতি তাঁদের বিশিষ্ট পরিস্থিতি-যোগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্বের এক পরিচ্ছেদে এই অঞ্চলের নিজস্ব ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক গঠনভঙ্গীর কথা বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ থেকে আজ অবধি বাঙ্গালীদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশক্ষেত্রে এই স্বকীয়তার প্রভাব সুগভীর।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

পূর্বেই বলা হয়েছে, বঙ্গভূমিখণ্ডে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড়দের বসতি ছিল। এঁরা দক্ষিণে ও পূর্বে পলিমাটির সমতল ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই সমতল ক্ষেত্র বিশাল গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী মালার গতিক্রিয়ায় বালুকণার সংমিশ্রণে সাগর থেকে জন্ম নেয়। গোড়ার দিকে তাঁরা ছিলেন শিকারী এবং আদিম প্রথাবলম্বী কৃষি-কর্মী। ছোট ছোট মণ্ডলীতে তাঁরা বাস করতেন। এসময় তাঁরা পশুপালন করতেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কিন্তু দেখা যায় যে ছাগ এবং মেষ তাঁদের অচেনা ছিল না। ক্রমে স্থানীয় ধান-শস্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ভূমিকর্ষণের জন্য তাঁরা লাঙ্গলের ফাল তৈরি করলেন, আর কাপড় বোনবার জন্য তুলার উৎপাদন হল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সমস্ত লোকই এক ধরনের কৃষিপ্রধান সভ্যতার উৎপত্তি করেছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। অন্তত কয়েকটি উপজাতি প্রধানত তীর ধনুক সম্বল করে বন জঙ্গলে শিকার করে জীবিকার সংস্থান করতেন। উপকূলবাসীরা গাছের গুঁড়ির ভিতর গর্ত করে নৌকা তৈরি করলেন এবং নদী ও সমুদ্রপথে বহুদূরে মাল বহনের জন্য বড় বড় কাঠ দড়ি দিয়ে বেঁধে ভেলা বানালেন। পরবর্তীকালে বঙ্গোপসাগরের পূব ও পশ্চিম উপকূল ধরে বেশ সমৃদ্ধ একটি সামুদ্রিক ব্যবসায়ের চলন হয়েছিল। তাঁদের ব্যবহৃত বস্ত্র ছিল সেলাই ছাড়া কাপড়। ধুতি ও চাদর এখনও ভারতের সাগরকূলবাসী জনগণের বিশিষ্ট পোষাক। মোটামুটি বলতে গেলে, বঙ্গভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা গ্রাম-ভিত্তিক ছিল এবং জনগণ-নির্বাচিত

পরিষদ অথবা নেতাদের দ্বারা দেশ শাসিত হত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে পরবর্তীকালের সমাজ-ব্যবস্থায় পঞ্চায়েত প্রথা অস্ট্রো-দ্রাবিড়দের দান।

নজির যা-কিছু আছে, তার থেকে মনে হয়, ঐসব লোকজন সাদাসিধে ও বিশ্বাস-প্রবণ ছিল। তাঁরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন, মৃতদেহ কবর দিতেন বা গাছে ঝুলিয়ে রাখতেন এবং মধ্যে মধ্যে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে অন্নদান করতেন। তাঁরা কোনো কোনো গাছ, পাথর, ফুল, বিশেষ বিশেষ স্থান বা বিশেষ বিশেষ পাখি ও জন্তুতে ঐশ্বরিক ক্ষমতা আরোপ করে তাদের পূজা করতেন। ঐ সকল বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের অনেকগুলি আজও পরিবর্তিত আকারে সকল জাতের গ্রাম্য-লোকদের মধ্যে চলিত আছে। দ্রাবিড়গণ বিশেষ করে অধিকতর দক্ষ, অধিকতর শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অধিকতর উদ্যমী ছিলেন। তাঁরা স্বভাবে ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন এবং জীবন ও জগতের রহস্য নিয়ে বিচার-বিবেচনা করতেন। লিঙ্গ পূজার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সম্ভবত তাঁরাই দিয়েছিলেন। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, গুণাগুণ বিচার করে তাঁরা নিজেদেরকে বংশানুক্রমিক জাতিতে জাতিতে ভাগ করেছিলেন। বিভিন্ন বর্ণে বিবাহাদি ও খাওয়া দাওয়ায় কড়া বাধানিষেধগুলিও তাঁদেরই সৃষ্টি। তাঁদের উপর স্ত্রী জাতির প্রভাব মাতৃশক্তির আরাধনায় প্রকট হয়। এই বৈশিষ্ট্যটিও অন্যান্যের সঙ্গে পরবর্তীকালে বাঙ্গালীর ধর্ম-সাধনায় স্থান পেয়েছে। শেষের দিকের হিন্দু ধর্মে দ্রাবিড়দের দান হল শিবের কল্পনা—প্রাগৈতিহাসিক শিবের—যিনি ছিলেন অনাবাদী পড়ো ক্ষিতীমণ্ডলের মহাদেব।

উত্তরবঙ্গের মঙ্গোলিয় ক্ষুদ্র দল ছাড়া বঙ্গদেশীয় জনগণের উপর উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে আগত মঙ্গোলিয়দের কোনো সাংস্কৃতিক প্রভাব ছিল বলে কোন প্রমাণ নেই।

সংস্কৃত-ভিত্তিক উপ-ভাষাভাষী আর্যরা দলের পর দল হাজার হাজার বছর ধরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নেমে আসেন। পারস্য হয়ে পশ্চিম থেকে সবচেয়ে প্রথম আগত আলপাইন গোষ্ঠীর আর্যরা বৈদিক যুগের বহু পূর্বেই স্থির হয়ে বসতি স্থাপন করেন বলে অনুমান করা হয়। কারণ, তাঁরা বৈদিক আচার বিচার ও ক্রিয়াকর্ম মানতেন না। সম্ভবত, এঁদের এমন কোনো সংস্কৃতি ছিল যা বৈদিক আর্যদের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন।

বৈদিক আর্যগণ ঠিক কোন্ সময়টায় বেশি সংখ্যায় ভারতে প্রবেশ করেন তা সুস্পষ্টভাবে ঠিক করা যায় না। কিন্তু এটা সন্দেহাতীত যে তাঁদের প্রথম দিকের আদিভৌতিক সংস্কৃতি তাঁদের সংস্পর্শে-আসা দেশী লোকদের সংস্কৃতি থেকে অনেকটা "সেকেলে" ছিল। তাঁরা রাখাল শ্রেণীর উপজাতি—গরু চরাতেন, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেন, উৎসর্গীকৃত ঝলসানো গোমাংস ও অন্যান্য মাংস খেতেন। সম্ভবত প্রথম দিকে স্থানীয় লোকদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁদের বিরুদ্ধতা ছিল। আরো মেলামেশার পর তাঁরা এসবের মর্যাদা দিতে লাগলেন। সর্বশেষে ঘটল সংমিশ্রণ, আর তাতেই সৃষ্ট হল একটা মিশ্র সভ্যতা।

প্রাচীন যুগ

নিশ্চিত বলা যায় যে বৈদিক যুগে আর্যগণ পূর্বভারতে প্রবেশ করেন নি, এবং পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ নামে খ্যাত স্থানের লোকজনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। এসব লোকদের তাঁরা "পক্ষী" ও "দস্যু" নামে উল্লেখ করতেন। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগের শেষ দিকে আর্য ও অনার্য অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে একটা রাজনৈতিক প্রথা গড়ে উঠেছিল, যাতে করে উভয় অঞ্চলগুলিই ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল এবং দুই অঞ্চলের ভিতর মিত্রতার ও শত্রুতার দ্বিমুখী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। অন্তত তিনটি এরূপ বঙ্গদেশী রাজ্যের কথা মহাভারতে আছে—বঙ্গ, পৌণ্ড্র ও তাম্রলিপ্ত। মহাবল অর্জুন উত্তরবঙ্গে এবং আরো পূর্ব দিকে, বর্তমানে যাকে মণিপুর বলা হয়, এবং নাগা দেশে অভিযান করেন।

বঙ্গদেশ নামের উৎপত্তি হল কী করে? আর এ দেশের কোন্ অংশ প্রথমত এই নামে পরিচিত ছিল? মহাভারত অনুযায়ী বঙ্গ নামটি রাজা বঙ্গের রাজ্য ভাগকেই দেওয়া হয়েছিল। রাজা বঙ্গ হলেন পৌরাণিক কাহিনীর রাজা বলির ছেলে। বলি ছিলেন পাতাল বা ভূগর্ভতলের রাজা। বঙ্গ থেকে বঙ্গাল বা বাঙ্গলা খুবই স্বাভাবিক অপভ্রংশ। মনে হয়, এই স্যাঁতসেঁতে এলাকা ঘিরে ছিল পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূবে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা, দক্ষিণে সমুদ্র। উত্তরাংশে ছিল পৌণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গের পূর্বভাগ), বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গের পশ্চিম ভাগ), রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গের উপরিভাগ), তাম্রলিপ্তি (পশ্চিমবঙ্গের নিচু ভাগ) এবং গৌড় (মধ্যবঙ্গ)। বিভিন্ন রাজা বিভিন্ন সময়ে এসব দেশ অধিকার করেছিলেন বলে এগুলির সীমানার কোন স্থিরতা ছিল না। এক সময় রাজনৈতিক বঙ্গের সমস্তটাকেই গৌড় বলা হত। মোগল আমলে শুধু সমগ্র বঙ্গভূমিই নয়—বিহার এবং উড়িষ্যাও সুবে বাঙ্গলার অন্তর্গত ছিল।

মৌর্য রাজত্ব ও পরে

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই গ্রাম-সমিতিগুলির শাসন ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল—সম্ভবত বংশগত রাজতন্ত্রে। এগুলির মধ্যে কয়েকটি যে বেশ শক্তিশালী ছিল তা আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের সহচর গ্রীক লেখকদের বিবরণী থেকে জানা যায় (খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দী)। তাঁরা ভাগীরথীর পশ্চিমকূলবর্তী প্রভৃত সামরিক শক্তিসম্পন্ন গঙ্গারিডি (গঙ্গাহৃদি) নামে এক রাজ্যের উল্লেখ করে গেছেন। মগধের (বিহার) অন্তর্গত পাটলিপুত্র (অধুনা পাটনা) থেকে মৌর্য রাজারা প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে রাজ্য করছিলেন। তাঁরা সম্ভবত পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের রাজ্যগুলি দখলে এনেছিলেন। খৃঃ পূঃ 170 সালের কাছাকাছি সময়ে ওই রাজত্বের বিলোপ হলে এই রাজ্যগুলি আবার স্বাধীন হয়।

ইতিমধ্যে মৌর্য সম্রাটগণের আনুকূল্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হল। বৌদ্ধ যাজকগণ

স্বাধীন রাজ্যগুলিতেও ছড়িয়ে পড়লেন। বৌদ্ধধর্মমতগুলি মোটামুটি ভাবে আগেকার অনার্য রীতিনীতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। সেরকম হয়েছিল তখনকার জৈন ধর্মবাদও। বাঙ্গালীর গ্রহণশীল মনের ছাঁচে এ সমস্ত মতবাদের মিলিত প্রতিক্রিয়াস্বরূপ গঠিত হল এক জোরালো অবৈদান্তিক ধর্ম বিশ্বাস। বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ও জৈন মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে।

বঙ্গদেশের পরবর্তী পাঁচ শতকের রাজনৈতিক ইতিহাস এখনো অজ্ঞাত। মোটের উপর অনুমান হয়, প্রচুর খাদ্যবস্তু উৎপাদন ও রপ্তানী-বাণিজ্য হেতু যুগটা শান্তি স্বচ্ছলতার যুগ ছিল। গ্রীক ও সিংহলীদের বিবরণীতে গঙ্গানগর বা গঙ্গাবন্দর নামে একটি সামুদ্রিক বাণিজ্য-কেন্দ্রের উল্লেখ আছে। এই নগর গঙ্গার কোন একটা মোহানার পাশে প্রতিষ্ঠিত ছিল। জানা যায় যে, এই নগরটিই ছিল গঙ্গাহৃদি (বঙ্গ) রাজ্যের রাজধানী। রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ছিল প্রবাল, মিহিবোনা কাপড়, রেশম ইত্যাদি অনেক কিছু। অন্যান্য বাণিজ্য-কেন্দ্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল তাম্রলিপ্ত (অধুনা তমলুক) ও কর্ণসুবর্ণ (অধুনা মুর্শিদাবাদে)। নদীপথ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চল যুক্ত করে বড় বড় সড়ক ছিল। এতে করে আর্যাবর্তের পশ্চাদ্ভূমি এবং পূব দিকে চীন অবধি যাওয়া যেত। বৌদ্ধ ও জৈন মঠ সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জৈন মঠগুলি পশ্চিম অঞ্চলেই বেশি দেখা যেত। এই সড়কগুলির বরাবরই আজকের দিনের রেলপথ গড়ে উঠেছে।

মগধে গুপ্তবংশের (320—480 খৃঃ অঃ) অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বঙ্গবিজয় শুরু হয়। এই গুপ্ত বংশের সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বঙ্গ দেশের রাজ্যগুলিকে নিজে করায়ত্ত করলেন। তাঁর রাজ্য কৃতিত্বের সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন তাঁর উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্য। গুপ্তরা ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ছিলেন এবং বঙ্গদেশে বহুসংখ্যায় পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের বসতি করান। গুপ্তরাজারা শুধু যে বঙ্গদেশের বন্দরগুলির সঙ্গে ইউরোপের মধ্যসাগর (মেডিটেরেনিয়ান) অঞ্চলস্থ দেশ সমূহের, প্রধানত রোমের, ব্যবসা বাণিজ্যের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন তা নয়; তাঁরা বৌদ্ধ, জৈন ও দ্রাবিড়ী প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় ধর্মগুলির প্রতিও উদার মনোভাব দেখাতেন। এইসব ধর্ম অবলম্বীরাই প্রজাদের মধ্যে সংখ্যায় বেশি ছিলেন। গোঁড়া ব্রাহ্মণগণ ছাড়া গুপ্তদের আনীত অন্যান্য হিন্দুরা দেশীয়দের সঙ্গে মেলামেশা শুরু করলেন। হিন্দুদের আচার-বিশ্বাস স্থানীয় লোকদের আচার-বিশ্বাসের সঙ্গে মানিয়ে চলতে লাগল আর তাতেই পরে বাঙ্গালী হিন্দুত্বের গোড়া পত্তন হল।

বঙ্গে হিন্দুধর্ম

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর পূর্ব এবং দক্ষিণ বঙ্গদেশ সপ্তম শতাব্দী অবধি একই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণ সুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক কনৌজ রাজ হর্ষবর্ধনকে পরাজিত করে বঙ্গদেশে ও আর্যাবর্তের অনেক অংশে তাঁর অধিকার বিস্তার করলেন। রাজা শশাঙ্ক হিন্দু ছিলেন এবং ধর্মান্তরণ কাজে উৎসাহ দেখাতেন।

বৌদ্ধদের উপর অত্যাচারের জন্য তাঁকেই দায়ী করা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর সাম্রাজ্যের পতন ঘটল এবং বঙ্গদেশের পশ্চিম ভাগ কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের কবলে পড়ল। স্থানীয় আচার পদ্ধতির সংস্পর্শে এসে সনাতন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের গ্লানি ঘটেছিল। তা পুনঃসংস্কারের জন্য কাশ্মীরের হিন্দু রাজাদের রাজত্বের সময় কান্যকুব্জ থেকে বিভিন্ন দলে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আমদানী করা হয় বলে কথিত আছে। কিন্তু নতুন আগন্তুকরা আবার আস্তে আস্তে বাঙ্গালীদের সংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে মিলে যেতে লাগলেন—অবশ্য কিছু গোঁড়া নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছাড়া। রাজকীয় ফরমান তাঁদের জাতি-বর্ণের উচ্চস্তরে বসিয়ে দিয়েছিল। তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী ইতিমধ্যেই ঠিক ঠিক বৈদিক বিধান মেনে চলছিল না। ক্রমে ক্রমে তাঁরা আচার-বিচারে মৌলিক বিশেষ অদলবদল না করে "নিচু" জাতদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে লাগলেন। জাতের যে কাঠামো তাঁদের চোখে পড়েছিল তা ছিল পুরো-পুরি দেশজ—চার শুদ্ধ-বর্ণের ভিতর বিশৃঙ্খল অসবর্ণ মিশ্রণ। দ্বাদশ শতাব্দীতে কারিকাভুক্ত 41 টি মধ্যশ্রেণীর জাতের ভিতর ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের কোন উল্লেখ নেই। "শুদ্ধ" জাতের পুরোভাগে ছিলেন "করণ" বা কায়স্থ এবং "অম্বষ্ঠ" বা বৈদ্য। এঁরা ব্রাহ্মণদের পৌরহিত্য পাবার অধিকার পেয়েছিলেন। লক্ষণীয় এই যে, সমাজকে যাঁরা ধন সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের চালান করা হয়েছে জাতির তালিকার একটা তুচ্ছ স্থানে। মেথর, ধোবা এবং অন্যান্য সমাজ-সেবীরা অন্তর্ভুক্ত হলেন "অশুচি" এবং অস্পৃশ্য দলে। স্পষ্টই দেখা যায় যে, যাঁরা অ-ব্রাহ্মণিক রীতিনীতি মেনে চলতেন তাঁদের সকলকে একলপ্তে শূদ্র নাম দেওয়া হয়েছে। বর্তমান কালে অর্থনৈতিক বুনিয়াদে ভাঙ্গন ধরার সময় পর্যন্ত এই শ্রেণী-বিভাগ প্রায় অটুট অবস্থায় থেকে যাচ্ছিল। ব্রাহ্মণরা এবং সরকারি কর্মচারী জাতের লোকরা সেরা সুখসুবিধাভোগী ছিলেন।

এবারে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের কথায় ফিরে যাওয়া যাক। রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর চারদিক থেকে আক্রমণে এবং রাজারাজড়াদের ভিতর মারাত্মক যুদ্ধে দেশ বিধ্বস্ত হতে লাগল। কাজঙ্গল (মালভূমি প্রান্ত), পুণ্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ (বা গৌড়) তাম্রলিপ্ত এবং সমতট (বা বঙ্গ)—এই পাঁচটি প্রধান রাজ্যের ভিতর প্রথম চারটি সামন্ত রাজাদের বিদ্রোহ-হেতু ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হচ্ছিল। সেখানে সম্পূর্ণ অরাজকতা চলছিল। পাঁচ শতকের শেষভাগে রোমান সাম্রাজ্যের অধোগতি ও পতন হয়, তার ফলে, ক্রমে ক্রমে সামুদ্রিক বাণিজ্যের শোচনীয় অবনতি ঘটে, অর্থনৈতিক অবস্থা বিপন্ন হয়। আরব ও পারস্যের সামুদ্রিক শক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রধান গতিপথ চলে গেল ভারতের পশ্চিম উপকূলে। বাইরের দুনিয়া থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বঙ্গদেশ প্রধানত একটা কৃষিপ্রধান অঞ্চলে পরিণত হল। পশ্চিমে ও পূর্বে শুধুমাত্র স্থলপথে ব্যবসা বাণিজ্যের রাস্তাগুলি খোলা রইল। সমাজ হয়ে পড়ল গতিহীন। আর্থিক ব্যাপারে কৃষি-শিল্পের এবং কোনো রকমে খেয়ে থাকার উপযোগী গ্রাম-শিল্পের উপর ভরসা করে চলতে লাগল।

হাতে আঁকা চিনেমাটির জিনিস। পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মুখ্য শিল্প

পুরুলিয়ায় রেশমকীটের চাষ

→

সূক্ষ্ম কারুকার্যের কাঠের নৌকা। মুর্শিদাবাদের শিল্পীদের
অনন্যসাধারণ কাজের নমুনা
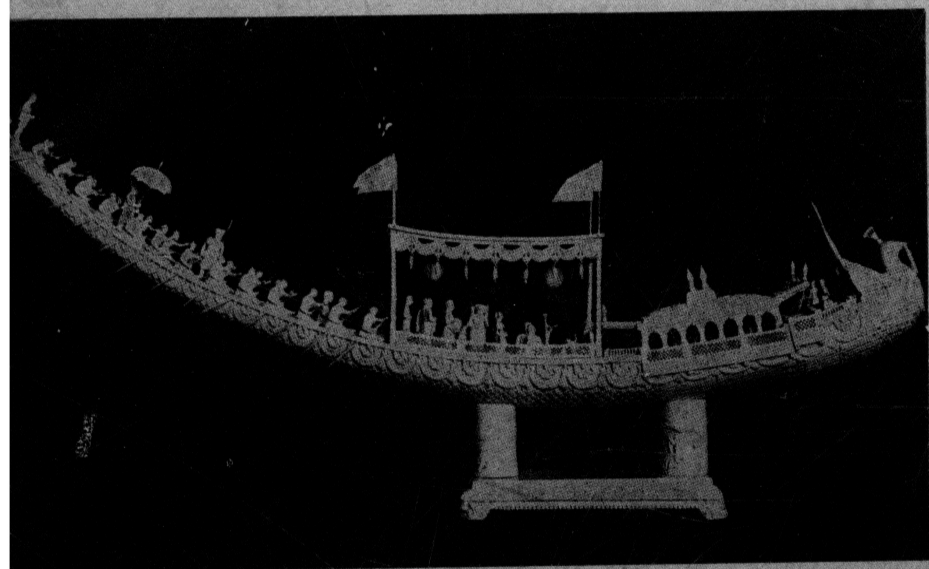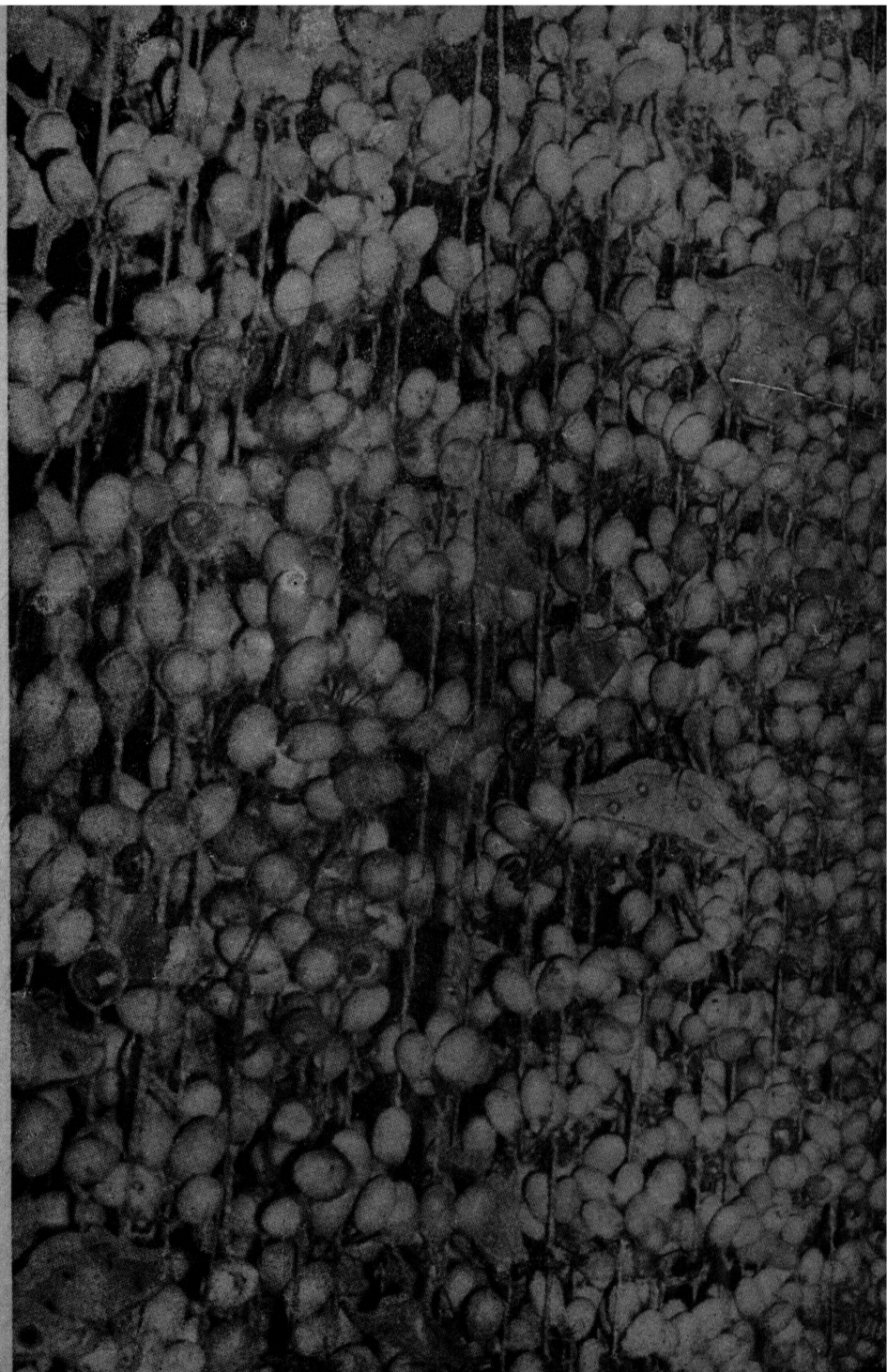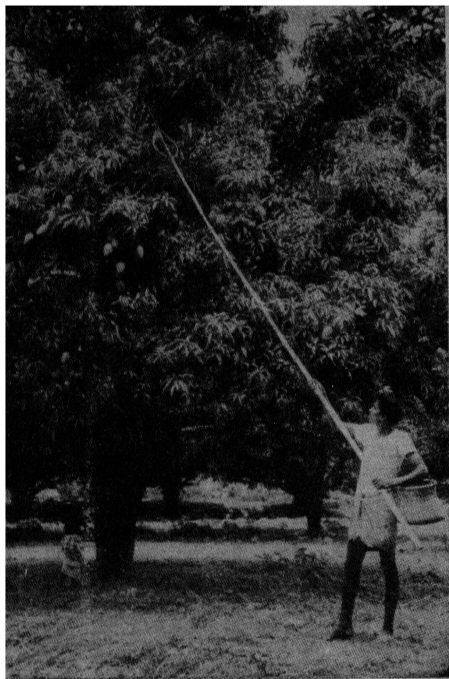
বিখ্যাত মালদার আম পাড়া হ'চ্ছে। মালদা
জেলার নামের অনুসরণে এই নাম।

জেলেদের জালে

পাল যুগ

একশ' বছর এমনি ধারা অরাজকতা ও অর্থনৈতিক অবনতির পর সামন্ত দলপতিরা অস্ত্র সংবরণ করে নিজেদের ভিতর থেকে একজন রাজা নির্বাচিত করলেন। রাজাটি হলেন গোপালদেব। এঁর থেকে শুরু হল চার শতাব্দীব্যাপী পাল রাজত্ব। তাঁর নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য হল এত যে, তিনি কোন রাজকুলে জন্মান নি, কোন উচ্চ জাতিতেও না। তামাম বঙ্গদেশ একই রাজার আধিপত্যে আনার ও আর্যাবর্তের অনেকটার উপর মালিকানা করার কৃতিত্ব তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্মপালেরই প্রাপ্য। তৃতীয় পাল রাজা দেব পালের মৃত্যুর পর পালদের সামরিক শক্তিতে ভাঁটা পড়ে এবং 988 খৃষ্টাব্দের ভিতর বাংলা কম্বোজ (উত্তর-পশ্চিম বঙ্গদেশ) রাজ রাজ্যপালের অধীনে এসে যায়। কিন্তু পাল-সাম্রাজ্য অঙ্গ ও মগধে জীয়ন্ত থাকে এবং আবার বঙ্গদেশের বেশির ভাগ অংশ পাল সাম্রাজ্যের ভিতরে ফিরে আসে। 1075 সালে নিচু জেলে জাতের জায়গীরদার দিবা অত্যাচারী রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত করেন। আবার পাল রাজত্ব ফিরিয়ে আনলেন মহীপালের ভাই রামপাল। রামপাল অধিকাংশ সামন্ত রাজগণের সাহায্য পেতে কৃতকার্য হন এবং গৌড়ের নিকটবর্তী রামাবতী নামে এক নগরের পত্তন করে সেখানেই রাজধানী বানান। বস্তুত পালরা গঙ্গার উপনদীগুলির পারে পারে অনেক নগর নির্মাণ করে গেছেন। রামপালের মৃত্যুর পর পাল রাজত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। একেবারে বিলুপ্ত হয় 1155 খৃঃ এর ভিতর।

পালরা ছিলেন বৌদ্ধ কিন্তু ধর্ম ব্যাপারে তাঁরা উদার ছিলেন। বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠ-পোষক হিসেবে ধর্মপাল ও রামপালের নাম বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা অনেক বিহার বা বৌদ্ধ ধর্মচর্চার কেন্দ্র স্থাপিত করেন। এসব বিহারে বিজ্ঞান, সাহিত্য কলাবিদ্যা এবং অন্যান্য ধর্মতত্ত্বের উচ্চ শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও ছিল। পাল রাজারা সংস্কৃত শিক্ষা-কেন্দ্রগুলির এবং সংস্কৃত গ্রন্থকারদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং তিব্বত, চীন, মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়াতে বৌদ্ধ-পণ্ডিত ও ভিক্ষুদের প্রেরণ করেছিলেন। ঐ সময় বজ্রযান বৌদ্ধ মতের প্রচলন ছিল। বজ্রযান হল মহাযান মতের একটা বিশেষ ধারা—এর থেকেই রহস্যময় সহজিয়া মতের উদ্ভব হয়। এই নতুন ধাঁচের বৌদ্ধ মতবাদ তন্ত্রবাদ ও বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে একটা সমন্বয় ঘটিয়ে তোলে যাতে করে সৃষ্টি হয় নবরূপ নিয়ে শক্তিবাদ—যার এক পা ছিল ভক্তিবাদে আর এক পা তন্ত্রবাদে। এই নবরূপী শক্তিবাদ সেই সময় থেকে বাঙ্গলার ধর্মানুশীলনের উপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। এই ঘাত প্রতিঘাতে এবং প্রথম দিককার মুসলীম রাজাদের নির্যাতনে বৌদ্ধধর্ম আস্তে আস্তে চালু ধর্মমত হিসাবে মধ্যযুগে অন্তর্ধান করল—মিশে গেল মূল হিন্দু ধর্মের বহু-মহলা প্রাসাদের মর্মরে মর্মরে।

এ যুগের সামাজিক ব্যবস্থায় ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকদের প্রভাব প্রতিপত্তির অবনতি ঘটে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি ঘটে যোদ্ধা-সম্প্রদায়ের। সামন্ত-

তান্ত্রিকতার দিকে একটা স্পষ্ট ঝোঁক দেখা যায়। সহর অঞ্চলগুলি ছিল যোদ্ধা ও ধনী লোকদের আস্তানা। তাঁদের চালচলনে একটা বৈদগ্ধাভিমানী ও বিলাসী মনোভাব দেখা যেত। এই চালচলন ছিল গ্রামদেশের বিশাল জনমণ্ডলীর সরলতা ও ছলকলাহীন জীবন যাত্রার একেবারে বিপরীতমুখী। সহরে লোক খোলাখুলি গ্রামাঞ্চলের জীবন-যাত্রাকে ঘৃণা করতেন। ইঁটের তৈরী পুরানো সহরের ধ্বংসাবশেষ থেকে এবং অধুনা আবিষ্কৃত পুরানো মন্দিরসমূহের শক্ত পোড়ামাটি শিল্প থেকে প্রতীয়মান হয় যে তখন স্থাপত্যবিদ্যা ও কারুশিল্প উৎকর্ষের চরমে পোঁছেছিল। জাতিভেদের জগদ্দল পাথর তখনো এতটা চেপে বসেনি। বেশ একটু উচ্চমানের স্বয়ম্ভরতার আবহাওয়া বিরাজ করত। গরীব লোক বলে কেউ ছিল না তা নয় কিন্তু শান্ত গ্রামীন জীবনযাত্রা উচ্চস্তরে রাজায়-রাজায় যুদ্ধে ও রাজা বদলে কোনো প্রকারে বিঘ্নিত হত না। সর্বশেষে, ভিন-দেশী নন বলে পাল-রাজারা বাঙ্গালীর ভিতর একটা আঞ্চলিক চেতনা-বোধ জন্মাতে সাহায্য করতে পেরেছিলেন। আজও তাঁরা বেঁচে আছেন রূপকথায় ও লোক কাহিনীতে—যা ঘটেনি তাঁদের আগের ও একেবারে পরের কারো বেলায়।

পাল-রাজ্যের পতনের পর বঙ্গদেশ সেন রাজাদের অধিকারে আসে। সেন রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা কর্ণাটি ব্রাহ্মণ বংশের হেমন্ত সেন পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চল জয় করেন। তাঁর ছেলে বিজয় সেন তাঁর কর্তৃত্ব বঙ্গদেশের বহুদূর অবধি বিস্তার করেন। বিজয় সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বল্লাল সেন (1158—1179) তাঁর পুত্র লক্ষ্মণ সেনের সেনাপতিত্বে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ এবং বঙ্গরাজ্য তাঁর অধীনে আনেন। লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনে বসেন বল্লালের পরে (1179—1205)। সেনগণ গোঁড়া হিন্দু এবং বঙ্গের সংস্কৃত সাহিত্য চর্চায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ জাতের ভিতর কৌলীণ্য প্রথার (মর্যাদা বিভাগ) নির্মাতা বা অন্ততপক্ষে দৃঢ় প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে জন সমাজে বিদিত আছেন। লক্ষণ সেন অন্যান্য কবিদের সঙ্গে মহাকবি জয়দেবের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। জয়দেবের কাব্যগ্রন্থ "গীতগোবিন্দ" পরবর্তী কালের সংস্কৃত সাহিত্য-কুঞ্জের পরম মধুর কুসুমিত শ্রী। "গীতগোবিন্দ"-ই পবিত্র কৃষ্ণরাধা প্রেম-গাথার প্রথম লিখিত রূপায়ণ এবং বাংলা ভাষায় পরবর্তী কালের বৈষ্ণব-সাহিত্যের অগ্রদূত।

তুর্কীদের আগমন

কিন্তু আবার শুরু হল গাঙ্গেয় উপত্যকায় হিন্দুরাজগণের আত্মঘাতী যুদ্ধ। বহুকাল বিদেশী আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকায় তাঁদের সামরিক ব্যবস্থায় ঘুণ ধরেছিল। ছোট রাজাদের মধ্যে একতার অভাব ও হানাহানির সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা তাঁদের দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনাদলের সাহায্যে ইতিমধ্যেই পূব দিকে ধেয়ে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে বখতিয়ার খিলাজ নামে একজন ভাগ্যান্বেষী তুর্কী সৈনিক মগধ রাজ্য জয় করেছিলেন এবং এক অভূতপূর্ব হত্যালীলায় হাজার হাজার

অসামরিক লোককে নিহত করেন। কী উপায়ে তিনি 1201 সালে লক্ষ্মণ সেনের দ্বিতীয় রাজধানী নবদ্বীপে রাজার অবস্থিতির সময়ে গৌড়ে হানা দিতে সমর্থ হয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না। এটা অবশ্য নিঃসন্দেহে বলা চলে যে বক্তিয়ার খিলজি প্রায় নির্বিরোধেই গৌড়রাজ্য জয় করেছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন জ্যোতিষীদের পরামর্শ মতো তাঁর অমাত্য পরিজনসহ বঙ্গ অঞ্চলে পলায়ন করে বিক্রমপুরে (অধুনা ঢাকা জেলায়) রাজধানী স্থাপন করেন। এখানে বসেই তিনি বখতিয়ারের পূব দিকে ধেয়ে আসাকে সফলভাবে বাধা প্রদান করেন। তাঁর পুত্রগণ আরো অর্ধশতাব্দী কাল পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন। অন্যান্য তুর্কী মুসলমানদের মত বখতিয়ারও বৌদ্ধদের প্রতি একটা বিশেষ বৈরীতা পোষণ করতেন। মধ্য এশিয়ার পরাক্রান্ত যুদ্ধবাজগণ এই বৌদ্ধ সমাজভুক্ত ছিলেন। তাঁরা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পূব দিকে মুসলীম শক্তি প্রসারের প্রধান অন্তরায়। যেসব বৌদ্ধপণ্ডিতগণ বখতিয়ারের হত্যালীলা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন তাঁরা পালিয়ে গেলেন নেপালে—সঙ্গে নিলেন তাঁদের বহুমূল্য পুস্তকগুলি আর বিগ্রহ মূর্তি। এই নেপালই এখন পাল যুগে রচিত অধিকাংশ সাহিত্যের মজুদ ভাণ্ডার। বক্তিয়ার কিন্তু বঙ্গদেশ জয়ের পর মাত্র দু'বৎসর বেঁচে ছিলেন। তিনি তাঁর সেনাধ্যক্ষ আলী মরদানের হাতে নিহত হন। আলী মরদান দিল্লীর সুলতান কুতুবুদ্দিন আইবকের অনুগ্রহ লাভ করতে পেরেছিলেন এবং সেহেতু সরকারীভাবে বঙ্গদেশে কুতুবুদ্দিনের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সুলতানের মৃত্যুর পর মরদান দিল্লীর অধানতা অস্বীকার করে নিজেই সুলতানের তক্তে বসে পড়লেন। রাজদরবারের একটা অন্তঃবিদ্রোহে তাঁকে সিংহাসন হারাতে হল এবং গিয়াসুদ্দিন ইয়াজ খিলজি সুলতান হলেন। গৌড় হল তাঁর রাজধানী। তিনি চৌদ্দ বছর দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করার পর দিল্লী থেকে যুবরাজ নাসীরুদ্দিনের প্রেরিত এক আক্রমণকারী দল তাঁকে পরাজিত করে তাঁর মস্তক ছিন্ন করে দিল। নাসীরুদ্দিন আবার নিজেই মরে গেলেন কিছুকাল পরেই। পরবর্তী প্রতিনিধি আমিন খাঁ ছিলেন তাঁর সেনাপতি তুঘরীল খাঁয়ের হাতের পুতুল। তুঘরীল সুযোগ পেয়েই নিজেকে বঙ্গদেশের স্বাধীন সুলতান বলে ঘোষণা করলেন। দিল্লী থেকে শাস্তি দেবার জন্য পাঠানো তিনটি সৈন্যবাহিনীর তিনি সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করেছিলেন। শেষকালে দিল্লীর সুলতান বলবন মিথ্যা দাবিদারকে শায়েস্তা করার জন্য এক বিরাট সমর অভিযান করলেন। তুঘরিল তাঁর সমস্ত ধনদৌলত লোকলস্কর সহ পালিয়ে গেলেন উড়িষ্যায়, কিন্তু সেখানে ধরা পড়ে গেলেন। তাঁর সমস্ত পরিবার পরিজন ও বন্দীসৈন্য সহ তাঁকে হত্যা করা হল। এই ভীষণ হত্যালীলার উদ্দেশ্য ছিল ভয় দেখিয়ে সায়েস্তা করা—ভবিষ্যৎ বিদ্রোহ-কামীদের ভিতর আতঙ্ক সৃষ্টি করা।

বলবন তাঁর ছোট ছেলে বুগড়া খাঁকে বাঙ্গলার মসনদে বসালেন। বুগড়া খাঁ বঙ্গদেশের ভোগসুখে চুর হয়ে থাকতেন। দিল্লীর পাটের উত্তরাধিকারী

হবার জন্য পিতার আহ্বানে তিনি কান পাতলেন না। 1286 সালে বলবনের মৃত্যুর পর নাসীরউদ্দিন নাম নিয়ে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন—দিল্লীর সিংহাসন পড়ে রইল রাজদরবারের ষড়যন্ত্রীদের হাতে। শেষটায় তাঁর পুত্র কায়কোবাদকে সুলতান করা হয়। নাসীরুদ্দিন তাঁর ছেলের বিরুদ্ধে একটা পিটুনি অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছিলেন। ছেলে কোনো গণ্ডগোল না করে বশ্যতা স্বীকার করল এবং পুত্রকে সমঝিয়ে পিতা তাঁকে আবার সিংহাসনে বসালেন। পরিণামে, কিছুকাল পরেই কায়কোবাদ নিহত হলেন। তাঁর শিশুপুত্রকে রাজা করা হল। সেও কয়েকদিনের মধ্যে নিহত হল। এইবারে, 1290 সালে, খিলজি যুগের অভ্যুত্থান হল—দিল্লীর দাস রাজবংশের লোপাট ঘটল।

স্বাধীন সুলতান-শাহী

চল্লিশ বছর ধরে খিলজিগণ পশ্চিম ও দক্ষিণভারতে বিজয়-অভিযান চালনায় ব্যস্ত ছিলেন এবং বঙ্গদেশ স্বাধীনরাজ্যের মর্যাদা উপভোগ করে আসছিল। নাসীরুদ্দিনের বংশধরদের মধ্যে বিখ্যাত হলেন তাঁর পৌত্র সামসুদ্দিন ফিরোজশাহ (1302-22)। তিনি গৌড় থেকে নদীর অপর পারে পাণ্ডুয়ার রাজধানী বদল করেন এবং ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব তীর অঞ্চল অবধি মুসলীম আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ছেলে গিয়াসুদ্দিন বাহাদুর গৌড়ের সহরতলী লক্ষ্মণাবতীতে বাস করে রাজত্ব করতেন। তিনি দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন তুঘলক কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। গিয়াসুদ্দিনই বঙ্গদেশে দিল্লীর সুলতানশাহীর পুনঃপ্রবর্তন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী মহম্মদ তুঘলক (1325-51) বঙ্গদেশকে তিনটি প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করেন। মহম্মদ তুঘলকের সুনাম সম্বন্ধে সকল পণ্ডিত একমত নন। রাজ্যপালগণ অবিলম্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং দিল্লীর খামখেয়ালী বাদশাকে অবজ্ঞা দেখাতে লাগলেন।

প্রথমদিককার মুসলমান বিজেতারা ধর্মান্তকরণের কাজে খুব উৎসাহী ছিলেন। তরবারির ভয় দেখিয়ে স্থানীয় জনগণকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করতেন। কিন্তু এই নীতি স্থানীয় জনসাধারণের কিছু কিছু অংশে মাত্র ফলপ্রসূ হয়েছিল। বাংলার মধ্যযুগের যে-সকল কাহিনী এখনো চলতি আছে তাতে 14 জন গাজীর (ধর্ম-যোদ্ধার) উল্লেখ আছে। তরবারির জোরে তাঁরা বঙ্গদেশে মুসলমান ধর্ম প্রচার করেছিলেন, আবার গল্প আছে মুসলীম পীর (সাধু) ও দয়াপরায়ণ গাজীদেরও—যাঁরা ধীরভাবে বুঝিয়ে সুজিয়ে ওই কাজ করতেন। পাঁচ-পীরের কাহিনী ভারতের অন্যান্য বহুস্থানেও চলিত আছে। এসব থেকে ভারতের সামাজিক ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার অনেক ভাল ভাল উপাদান পাওয়া যায়। ধর্মে ভাঙ্গন রোধ করবার জন্য নিষ্ঠাবান হিন্দুসমাজ একটা কঠোর গোঁড়ামীর পাচীর দাঁড়া করাল। কিন্তু জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ ব্রাহ্মণ ধর্মের মাপকাঠিতে হিন্দু ছিলনা এবং এমন কোনো দৃঢ় প্রমাণ নেই যে নিছক ভয়ে বা তোষামোদে গলে গিয়েই সর্বক্ষেত্রে

ধর্মান্তরণ করা হত। ধর্মান্তরিত চাষী কর্মীরা গ্রামদেশে তাঁদের বংশগত পেশা রক্ষা করে চলতেন এবং এঁরাই মুসলমানদের ভিতর আর একটা বিশিষ্ট সমাজ—প্রধানত বাঙ্গালী মুসলীম সমাজ—সৃষ্টি করেছিলেন। প্রথমদিককার লুণ্ঠন-বিলাসী মুসলীম রাজাদের ক্রিয়াকলাপে দেশের আর্থিক অবস্থায় খুব একটা আঘাত লেগেছিল বলে মনে হয় না। মুসলমানদের আগমনের আগে থেকেই কৃষিপ্রধান বঙ্গদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতির জন্য টাকাপয়সার অভাব ঘটেছিল। লেনদেনের ব্যাপারে পণ্য বিনিময় প্রথা বিশেষ করে গ্রামদেশে চালু ছিল। সহর অঞ্চলের সমৃদ্ধ হিন্দু মন্দিরগুলি এবং পূর্ববর্তী শাসক সম্প্রদায়ের ও বণিকদের মজুত ধনদৌলতের প্রতি লুণ্ঠনপ্রিয় যুদ্ধবাজ মুসলীম সেনানায়কদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল।

সুলতান ফিরোজশা তুঘলকের (1351-89) সমসাময়িক ও দক্ষিণবঙ্গের একজন স্বাধীন রাজা ইলিয়াস খাঁ নেপাল, ত্রিহুত ও উড়িষ্যা লুণ্ঠন করেন এবং ফলত বঙ্গদেশের সমস্ত খণ্ড প্রদেশগুলির হর্তাকর্তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। দিল্লীর সুলতান তাঁর বিরুদ্ধে এক অভিযান চালিয়ে তাঁকে একডালা নামক উত্তরবঙ্গের এক গুপ্ত-আশ্রয়ে পরাস্ত করেন। কিন্তু পরে দিল্লীশ্বরের সামন্তরাজা হিসাবে তাঁকে পুনরায় বঙ্গদেশের এক অংশের মালিকানা দেওয়া হয়। তাঁর ছেলে সিকান্দর শা একজন কৃতী শাসক ছিলেন। অন্যান্য কাজের সঙ্গে তাঁর একটা কাজ হল, অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে সেগুলির মালমসলা দিয়ে পাণ্ডুয়ার নিকট আদিনাতে একটি বিরাট মসজিদ তৈরি করা। অন্যান্য অনেক মুসলীম শাসকগণও তাদের ধর্মমতকে বাহবা দেবার জন্য এহেন বর্বরতার আশ্রয় নিতেন। সিকান্দরের শেষ জীবনে তাঁর পুত্র বিদ্রোহ করে সুলতান গিয়াসুদ্দিন আজমশা নাম নিয়ে পূর্ব এবং মধ্য-পশ্চিমবঙ্গে নিজের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমসাময়িক বিবরণীতে তাঁর সবিশেষ সাহিত্যানুরাগ এবং ন্যায়পরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা আছে। ভারতের অন্যত্র অন্যান্য মুসলমান শাসকদের মতো তিনিও মুসলমানী শরিয়তী ফারমান জোরজবরদস্তি করে জারি করতে চাইতেন না। জনৈক কাজীর সঙ্গে তাঁর বাগ-যুদ্ধের বিখ্যাত গল্প এখনো চলতি আছে—কাজী তাঁর মোটা রকমের জরিমানা করেছিলেন দৈবক্রমে নরহত্যা ঘটানোর জন্য।

ক্ষণস্থায়ী হিন্দু রাজত্ব

1409 সালে গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর রাজা গণেশ নামে উত্তরবঙ্গের এক হিন্দু সামন্ত নেতা বিদ্রোহ করে বসলেন এবং রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখলে এনে সকল শ্রেণীর প্রজাদের উপর ন্যায়পরায়ণতা ও নিরপেক্ষতা দেখিয়ে রাজত্ব করে গিয়ে-ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় এবং দিল্লীর সঙ্গে তাঁর মিলমিশের কথা কমই জানা যায়। কিন্তু এটা ঠিক যে, হিন্দুমুসলমান উভয় দলের আঞ্চলিক প্রভুদের মধ্যে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। সম্ভবত সামন্ত রাজাদের কাছ থেকে প্রভূত সমর্থন পেতেন বলেই তাঁর রাজত্ব এতটা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। তাঁর ছেলে জালালুদ্দিন মহম্মদশা

(1415-31) নামে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর কোনো গোঁড়ামী ছিলনা, তিনি "ন্যায় ও সত্যের পূজারী ছিলেন", অনেক হিন্দুকে শাসন ব্যবস্থায় উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাঁটি হিসাবে চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নতি তাঁর দ্বারাই সাধিত হয়। সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তের দিন পূর্বেই গত হয়েছিল। অন্য আর একটা বড় বন্দর ছিল 'বাঙ্গলা'—এটাই গঙ্গাপুরের অন্য নাম কিনা ঠিক বলা যায় না। তাঁর ছেলে সামসুদ্দিন আহমেদ শা পিতার উদারনীতি অনুসরণ করেছিলেন এবং চীনের সঙ্গে বন্ধুতা বজায় রেখে চলতেন। চীন 1431-32 সালে বঙ্গদেশে দৌত্যকার্যে লোক নিযুক্ত করে।

আহমেদশা কিন্তু অমাত্য মণ্ডলীর কুচক্রে 1435 সালে নিহত হন এবং সিংহাসন দেওয়া হয় ইলিয়াস শা'র এক বংশধরকে। তিনি নাসীরুদ্দিন মহম্মদ শা নাম নিয়ে সতের বছর নিশ্চিত শান্তির পরিবেশে রাজত্ব করেন। নাসীরুদ্দিন সাগর উপকূলের সমৃদ্ধ যশোহর ভূমি (যশোহর, খুলনা, বাখরগঞ্জ) অধিকার করেছিলেন। তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন তাঁর ছেলে রুকনুদ্দিন বারবক শা। রুকনুদ্দিন বাংলা সাহিত্যের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি আরাকানিদের হাত থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন। আরাকানিরা নাসীরুদ্দিনের আমলে চট্টগ্রাম কেড়ে নিয়েছিল। তাঁর ছেলে সামসুদ্দিন ইউসুফ শা পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য বজায় রেখে চলেন। তিনি একজন সাধু ও শিক্ষিত শাসক এবং সুদক্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। এই রাজবংশ 1487 সাল অবধি বঙ্গদেশ শাসন করে।

এদিকে দিল্লীতে ফিরোজশা তুঘলকের মৃত্যুর পর দ্রুত রাজনৈতিক ভেদবিবাদ দেখা দেয়। সুলতানী প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেল এবং সভাসদদের কুচক্রীপনায় সব কিছুই বেসামাল হয়ে পড়ল। এ সময় তৈমুরলঙ্গ সমরখন্দ থেকে হামলা করতে এগিয়ে এলেন, উত্তর ভারতের অঞ্চলগুলি বিধ্বস্ত হল এবং 1398 খৃষ্টাব্দে চরম বর্বরতার সঙ্গে নিষ্পন্ন হল দিল্লীর লুণ্ঠন। লুণ্ঠন সামগ্রীর বিপুল সম্ভারসহ তৈমুর কয়েক মাস পর ফিরে গেলেন। তুঘলকদের শেষ রাজা বিধ্বস্ত দিল্লীতে ফিরে এসে কয়েক বছর নামে মাত্র রাজত্ব করে সৈয়দ রাজ-বংশের কাছে দিল্লীর সিংহাসন ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন (1414—1526)। 1495 সালে বঙ্গদেশের বিরুদ্ধে সিকান্দর লোদীর একটা ব্যর্থ আক্রমন ছাড়া দিল্লীর সুলতানরা তখন নিজেদের নিরাপত্তার দিকেই বেশি নজর দিয়েছিলেন। বাংলার দিকে চোখ পড়ত না। 1526 সালে বাবরের হাতে ইব্রাহিম লোদীর পরাজয়ে দিল্লীর সুলতান-শাহীর শেষ হল, শুরু হল মোগল আমল।

হুসেন শা

প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে বঙ্গদেশ শান্তিপূর্ণ ছিল – দিল্লী থেকে কোনো বড রকমের হুমকি আসেনি, সীমান্তের বাইরে থেকেও না। মুসলমান রাজাদের ভিতর বাধ্য হয়েই একটা আঞ্চলিক চেতনাবোধ জন্মেছিল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে বাধানিষেধমূলক

আইন ও কর-দায় জারি করে মুসলমান ধর্মের প্রভাব বিস্তার করা ছাড়া তাঁরা মোটের উপর বাংলার সংস্কৃতি, ভাষা ও সাহিত্যের সহিষ্ণু সমজদার ছিলেন। 1487 সালে অবশ্য রাজপ্রাসাদের আবিসিনিয় রক্ষীদল সিংহাসন নিজেদের কবলে আনতে পেরেছিল এবং ক্রমান্বয়ে আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্র ও রাজার পর রাজার উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে টিঁকে যাচ্ছিল। এর পরিসমাপ্তি ঘটল 1493 সালের এক সেনা-বিদ্রোহে। সৈয়দ হুসেন শা বাংলার মসনদে বসলেন।

আলাউদ্দিন হুসেন শা নাম নিয়েছিলেন সৈয়দ হুসেন (1493—1519)। তিনি ছিলেন স্বাধীন বাংলার একজন অতি বিশিষ্ট মুসলীম শাসক। আবিসিনিয় আমলের অনিশ্চিত অবস্থার পর তাঁর সুদীর্ঘ শাসনকালে শান্তি ও সমৃদ্ধির একটা নতুন যুগ এসেছিল। তিনি মূলে আরব বংশের। তাঁর পূর্বপুরুষরা বঙ্গদেশের বাসিন্দা হয়ে গিয়েছিলেন। রাজা হয়ে তিনি রাজ-পরিষদ ও কোতোয়ালি গোষ্ঠী থেকে সুবিধা-বাদীদের বিতাড়িত করেন এবং তাঁদের স্থানে নিযুক্ত করেন স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর বিশ্বাসী, সম্ভ্রান্ত বংশীয়দের। তিনি কামাতি ও কামরূপ দখল করে বঙ্গরাজ্য উত্তর-পূর্ব দিকে বিস্তার করেছিলেন। হুসেন শা 1495 সালে দিল্লীর সুলতান সিকান্দর লোদীর সঙ্গে একটা অনাক্রমন চুক্তি পাকা করে নিলেন—যখন দেখা গেল লোদী বঙ্গের পশ্চিম সীমায় সৈন্য-সমাবেশ করছেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি বঙ্গদেশে নির্বিবাদে ও স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি বহু লোককল্যাণকর কাজ করে গেছেন এবং বাংলা সাহিত্যের প্রচুর উন্নতিও তাঁরই তৎপরতায় ঘটেছিল। "হুসেন শা'র রাজত্বকালেই চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। চৈতন্য-ধর্ম বঙ্গদেশের হিন্দুদের ভিতর সমাজ ও ধর্ম-সংস্কারের একটা নতুন যুগ প্রবর্তন করল। হিন্দুদের প্রতি হুসেন শা-র উদার নীতি বাংলার নবজাগরণের একটা মস্তবড় সহায়ক ছিল। সবদিক বিবেচনা করে দেখলে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে হুসেন শা-র রাজত্বকাল বঙ্গদেশে যতটা শান্তি, সমৃদ্ধি ও ব্যাপক উন্নতির যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তেমনটা আর অন্য কোনো সুলতানের আমলে হয়নি। সত্যই, মধ্যযুগে অতি সুমহান ছিল হুসেন শা-র রাজগিরি।"

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণববাদ

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু (1486—1533) ভক্তিবাদের একটা নব রূপায়ন করেন, যা আজও বাঙ্গালীর সংস্কৃতিতে ও ধর্মজীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে আসছে। তাঁর আবির্ভাবের সমসাময়িক কালে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতে ভক্তিতত্ত্ববাদের একটা বিশেষ পুনরুত্থান ঘটেছিল। রামানুজ, বল্লভাচার্য, নানক, রামানন্দ এবং কবীর চৈতন্যের কাছাকাছি সময়ের। চৈতন্য দেবের পূর্বেও যে বঙ্গদেশে রাধাকৃষ্ণবাদ জীবিত ছিল তা জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" ও চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন" গাথায় দেখা যায়। কিন্তু চৈতন্যদেব প্রেম-ধর্মে একটা নতুন সুর দিয়েছিলেন। তিনি ভাবানুগ ভগবৎ আরাধনাকে মহিমাময় করে নরনারীর ভোগবাসনা বর্জিত প্রেম-

লীলার দৃষ্টিতে দেখতেন। চৈতন্য দেবের প্রেম-ধর্মে জাতিবর্ণ বিভেদের স্থান ছিল না। সকল জাতির সকল বর্ণের ভক্তগণই তাঁর ধর্ম-মণ্ডলীতে স্থান পেয়েছিলেন। তিনি কিন্তু স্ত্রীলোকদের তাঁর শিষ্যা করতেন না। কৃষ্ণ ব্যতিরেকে অন্য কাওকেও ভক্তদের ধ্যানে আনবার আদেশ ছিল না। সমাজ-ক্ষেত্রে তাঁর এরূপ উদার মনোভাবই জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে এই মতবাদ গ্রহণে বিশেষ প্ররোচনা দিয়েছিল। মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হবার হিড়িকও আবার এ কারণে বন্ধ হয়েছিল। তিনি উড়িষ্যা, দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে প্রব্রজ্যা করেছিলেন এবং বৃন্দাবনে বৈষ্ণববাদ চর্চার এক কেন্দ্র স্থাপন করেন। বাঙ্গলার বাইরে এই কেন্দ্রই প্রধান—বঙ্গদেশে নদীয়া জেলায় নবদ্বীপে। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বিশিষ্ট ধর্মের মতো চৈতন্যবাদের মূল শাখাটি নানা উপশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্মে তাঁর নিজের কোনো বিশ্বাস না থাকলেও শ্রীচৈতন্য বঙ্গদেশে অবতার বা দেহধারী ঈশ্বর হিসেবেই পূজা পেয়ে আসছেন। এই আত্মীকরণ বা আপন করে নেবার অসাধারণ ক্ষমতা হিন্দুধর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। বৈষ্ণববাদ কালক্রমে একটা ধর্মমত হিসেবে শ্রেণীবিভাগ-ভিত্তিক হিন্দুধর্মের মূল কাঠামোর অঙ্গীভূত হয়ে গেল।

সুলতানী আমলে সমাজ

হুসেনশা-র পূর্বে বিভিন্ন রাজবংশের দ্রুত ওঠানামায় জনগণের কিছুই আসত যেত না। তারা এ বিষয়ে কোনই গা করত না। দূর প্রাচ্যের সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য আবার চালু হয়েছিল, যদিও দূর পশ্চিমের সঙ্গে তা একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কৃষি উৎপাদনের মোটামুটি উন্নতি ছিল। রচিত সাহিত্য থেকে মনে হয় সে সময় কোনো কোনো অঞ্চলে সময়ে সময়ে দৈন্যদশার অবস্থা আসত। জনগণ মাছ-ভাত খেয়ে খড়ের ঘরে শুয়ে, সাদাসিধে দিন কাটাত। সহরে, নগরে, ধনী লোকদের বাড়ি, মন্দির, মসজিদ ও কীর্তি স্তম্ভ ইঁটের তৈরী ছিল। ফলে, মধ্যযুগের অতি সামান্য কিছু সুরম্য অট্টালিকাই কালের বিধ্বংসী কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে।

সন্দেহ নেই, হিন্দু হোক বা মুসলমান হোক, সাধারণ জনগণের কতকগুলি একই রকমের বংশগত বিশ্বাস ও কুসংস্কার ছিল। জাতব্যবসা ভিত্তিক জাতিভেদ প্রথার অনড় গাঁথুনী সামাজিক সুখসমৃদ্ধির মূলে ছিল বলেই দু'টি বিরোধী ধর্মের পাশাপাশি অবস্থান সম্ভবপর হয়েছিল। হিন্দু মুসলমান উভয়ের মধ্যেই বুদ্ধিজীবী, পেশাদারি ও শাসকশ্রেণীর লোকরা সাধারণ শ্রমজীবীদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলতেন এবং বড় লোকদের একটা আলাদা দল থাকত। যাঁরা স্থানীয় ভাষা জানতেন না বা সে ভাষায় কথা বলতেন না—যেমন রাজদরবারীরা, যেমন উচ্চ সরকারী কর্মচারীরা, ধর্মে যাঁরা মুসলমান—তাঁদের পরদেশী বলে গণ্য করা হত. ইসলাম ধর্মান্তর গ্রহণ অবশ্যই কিছু কিছু পুরানো বাছবিচারের সংস্কার দূর করেছিল এবং নতুন সংস্কার আমদানী করেছিল। কিন্তু কেবল ধনী লোকরাই পারতেন সুরভিত ঝলসানো

মাংস, গমের তৈরি সুখাদ্য এবং সুগন্ধ পোলাও খেতে বা শাসক সম্প্রদায়ের মতো সাজ পোষাক পরতে। শীতের নবান্নে চাল আর গুড়ের মিষ্টি সাধারণের পোষাকী খাওয়া ছিল। শস্য ও গবাদি পশুর উপর তন্ত্রমন্ত্রের ক্ষমতাশালী মুসলমান পীররা হিন্দুদের গ্রাম্য দেবদেবীর মতই সাধারণ্যে পূজ্য ছিলেন। যেমন হিন্দুর সর্বদুঃখহর সত্যনারায়ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন মুসলমানদের সত্যপীর। গরু হিন্দু মুসলমান উভয়ের নিকটই শ্রদ্ধার জিনিষ ছিল—গো দেবতা মানিক পীরের প্রশস্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মধ্যযুগ থেকে চলিত বাঙ্গালী হিন্দুদের শারদীয় দুর্গোৎসবে মুসলমানগণও যোগ দিতেন। এ সময়টা ছিল হিন্দু হোমরাচোমরাদের ধনদৌলত ও শক্তিসামর্থ্য দেখাবার একটা সুযোগ। তাঁদের বেতনভোগী যোদ্ধাদের ভিতর অনেক মুসলমান ছিলেন। মুসলীম সুফীদের আউলিয়া সম্প্রদায় হিন্দুদের কাছে সম্মান পেত। "মানা"-তে বিশ্বাসের একটা কুসংস্কার জনসাধারণের মনে গেঁথে গিয়েছিল। পীরের দরগায় বা পীর স্থানে এবং স্থানীয় অমুসলমান সাধুদের নিকট নৈবেদ্য নিবেদন অহরহই চলে এসেছে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণরা আচারবিচার ক্রিয়াকাণ্ডের ভালোমন্দ নিয়ে চুল চেরা বিচার করতেন, যাতে করে জাতিপাতির বিরুদ্ধ কর্ম বা আচরণ দ্বারা জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত প্রত্যবায় না ঘটে। সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড জ্যোতিষীর নির্দেশ মতে সম্পন্ন হত।

এটা বলা অবশ্য ভুল হবে যে নিম্নস্তরে এই দু'সম্প্রদায়ের লোকদের এ ধরনের মিল-মিশটা মুসলীম শাসক শ্রেণী ও উচ্চ-বর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও দেখা যেত। হিন্দুগণ তাঁদের মুসলীম প্রভুদের একেবারে দাসানুদাস হয়ে থাকবে—এটাই ছিল কথা। রাজনৈতিক কারণে ও কিছুটা ধর্মান্ধতার জন্য একটা নিপীড়ন-নীতির উদ্ভব হয়েছিল- -বিশেষত ব্রাহ্মণদের বেলায়। শ্রীচৈতন্য এই মনোভাবের কিছুটা পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে মহাপ্রতাপশালী মোগল আমলে একটা বাঙ্গালী স্বদেশীয়ানার বিকাশ হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলীম সর্দারগণ তাঁদের স্বাধীনতা হরণে মোগলদের বাধা দিয়েছিলেন।

মোগল যুগ

হুসেন শা-ই কার্যত বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা। তাঁর ছেলে নসরত শা পিতার রীতিনীতি চালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু 1526 সালে মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের আধিপত্য স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। বাবর পাণিপথের যুদ্ধে লোদী সুলতান ইব্রাহিমকে পরাজিত করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিশৃঙ্খলতার যুগ এসে গেল। বিহারের আফগান শাসক শূরি রাজবংশের শের খাঁ বঙ্গদেশ জয় করলেন। বাবরের পরবর্তী বাদশা হুমায়ুন শের খাঁর বিরুদ্ধে লাগলেন এবং বাংলা আবার দখলে আনলেন। কিন্তু শের খাঁ পাশের থেকে নিপুণভাবে আক্রমণ চালিয়ে বারাণসী, জৌনপুর ও কনৌজ জয় করলেন। বক্সারে হুমায়ুনের পরাজয় ঘটল। এবার শের খাঁ হয়ে গেলেন বাদশা। হুমায়ুন ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হলেন।

শের খাঁর পাঁচ বছরের রাজত্বে অনেককিছুর প্রবর্তন হয়েছিল। পেশোয়ার থেকে বঙ্গদেশ পর্যন্ত এক সুদীর্ঘ রাজপথ তৈরী সম্পূর্ণ করা ছিল তার অন্যতম। এই রাজপথটাই শেষে "গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড়" নামে প্রসিদ্ধ হয়।

শূরি বংশ এগারো বছর রাজত্ব করে। 1555 সালে শের শা-র ভাইপো আদিল শা-কে হুমায়ুন তাড়িয়ে দেন এবং দিল্লীর সিংহাসন পুনরায় দখল করেন। হুমায়ুনের শোচনীয় মৃত্যুর পর যুবক আকবর বাদশা হলেন এবং প্রায় 50 বছর (1556-1605) রাজত্ব করেছিলেন। আকবর মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর রাজত্ব যখন প্রসিদ্ধির চরমে তখন তা বোধহয় জগতের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচালিত এবং সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। তিনি তাঁর সাম্রাজ্য বঙ্গদেশসহ এক ডজন প্রদেশ বা সুবায় বিন্যস্ত করেন। সুচারুভাবে ভূমিকর আইনেরও সংস্কার হয়েছিল। আকবর পরমত সহিষ্ণু এবং তখনকার কালের পরিপ্রেক্ষিতে সাতিশয় উদার মতাবলম্বী ছিলেন। এই বিশিষ্ট ভারত সন্তানের বহুবিধ কীর্তির তালিকা দেওয়া এ অধ্যায়ের প্রসঙ্গ বহির্ভূত।

বঙ্গদেশ কিন্তু অত সহজেই ধরা দিল না। তখনকার বাঙ্গলার শূরি শাসকরা শূরি সাম্রাজ্যের পতনের সুযোগ নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন, কিন্তু 1560 সালে দক্ষিণ বিহারের শাসনকর্তা সুলেমান কররাণি তাঁদের পরাজিত করে মোগল সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে বাঙ্গলার প্রাদেশিক শাসক হয়ে বসলেন। তিনি একজন সুদক্ষ শাসক ও সমর-নেতা ছিলেন। ছেলে দাউদ খাঁ নির্বোধের মত নিজেকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করলে তাঁকে ঝটিতি পদচ্যুত করা হয়। 1576 সালে বঙ্গদেশ সরাসরি মোগল শাসনে এসে যায়। কিন্তু পূর্ববঙ্গের বারো ভুঁইয়া (খণ্ডরাজ্য অধিকারী) মোগলদের বিরুদ্ধে বহুকাল যুদ্ধ চালিয়ে যান। ঢাকা-ময়মনসিংহের ঈশা খাঁ, বিক্রমপুরের কেদার রায়, চন্দ্র দ্বীপের (বরিশালের বাকলা) কন্দর্প নারায়ণ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি বার ভুঁইয়ার কয়েকজনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ ইতিহাসে, গল্পে অমর হয়ে আছে। আকবরের পুত্র জাঁহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে (1605-27) ভুঁইয়া বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান অঞ্চলে আফগানদের প্রভাব একেবারে লোপ পায়। কুচবিহার এবং কামরূপ রাজ্যও অধিকার করে বঙ্গদেশের সামিল করা হয়।

ইতিমধ্যে প্রথম ইয়োরোপীয় ভাগ্যান্বেষী পর্তুগীজদের ভারতে আগমন হল। তাঁদের শক্তিশালী নৌবহর আরবীয়, পশ্চিম ভারতীয় ও বঙ্গদেশী জলযানগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করে দিল। ছিলেন বণিক, কিন্তু অধঃপাতে গিয়ে পর্তুগীজরা বনে গেলেন জলদস্যু, লুটেরা, নারীধর্ষক আর দাস-ব্যবসায়ী। সম্রাট আকবরের এক সনদের জোরে চুঁচুড়াতে (হুগলী) বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করার পর তাঁদের লোলুপতা এবং পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের গ্রামাঞ্চলে বর্বর অত্যাচার এরূপ ভীষণ হয়ে উঠেছিল যে সম্রাট সাজাহান (1628-59) তা রোষদৃষ্টিতে দেখলেন এবং পর্তুগীজরা বিতাড়িত হলেন। তবু তাঁরা আরাকানে কিছুকাল রয়েই গেলেন।

আওরংজেব (1659-1707) দিল্লীশ্বর হন তাঁর তিন ভাইকে নিঃশেষ করে। বড় ভাই শা সুজা ছিলেন বঙ্গদেশের শাসনকর্তা। আওরংজেবের সেনাধ্যক্ষ মীর জুমলা সুজাকে একেবারে পরাস্ত করে তাড়িয়ে দিলেন। মীর জুমলা কিছুকালের জন্য কামরূপ রাজ্য পুনরায় জয় করেছিলেন। এই রাজ্য অহমিয়াদের অধিকারে ছিল। কিন্তু কিছুকাল পরেই অহমিয়ারা আবার তা ছিনিয়ে স্বাধিকারে আনেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজরা অধিকার করার আগে পর্যন্ত কামরূপ অহমিয়াদের দখলে ছিল।

বঙ্গদেশের পরবর্তী রাজ্যপাল শায়েস্তা খাঁ (1664-88) একজন স্মরণীয় শাসক ছিলেন। তিনি সাগরতীর থেকে পর্তুগীজ ভীতি সমূলে উৎপাটন করেন। একটি বাঙ্গালী নৌবাহিনী তাঁর দ্বারাই গঠিত হয়, আর রাজ্যে শান্তি সমৃদ্ধি আবার বিরাজ করে। তাঁর পরবর্তী মুর্শিদকুলি খাঁ অনুরূপ সুদক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি ঢাকা থেকে রাজধানী ভাগীরথীর উজানে একটা নতুন নগরে বদলে নিয়ে আসেন। তাঁরই নাম অনুসারে সে নগরীর নাম মুর্শিদাবাদ। আওরংজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্য ধাপে ধাপে অবক্ষয়ের পথে চলেছিল। দিল্লীর অরাজক আবহাওয়ার প্রভাব বঙ্গদেশে কিন্তু তেমন একটা পড়েনি। রাজ্যপালের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এতে একটু বেড়ে যেত মাত্র। বিহারের শাসক আলীবর্দি খাঁ বঙ্গদেশ দখল করলেন এবং দিল্লীর রাজদরবার থেকে বঙ্গ, বিহার উড়িষ্যার নবাব খেতাব পেলেন।

আলীবর্দির শাসনকাল (1749-56) দু' কারণে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রথমটী হল তাঁর বর্গীদের সঙ্গে বিচক্ষণ মোকাবিলা। বর্গীরা ছিল মারাঠি লুণ্ঠনকারীদল। এরা কিছুকাল যাবৎ উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে নিয়মিতভাবে লুটতরাজ করে যাচ্ছিল। তিনি দৃঢ় হস্তে এই আপদ দূর করেন এবং মারাঠিদের সঙ্গে একটা সন্ধিতে আবদ্ধ হন। সন্ধির শর্ত মতো উড়িষ্যার কতকটা অংশ তাদের দিয়ে দেওয়া হল, আর কথা দেওয়া হল বছর বছর 12 লাখ টাকা ভেট দেবার।

ইংরেজদের আগমন

এই সময়ে আর একটা ব্যাপার ঘটছিল যার ফল বঙ্গদেশ ও ভারতের পরবর্তী কালের ইতিহাসে সুদূর প্রসারী। ইংরেজদের "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি" 1690 সালে ভাগীরথীর পূর্বপারে কলকাতায় একটা বাণিজ্য কেন্দ্র বসাবার অনুমতি পেল। "ফ্রেঞ্চ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী" পেল পশ্চিমপারে চন্দননগরে, ওলন্দাজরা পেল চুঁচুড়ায় (হুগলী) এবং দিনেমাররা পেল শ্রীরামপুরে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে বাণিজ্যের একচেটে অধিকারের জন্য প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হল ইংরেজ ও ফরাসীরা। এক পক্ষ অন্য পক্ষকে লড়াই করে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করত। তারা গোপনে গোপনে তাঁদের ঘাঁটিগুলি সামরিকভাবে সুরক্ষিত করতে লাগল। আলীবর্দি খুব কড়াভাবে তাঁর প্রতিবাদ করলেন; কিছুকালের জন্য বঙ্গদেশের সীমানার মধ্যে শান্তিভঙ্গ রোধ করা গেল।

1600 সালে লণ্ডনে ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা হয় পূর্ব এশিয়ার বাণিজ্য ক্ষেত্রে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের অত্যধিক মুনাফাবাজি বন্ধ করবার জন্য। এদের কাছ থেকে কোম্পানীকে বেশ কঠিন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 1609 সালে দিল্লীতে এলেন উইলিয়াম হকিনস নামে একজন ইংরেজ। মদ্যপান প্রতিযোগিতায় সম্রাট জাহাঙ্গীরের সঙ্গে দহরম মহরম করে হকিনস তাঁর সুনজরে এসে পড়েন। ফলে, সুরাটে একটা কুঠি বা বাণিজ্যের আড়ত বসাবার অনুমতি পেয়ে গেলেন। 1612 সালে পশ্চিম সমুদ্র উপকূলে একটা নৌ যুদ্ধে পর্তুগীজরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়, আর অন্যান্য ইয়োরোপীয় প্রতিযোগীরা হন 1614 সালে। ইংরেজরা মোগল কর্তাদের কাছ থেকে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপনের অনুমতি পান। তাঁরা মাদ্রাজ (1639), বোম্বাই (1660) ও কলকাতা (1690) নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেগুলি সুরক্ষিত করতে তৎপর হন।

"ইনডাসষ্ট্রিয়াল রিভলিউশন' বা বাণিজ্য বিপ্লব হবার আগে ইংরেজরা ভারতের চাহিদা মতো তেমন কোনো মাল সরবরাহ করতে পারতেন না। ভারতবর্ষ থেকে তাঁরা নিজেদের দরকারী জিনিষপত্র, যেমন, বস্ত্র, গোলমরিচ ও অন্যান্য শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করতেন। দাম দিতে হত মূল্যবান ধাতুতে। বাণিজ্যের খতিয়ানে লাভের অঙ্ক বেশি দেখে মোগলদরবার বিদেশী বণিকদের অনেক সুবিধা দিতে লাগলেন— তার মধ্যে একটা হল বঙ্গদেশে কয়েক লক্ষ টাকা পরিমিত শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের অধিকার।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজের অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার সামাজিক ব্যবস্থায় অন্যান্য সামন্তচক্রের মতো দুটি বিপরীতমুখী ধারা ছিল: একদিকে ছিলেন ধনী শাসক ও বণিক শ্রেণী, যাঁরা সহরে নগরে জাঁকালো বিলাসবৈভবের মধ্যে বাস করতেন মধ্যবিত্ত স্তরে তাঁদের শ্রেণীর লোকরাও বেশ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। অন্যদিকে ছিল বিশাল কৃষক সমাজ, যারা কোন রকমে খেয়েদেয়ে বেঁচে থাকত। মাত্র তন্তুবায় জাতীয় শিল্পীরা কিছুটা সচ্ছল ছিলেন। গ্রামজীবন ভিন্নভাবে প্রবাহিত হত। শাশ্বত ধরণীর মতো অনড় বর্ণ-ভিত্তিক পেশা ধরে থেকে গ্রামের আর্থিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বিরাজ করত। এতে গ্রাম-জীবনে এসেছিল একটা ক্ষুন্নহীনমন্যতা ও ব্যর্থতার ভাব। মুরশিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দির শত চেষ্টা সত্ত্বেও মুরশিদাবাদের রাজদরবার দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রে ক্ষত-বিক্ষত থাকত। দিল্লীর মোগল সাম্রাজ্যের দ্রুত পতনের ফলে এ-অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়। দিল্লীতে মুনাফাখোর ও টাকার মালিকদের সঙ্গে সরকারী প্রশ্রয়ে লেনদেন যে-কোনো পণ্য দ্রব্যের মতোই সহজ ছিল। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ওঠানামা করত—কখনো বেশি বর্ষা, কখনো কম বর্ষার জন্য। অজ্ঞ চাষীরা পর্যায়ক্রমে শস্য-ফলানোর কথা জানতই না। সুরক্ষিত সহরের বাইরে শান্তিশৃঙ্খলার ব্যবস্থা এলোমেলো ছিল। গ্রাম-দেশে যেটুকু শান্তি বিরাজ করত তা গ্রামবাসীদের

আত্মরক্ষায় তৎপরতা এবং অহিংসা নীতিতে স্বভাবগত আস্থার জন্য। শক্তিমানের কাছে বশ্যতা স্বীকারই ছিল রেওয়াজ, সক্রিয় প্রতিবাদ নয়। আগের দিনের মতো জনসাধারণ উঁচু মহলের উত্থান পতনে সম্পূর্ণ নির্বিকার থাকত। একথা পলাশীর দারুণ ঘটনায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। ক্লাইভের মতে, পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের নিকট "দর্শক হিসেবে উপস্থিত স্থানীয় লোকদের সংখ্যা কয়েক শত সহস্র ছিল এবং তাঁরা যদি ইউরোপীয়দের ধ্বংস করবার ইচ্ছে করতেন, তবে তাঁরা শুধুমাত্র ইট-লাঠির সাহায্যেই তা করতে পারতেন।" কিন্তু তাঁরা একটি অঙ্গুলিও তোলেন নি।

পলাশীর যুদ্ধ

1756 সালে আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হলে তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌল্লা নবাব হলেন। এই 24 বছর বয়সের নবাব ছিলেন দারুণ লম্পট। ষড়যন্ত্রী ও বিশ্বাসঘাতক সভাসদদের পরামর্শ মতেই তিনি চলতেন। গদীচ্যুত করবার জন্য কুচক্রী পরিষদ দল তাঁকে সঙ্গীন অবস্থায় রেখেছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে বাছাবাছা রাজসভাসদরা ঘুষ পেতেন এবং নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্য তাঁদের উস্কানি দেওয়া হত। কয়েকজন বিরাট ধনী বাঙ্গালী ব্যবসায়ী এবং উচ্চ রাজকর্মচারীর নীরব সমর্থনে কোম্পানী সরকার প্রদত্ত বিশেষ অধিকারের অপব্যবহার করছিলেন, সন্দেহ নেই। এতে সরকারী রাজস্বের মোটারকম হানি হচ্ছিল। সিরাজউদ্দৌল্লা কোম্পানীর লোকদের কার্যকলাপ বুঝতে পারতেন, কিন্তু সম্ভবত তাঁর পরিষদ দলের কারসাজির কথা জানতেন না। তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের নিষেধ করলেন, তাঁরা যেন তাঁদের ঘাঁটিগুলিকে আর দুর্গ বানিয়ে না তোলেন, বিশ্বাসঘাতক বণিক-দেরও সেখানে ঠাঁই না দেন। ফরাসীরা মেনে নিলেন, কিন্তু ইংরাজরা নিলেন না। নবাব ইংরাজদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যদল পাঠালেন এবং কাশিমবাজার ও কলকাতা অধিকার করলেন। ইংরেজরা কলকাতা থেকে পালিয়ে গেলেন। কলকাতার গভর্ণর ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডি বা অন্ধকূপ হত্যা বলে একটা অলীক কাহিনীর প্রচার করেছিলেন। কাহিনীতে বলা হল, 146 জন ইংরেজকে নাকি একটা কয়েদ ঘরে রেখে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলা হয়েছে। এই প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল বাঙলায় কোম্পানীর নাভিশ্বাস উপস্থিত বলে কোম্পানীর কর্তাদের ও ইংরেজ সরকারের টনক নাড়ানো।

বণিক ও রাজপরিষদের হোমরা-চোমরাদের আশ্বাস পেয়ে কোম্পানী একটা হেস্তনেস্ত করবার জন্য তৈরী হল। কর্ণেল ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে ইংরেজ সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ সহ ঝটিতি চলে এসে কলকাতা পুনরাধিকার করলেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে নবাব বাধ্য হলেন। সন্ধি অনুযায়ী ইংরেজ শুধু তাঁদের সম্পত্তি ও সুযোগ সুবিধাই ফেরৎ পেলেন না, কলকাতাকে সামরিকভাবে সুরক্ষিত করবার এবং নিজস্ব পত্র-মুদ্রা বা নোট চালাবার অধিকারও নিয়ে নিলেন। নবাব স্পষ্টতই ভেবেছিলেন যে এতে করে তিনি এই শক্তিশালী কোম্পানীকে

তাঁর দিকে টেনে আনতে পারবেন। কিন্তু তাঁর ভুল হয়েছিল। আলীবর্দি খাঁর ভগ্নীপতি মীর জাফর রাজ পরিষদের ক্ষমতাবান লোক ও শেঠদের সঙ্গে শলা করে ইংরেজদের পৌনে দু'কোটি টাকা দেবার প্রস্তাব জানালেন—যদি ইংরেজরা নবাবকে উৎখাত করে তাঁকে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে রাজী হন। একটা গোপন দলিল তৈরী হল। ক্লাইভ তাতে দস্তখত করলেন আর নৌ-সেনাধ্যক্ষ ওয়াটসনের দস্তখত জাল করে বসানো হল। ওয়াটসনের এ ব্যবস্থায় মত ছিল না। পরিকল্পনামতো ক্লাইভ, ইংরেজ-ফরাসীদের ইউরোপ ক্ষেত্রে সাত সাল ব্যাপী "যুদ্ধের" অজুহাতে চন্দননগরের ফরাসী ঘাঁটি দখল করে বসলেন। নবাব যখন দেখলেন ইংরেজকে হাত করবার চেষ্টা বিফল হয়েছে, তখন যুদ্ধযাত্রার উদ্যোগে লেগে গেলেন—ইংরেজদের একগুঁয়েমিকে বাগে আনবার জন্য। কিন্তু ইংরেজরাই নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসলেন—নবাব সন্ধির শর্তের খেলাপ করেছেন, এই কারণ দেখিয়ে।

সেই চূড়ান্ত শক্তির লড়াই ঘটল 1757 সালের 23 জুন আম্রকুঞ্জ বেষ্টিত পলাশী প্রান্তরে। সিরাজ জড়ো করলেন 50,000 হাজার পদাতিক ও 28,000 হাজার অশ্বারোহী, আর ক্লাইভ মাত্র 3,000 ইউরোপীয়। তবু ক্লাইভই একদিনে জিতে গেলেন। কারণ, এই যুদ্ধের প্রহসনে মীর জাফরের নেতৃত্বাধীন নবাব সৈন্যদলের বেশীর ভাগই পিছু হটে রইল। মাত্র দু'জন সহসেনাপতি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী নিয়ে বাধা দিয়েছিলেন তেজোদীপ্ত ভাবে। সিরাজ পালিয়ে গেলেন, কিন্তু মীর জাফরের একজন তাঁবেদার ভৃত্য বিশ্বাসঘাতকতা করে সিরাজকে হত্যা করে।

ইংরেজ রাজত্ব

মীর জাফর সিংহাসনে তো বসলেন (1757-60), কিন্তু ইংরেজের সাহায্য নেওয়ার দাম দিতে হল প্রচুর। তাঁকে কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের মন জুগিয়ে চলতে হত, আর তাঁদের দাবিদাওয়াও বেড়ে চলছিল। চুঁচুড়ায় ওলন্দাজ ঘাঁটি যখন ইংরেজরা আক্রমণ করল তখন মীর জাফরকে সায় দিতে হল ইংরেজদের সঙ্গে। চুঁচুড়ার পতন হল, আর বঙ্গদেশে ইংরেজরা একচেটিয়া অধিকার পেয়ে গেল। 1760 সালে ক্লাইভ ইংলণ্ডে ফিরে যাবার পর কলকাতার নতুন গভর্ণর ভ্যানসিটার্ট সেই পুরানো বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরকে গদীচ্যুত করলেন, আর সিংহাসনে বসালেন মীর জাফরের জামাতা মীর কাসিমকে (1760-64)। নতুন নবাব ইংরেজদের হাত থেকে বাংলার শাসন-ব্যবস্থা তুলে নেবার চেষ্টা করলেন। এ উদ্দেশ্যে তাঁর প্রস্তাব হল কোম্পানী মেদিনীপুর, বর্ধমান ও চট্টগ্রাম জেলার জমিদারির অধিকার পাবে আর গভর্ণর ও তাঁর প্রত্যেক মন্ত্রী পাবেন 200,000 পাউণ্ড। কিন্তু ইংরেজ ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল এবং বড় হবার অনন্ত সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিল। শাসন ব্যবস্থার উচ্চ স্তরে দুর্নীতি ও দুরাচার কতটা ঢুকেছিল সে বিষয়ে তারা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিল। মরিয়া হয়ে মীর কাসিম ইংরেজদের শ্যেন দৃষ্টির বাইরে মুঙ্গেরে

রাজধানী বদল করলেন। সেখানে তাঁর সেনাদলকে ইয়োরোপীয় পদ্ধতিতে রণকৌশল শেখাতে লাগলেন।

কোম্পানীর কর্তাদের—গভর্নর থেকে শুরু করে খুব সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত—একটা বদ অভ্যাস ছিল। বাণিজ্য কর রেহাইয়ের শঠতামূলক সুবিধে নিয়ে তাঁরা ব্যক্তিগত ব্যবসা চালাতেন। স্থানীয় বণিকদের বাণিজ্য কর দিতে হত, তাই তাঁরা অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থায় পড়তেন। রাজকোষও এ প্রতারণায় বহু অর্থ থেকে বঞ্চিত হত। মীর কাসিম বারবার প্রতিবাদ জানালেন, কিছুই তাতে হল না। তখন তিনি বাণিজ্য কর একেবারেই রহিত করে দিলেন। ইংরেজরা বেশ মার খেয়ে গায়ের ঝাল মেটালেন পাটনা সহর দখল করে। মীর কাসিম পালটা বহু সৈন্যসহ ঐ সহর উদ্ধার করলেন এবং তাঁর কর্মচারীদের নিয়ে পাটনার ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি দখলে আনলেন। ইংরেজরা তখন তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। বহু খণ্ড-যুদ্ধের পর মীর কাসিম বক্সারের যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হন। তাঁকে বাধ্য হয়ে পলায়ন করতে হল (1764)। এই যুদ্ধে মীর কাসিমকে দিল্লীর সম্রাট দ্বিতীয় শা আলম ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লা সৈন্য দিয়ে সাহায্য করেছিলেন।

মীর জাফর সিংহাসন ফিরে পেলেন, কিন্তু কয়েক মাস পরেই তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর ছেলে নাজমুদ্দৌল্লা নবাব হলেন, ইংরেজদের সাক্ষীগোপাল হয়ে। কিন্তু কোম্পানীর শোষণনীতি শাসন যন্ত্রকে একটা হানাহানির কেন্দ্র করে তুলেছিল। ক্লাইভ ইংলণ্ডে তখন লর্ড হয়েছেন। তাঁকে আবার বঙ্গদেশে পাঠান হল। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে আপোষ করলেন। শৌর্য-বীর্যহীন দিল্লীর বাদশার কাছ থেকেও ক্লাইভ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী (তহশিলদারী) আদায় করে নিলেন। এজন্য কোম্পানীর বার্ষিক 25,00,000 টাকা দিল্লীর বাদশাকে এবং বাংলার নবাবকে 50,00,000 টাকা দেবার কথা স্থির হল। কোম্পানী বাংলার প্রতিরক্ষার ভার নিল, নবাবের হাতে রইল অসামরিক প্রশাসন ও ফৌজদারি-আদালতি কাজ। 1765 সাল থেকে কোম্পানী রেজা খাঁ ও সীতাব রায় নামের দুইজন প্রতিনিধির মাধ্যমে সেই সাক্ষীগোপাল নবাবের ক্ষমতা বেআইনী ভাবে হাতে আনতে লাগল। 1769-70 সালের ভীষণ দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক ধ্বংস হয়। খাজনা আদায়ের এমনি কড়াকড়ি ছিল যে, এই ভীষণ দুর্দশার সময়ও খাজনা আদায় সবচেয়ে বেশী হয়েছিল। রেজা খাঁর নিষ্ঠুর নীতি বাংলার আর্থিক অবস্থাকে চিরকালের মত এমনভাবে পঙ্গু করে দিয়েছিল যে তা কোম্পানীর বেপরোয়া লোকদের সমস্ত লুটতরাজকেও হার মানিয়েছিল।

ওয়ারেন হেষ্টিংস

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট সচকিত হলেন এবং লণ্ডনের লিডেনহল ষ্ট্রিটস্থ কোম্পানীর পরিচালকগণ একজন সুদক্ষ গভর্নরকে বাংলাতে পাঠাবার সঙ্কল্প করলেন। এঁর

নাম ওয়ারেন হেষ্টিংস (1772-84),—ভারতবর্ষে কোম্পানীর একজন প্রাককালীন একজন উচ্চ পদাধিকারী কর্মচারী। হেষ্টিংস ক্লাইভের দ্বৈত-নীতি পরিত্যাগ করে নবাবকে একটা বার্ষিক পেনসনে অবসর দিলেন। কোম্পানী হল বাংলার একমাত্র শাসক। হেষ্টিংস কোম্পানীর কুখ্যাত প্রতিনিধি রেজা খাঁ ও সীতাব রায়কে বরখাস্ত করে তাদের আদালতে সোপর্দ করলেন। 1773 সালে তিনি ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-জেনারেল হবার পর ভারতের মারাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ ও লুটতরাজের ভিতর দিয়ে ইংরেজদের বাণিজ্যগত ও রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করে এসেছেন। এই সময়টায় ভারতে মহীশূর, হায়দরাবাদ ও মারাঠার দেশী রাজাদের ভিতর একটা ক্ষণস্থায়ী চোখ রাঙানো গোছের মৈত্রীবন্ধন ঘটেছিল। আর বাইরে চলেছিল উত্তর আমেরিকার ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমেরিকাবাসী ব্রিটিশরা জয়ী হয়ে মূল ব্রিটিশ কর্তৃত্ব থেকে স্বাধীন হন। সরকারী রাজস্বের বেশি অংশ ভারতের যে-সব ভূ-সম্পত্তি থেকে সংগ্রহ করা হয়, হেষ্টিংস সে-সবের জরিপ ও পরিমাপ করালেন এবং তারই ভিত্তিতে দেয় খাজনার হারের রদবদল হল। হেষ্টিংস বিচার ব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করেছিলেন। এভাবে হেষ্টিংস ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পত্তন করে গেছেন—যে সাম্রাজ্য হয়ে উঠেছিল ইংরেজ জাতির পাকাপোক্ত সোনার খনি। এটি ঘটেছিল সুশৃঙ্খলভাবে,—তাড়াহুড়ো করে নয়, যেমনটা করেছিল কোম্পানীর পূর্ববর্তী লাভান্বেষী দল।

অর্থনৈতিক শোষণ

ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম দশকে একটা বিপ্লবের উত্থান হল যাতে করে জগতে আধুনিক যুগের প্রবর্তন ঘটল। এটা হল শিল্পপণ্যোৎপাদী বিপ্লব, যার মূলে ছিল ব্যাপক উৎপাদন ক্ষেত্রে বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ। এই নতুন শক্তি-প্রয়োগের আবিষ্কারক ইংরেজগণই প্রথম শিল্প উৎপাদনে একে কাজে লাগিয়েছিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়ের কলগুলি গাদায় গাদায় বস্ত্র উদ্‌গিরণ করতে লাগল। কলগুলিকে সর্বদা চালু রাখবার জন্য এখন একটা রপ্তানীর বাজারের প্রয়োজন হল। কোম্পানীর লোকরা একটা কর্মধারার আশ্রয় নিলেন যাতে করে ভারতীয়রা ব্রিটেনে তৈরি তুলোর বস্ত্র ক্রয় করতে বাধ্য হয়। ভারতের গ্রামীন বয়ন শিল্পকে দাবিয়ে দেওয়া হল। বাঙ্গালী বয়ন শিল্পীরা দেশের চাহিদা মেটাতেন এবং তাঁদের বিশিষ্ট মসলিন কাপড় রপ্তানী করতেন। নানা অত্যাচারে ও অন্যান্য প্রকারে তাঁরা বস্ত্রবয়নে বাধা পেলেন। এরূপে বাংলার রপ্তানী-বাণিজ্য তো নষ্ট হলই—বাংলা নেমে গেল একটা কৃষিপ্রধান দেশে। এমন কি লবণও দেশে বানানো বন্ধ হয়ে গেল। গৃহস্থালির রকমারি জিনিষপত্র ইংলণ্ড থেকে আমদানী হতে লাগল। ইংলণ্ড ফেঁপে ফুলে উঠল, আর স্থানীয় লোকরা হতে লাগল দারিদ্রক্লিষ্ট।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কখনো কখনো অনুরুদ্ধ হয়ে রাজা ও সামন্ত রাজাদের সাহায্যে যেত রাজাদের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে শায়েস্তা করতে বা তাঁদের নিরাপত্তার

প্রয়োজনে। এমনি করে কোম্পানী ধীরে ধীরে ভারতের অন্যান্য অংশে অধিকার বিস্তার করতে থাকে। বঙ্গদেশে কোম্পানী স্থানীয় কায়েমী স্বার্থান্বেষী ও বণিক মহল থেকে সক্রিয় সহযোগিতা পেত, সন্দেহ নেই। এতে তাঁরাও প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে গেলেন। 1793 সালের পার্মানেন্ট সেটলমেন্ট বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুযায়ী অনেকেই বড় বড় জমিদারির বংশানুক্রমিক মালিকানা পেলেন। ধনীরা চলে আসতে থাকলেন কলকাতায়--নিরাপত্তার খোঁজে, দলে দলে। কলকাতা যেন যাদুমন্ত্রে ধনে জনে ফুলে ফেঁপে উঠল, আর 1774 থেকে 1912 অবধি ভারত সরকারের রাজধানী হয়ে থাকল। কিছু কিছু তালপাতার সেপাই গোছের বাঙ্গালী এবং ইংরেজদের ভিতর একটা নাম-কে-ওয়াস্তে সাংস্কৃতিক লেনদেন শুরু হল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেওয়া-নেওয়াটা একরকম উবেই গেল, নেওয়াটাই প্রবল হতে থাকল। হেষ্টিংস নিঃসন্দেহে পারসী ও সংস্কৃতের একজন সমজদার ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যার উইলিয়ম জোনসের সহায়তায় "রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি"র প্রতিষ্ঠা হয়। অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কৃত সাহিত্যের সুবিশাল রত্ন ভাণ্ডার ইয়োরোপের পণ্ডিতসমাজের গোচরে আনা হল। কিন্তু কোম্পানীর আগ্রহ এদেশের সংস্কৃতি সম্বন্ধে ছিল না। তাঁরা ভারতের ধনসম্পদ বৃটেনে চালান করবার জন্য একটা সুসংগঠিত ব্যবস্থার দিকে মনোযোগ দিলেন। একথা অস্বীকার করা যায় না যে, কোম্পানী এ কাজে বাঙ্গলার এবং বাঙ্গলার বাইরের কায়েমী স্বার্থলিপ্সু ভারতীয়দের কাছ থেকে মোটা রকমের সাহায্য পেয়েছিলেন।

সামাজিক অবস্থা

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কলকাতার ক্রমবৃদ্ধির দরুন উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙ্গালার সাংস্কৃতিক জীবনে একটা নতুন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। ধনীরা কলকাতামুখী হলেন, আর সর্বক্ষেত্রে পেছনে পেছনে এলেন বুদ্ধিজীবীরা। এই হাল আমলের ধনীদের অধিকাংশই ছিলেন উচ্চবর্ণের হিন্দু। তাঁরা মধ্যযুগীয় জাঁকজমকে বাস করতেন। তাঁদের ঘিরে থাকত গুচ্ছ গুচ্ছ পুরোহিত, পণ্ডিত, দৈবজ্ঞ আর তোষামোদকারী পরজীবীর দল। বাগান বাড়িতে মদের মাইফেল বসত, রক্ষিতা হয়ে থাকত বাঈজীরা। গোঁড়ামির চূড়ান্ত দেখাতেন তাঁরা—জাতিভেদ, বাল্য বিবাহ, সতীদাহ, সম্পত্তিতে মেয়েদের অনধিকার—এসবের সমর্থন করে। আর করবেন না-ই বা কেন—এগুলি তাঁদের স্বার্থের বিশেষ অনুকূলে ছিল। এসব এবং ইয়োরোপীয় জীবন ধারা দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইত। ইংরেজী বুলি শেখো, তাতে মানা নেই, কারণ ওটা দরকার। কিন্তু ওদেশের আচার বিচার জানতে চেয়ো না, সে পাপকে গ্রহণ তো করবেই না। ধনীরা তখনকার সরকারি ভাষা ফার্শি মোটামুটি জানতেন। কিছু কিছু সংস্কৃত পণ্ডিতও ছিলেন। কিন্তু বাংলা? ওটা তো হল শুধু কথোপকথনের ভাষা। তাঁরা খৃষ্টান মিশনারিদের কাজকর্ম বিশেষ সন্দেহের চোখে দেখতেন। মিশনারিরা

মুদ্রাযন্ত্রের আমদানী করেন এবং বাংলা মুদ্রণ-অক্ষরের আদল ঢেলে সাজান। তাঁরা ইংলণ্ডের চার্চ-এর অনুমোদিত খৃষ্টের উপদেশাবলী ছাপার অক্ষরে ও মৌখিক প্রচার করতে থাকেন। মুসলমান নেতাগণ তফাতে সরে রইলেন। বৃটিশরা তাঁদের কায়েমী স্বার্থ কেড়ে নিয়েছেন—এই তাঁদের নালিশ।

হিন্দু বা মুসলমান কোনো বিশিষ্ট লোকই বিন্দুমাত্র জানতেন না ইয়োরোপে কী একটা সাংস্কৃতিক ওলট পালট ঘটছে, যাতে করে বিজ্ঞান আর মানবিকতার ভিত্তিতে সামাজিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা অগ্রগতির পথে বয়ে চলছিল। যে বিপ্লবে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি উঠেছিল, সেই ফরাসী বিপ্লবের কথা তাঁদের অজ্ঞাত ছিল। গোঁড়া খৃষ্টান মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে যে মানবিকতাবাদ গড়ে উঠছিল তার খবরও তাঁরা রাখতেন না। এটা স্বীকার্য যে, ভারতের সাধারণ ইংরেজ মহলে পশ্চিমের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ছাপ লাগেনি। কিন্তু তবুও তাঁরা নিজেদের অজ্ঞাতেই ঐতিহাসিক বিবর্তনের নিমিত্ত বা স্রষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রাহ্মণেরা লিপ্ত ছিলেন সে-ই মধ্যযুগের পুঁথিপত্র মতে সদাচারের বিধি-নিষেধ নিয়ে। প্রাচীন হিন্দুদের সনাতন ধর্মশাস্ত্র বেদ ও উপনিষদ সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান তাঁদের ছিল না।

গ্রাম দেশের সাধারণ লোক স্থানীয় পুরুত, গুরু এবং মুসলমান মোল্লাদের দ্বারা চালিত হতেন। তাঁদের জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারা নানা প্রকার বিধিনিষেধ ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল। গাঁয়ের সচ্ছল অবস্থার লোকগণ সর্বদা দলবদ্ধ সশস্ত্র ডাকাতদের ভয়ে ভয়ে থাকতেন। যাঁরা পারতেন তাঁরা হাতিয়ারসহ নিজস্ব রক্ষীদল রেখে দিতেন। ঐ রক্ষীদের সাহায্যে তাঁরা আশপাশে চুরি ডাকাতি ও ভয় দেখানোর ব্যাপারেও কম যেতেন না। কোম্পানীর পুলিশরা ছিল আর একদল অত্যাচারী। তারা অসাধুতা ও সন্ত্রাসবাদের জন্য কুখ্যাতি লাভ করেছিল। এটা ইংরেজ রাজত্বের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রয়ে গিয়েছিল এবং জনগণ পুলিশের ধারে কাছে আসতে চাইত না। আশ্চর্য নয় যে গরীব শ্রেণীর বেশির ভাগ লোকদেরই ডাকাত দলগুলির সম্বন্ধে একটা খোলাখুলি প্রশংসার ভাব ছিল—কারণ তারা ধনীদের লুটতো, আর পুলিশদের নাজেহাল করত।

নতুন জাগরণ

এই বদ্ধ জলাভূমিতে নতুন রাজপুরুষগণের চাইতে বেশী করে ইংরেজি শিক্ষাই ব্যাপক পরিবর্তনের জোয়ার এনেছিল। এই শিক্ষার আন্দোলন ভদ্রলোকদের আন্দোলন ছিল। ক্রমবর্ধমান বৃটিশ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থান কলকাতায়ই এটা প্রথমত জন্মলাভ করে। মোটামুটি হিন্দু সমাজের মধ্যেই এই আন্দোলন নিবদ্ধ ছিল। এতে ভারতবাসীর কাছে একদিকে প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার আবরণ মোচন হল, অন্যদিকে প্রতিভাত হল নবযুগের দূর-বিন্যস্ত প্রতিচ্ছবি। যাকে ভারতের নবজাগরণ বলা হয় তার পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (1772—1833)।

রামমোহন রায় সে সময়ের চলিত প্রায় সমস্ত ভাষারই সূক্ষ্ম তত্ত্ববিদ ছিলেন।

তিনিই জগতে প্রথম তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব আলোচনার প্রবর্তন করেন। বহু ঈশ্বরবাদী সমাজে রামমোহন একেশ্বরবাদের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন এবং ছোট বয়সে মুসলীম ধর্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হন। বেদান্ত ও উপনিষদে তিনি বিশ্বজনীন ঈশ্বরবাদের ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের একটা সুদৃঢ় ভিত্তি দেখতে পান। তিনি সতীদাহ নামের কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে সফল হন। কিন্তু এহ বাহ্য। তিনি চেয়েছিলেন, মৌলিক সমাজ সংস্কার—জাতিভেদ প্রথা লোপ, সর্বভাবতে সমান প্রযোজ্য দেওয়ানি আইন প্রণয়ন, মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার, বাধ্যতামূলক এক-বিবাহ প্রথা, হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহে অধিকার, স্ত্রীশিক্ষা, বিবাহের ন্যূনতম বয়স বাড়ানো। কারণ, তিনি মনে করতেন, "এখনকার হিন্দুদের ধর্মপ্রথা তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূল নয়। আমার মতে, তাঁদের ধর্ম-আচরণে কিছু পরিবর্তনের দরকার—অন্তত পক্ষে রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা ও সমাজগত শান্তির জন্য"। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে রামমোহন গণতন্ত্রে, বিশেষ করে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে, পূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সারা জগতের রাজনৈতিক প্রথা পর্যালোচনা করে এ বিশ্বাসে এসেছিলেন। ভারত ও বৃটেনের মধ্যে চিরস্থায়ী যোগসূত্র গড়ে উঠুক, এটা তিনি চাইতেন। এ মিলনে "ভারত স্বেচ্ছায় যোগ দিক, বৃটিশ সাম্রাজ্যের সহযোগী হোক"—এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। কোন আইন প্রণয়নের পূর্বে জনসাধারণের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন ছিলেন ভারতের প্রথম সংবাদপত্র সেবী, যিনি ভারতে ও বাইরে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা করে লিখতেন। 1823 সালে সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধের প্রতিবাদ করেন এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হন। শাসন ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রতিকারকল্পে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে একযোগে আন্দোলন চালানোর পুরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন।

ইংরেজী শিক্ষা

রামমোহন তাঁর জীবনে সব ব্যাপারেই প্রবীণ মহলের অধিকাংশের কাছ থেকে কঠোর প্রতিকূলতা পেয়েছিলেন। তৎসত্ত্বেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে সমাজসংস্কার ও রাজনৈতিক কর্মসূচীর ধরনধারন ও মানচিত্র অঙ্কন তাঁরই দান। বাঙ্গালীর বিবেক-চেতনায় একটা ভারতীয়তাবোধের জাগরণ হয়েছিল। এর থেকেই পরে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে উদারপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটে। চিরাচরিত সংস্কৃত ও ফার্শি চর্চার স্থানে রামমোহন "গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, শরীরতত্ত্ব এবং অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞান সম্বলিত উদার ও প্রগতিপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার" দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। 1823 সালে রামমোহন ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাব মেকলের 1835 সালের প্রসিদ্ধ নোট অনুযায়ী রামমোহনের মৃত্যুর পরে গৃহীত হয়। গভর্ণমেণ্ট এই নীতি ঘোষণা করলেন যে, ইয়োরোপীয় বিজ্ঞান ও সাহিত্যের চর্চা উন্নততর করা হবে—ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে।

নতুন ব্যবস্থায় লাভটা আবদ্ধ রইল মাত্র বিশিষ্ট মহলে। মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অগ্রাহ্য হল। সাংবাদিকের ভূমিকা, বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ এবং গবেষণামূলক প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে রামমোহন দেখালেন জটিল ও বিতর্কমূলক যুক্তি-বিচার পরিষ্কারভাবে প্রকাশ করার পক্ষে নবজাত বাংলাগদ্যের কতটুকু নিজস্ব ক্ষমতা আছে। অবশেষে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (1820 91) বাংলা ভাষাকে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কাজে লাগাবার মতো করে গড়ে তুললেন। "হিন্দু উইমেনস রিম্যারেজ এ্যাক্ট 1856" (1856 সালের হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন) এর প্রস্তাবক বলে এবং স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি-প্রচেষ্টার জন্য বিদ্যাসাগরের নাম ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্য। বিদ্যাসাগর শেষোক্ত ব্যাপারে রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ এবং ইংরেজ শাসক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের কাছ থেকে প্রচুর সহায়তা পেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর খাঁটি যুক্তিবাদী ছিলেন; সংস্কৃত সাহিত্য ও সংস্কৃত কথাকাহিনী চর্চার কেন্দ্র সংস্কৃত কলেজেও তিনি ইংরেজি শিক্ষার প্রস্তাব করেন।

বিদ্যাসাগরের প্রতিভায় ও প্রযত্নে বাংলা সাহিত্য সুরম্য ও সুসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। একথা অন্য এক পরিচ্ছেদে বলা হবে।

স্বাদেশিকতার বিকাশ

রামমোহন স্বাদেশিকতার যে বীজ বপন করেছিলেন, তা পল্লবিত হয়ে উঠলো। 1835 সালে সংবাদপত্রের উপর থেকে বাধানিষেধ তুলে দেওয়া হয় এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। অনেক সংবাদপত্র অবশ্য গোঁড়া রক্ষণশীল নীতি সমর্থন করত, কিন্তু প্রগতিপন্থী মতবাদ ধীরে ধীরে বিশিষ্ট লোকদের সহানুভূতি পেতে লাগল। সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল, জমিদার সংঘ (ল্যাণ্ড হোল্ডারস সোসাইটি) নামে, 1837 সালে। 1843 সালে "উদারনৈতিক দল"-ভুক্ত ইংরেজ জর্জ টমসনের পরামর্শে, প্রতিষ্ঠিত "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটিরাজনৈতিক-চেতনার প্রথম বীজ বপন করে"। 1851 সালে "ব্রিটিশ ইনডিয়ান এসোসিয়েশন" প্রতিষ্ঠিত হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজেও অনুরূপ সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। এসময় বেথুনের প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে--যাতে করে ব্রিটিশ প্রজারাও স্থানীয় ফৌজদারি আদালতের আওতায় আসতে পারে--জনআন্দোলন হচ্ছিল। ইয়োরোপীয়দের প্রবল চাপে বিলটি আইনে পরিণত হতে পারেনি। কিন্তু বিতর্ক রয়ে যায়, আবার সতেজে জ্বলে ওঠে, 1882-83 সালে। ঐ সময় বড়লাটের সভার সদস্য সি. পি. ইলবার্ট এক বিল পেশ করেন যাতে করে ইংরেজ নাগরিকদের বিচার ইংরেজ শাসকরাই করবেন—এই বিশেষ সুবিধাটি উঠিয়ে দেবার প্রস্তাব ছিল। বিলটি বহু বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং শেষকালে এখানেও ইয়োরোপীয় রক্ষণশীলদলই জয়ী হলেন।

কোম্পানীর কর্তারা এদিকে প্রখরভাবে সজাগ রইলেন বটে যাতে তাঁদের কুকর্মগুলি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের গোচরে না আসে, কিন্তু কোম্পানী একসঙ্গে মানদণ্ড ও রাজদণ্ড ধারণ করে থাকবে এটা প্রথম তিন দশকের বড়লাট সাহেবরা বিসদৃশ বলে মনে করতেন। সুতরাং 1833 সালের "চার্টার এ্যাক্ট''-এর বাণিজ্যিক অধিকারগুলি রহিত হল, কিন্তু রাজনৈতিক বিধানগুলি রয়ে গেল পার্লামেন্টের কর্তৃত্বাধীনে। এতে কিন্তু বিদেশী শাসনের শোষণ নীতির সংশোধন বা অবসান হল না, অর্থলোলুপতা চলতেই থাকল। সরকারী চাকুরির নিম্নস্তরের কিছু কিছু পদ যোগ্য ভারতীয়দের জন্য খুলে দেওয়া গেল, কিন্তু কোন দায়িত্বপূর্ণ পদের জন্য কোনো ভারতীয়ই উপযুক্ত বলে বিবেচিত হত না।

গভর্নমেন্ট 1817 সালে কলকাতায় প্রথম ইংরেজী কলেজ স্থাপন করেন, দ্বিতীয়টি 1823 সালে এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 1857 সালে। গভর্নমেন্ট এছাড়াও কয়েকটি স্কুল-কলেজ স্থাপন করেন। কিন্তু আরো বেশি সংখ্যায় বিদ্যালয় স্থাপন করেন কলকাতা এবং জেলা সমূহের ধনী জমিদার ও বদান্য ব্যক্তিগণ। নতুন বড় লোকদের ভিতর দু'টি শ্রেণী দেখা যেত। উচ্চস্তরেরা কলকাতায় বাসা বাঁধতেন, ভাবতেন, তাঁরা শিক্ষা দীক্ষায় ইংরেজদের সমকক্ষ। ইচ্ছে থাকত, গভর্ণমেন্টের দায়িত্বপূর্ণ কাজেও সমান স্বীকৃতি পান। অন্যশ্রেণীর লোক ততটা নাক উঁচু ছিলেন না। তাঁরা মধ্যবিত্ত ঘরের, অনেকেই গ্রামের সঙ্গে যোগ রেখে চলতেন। তাঁরাও আরো সরকারি চাকুরির দাবি করতেন। একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, তাঁরা "বাবু লোকের'' কাজে আগ্রহী ছিলেন। ইংরেজ বাসিন্দাদের হাতে ছিল রাজনৈতিক আর বাণিজ্যিক ক্ষমতা। ইয়োরেসিয়ানরা প্রায় এক চেটে করেছিলেন দ্বিতীয় স্তরের পদগুলি—রেলওয়েতে, ডাক বিভাগে এবং অন্তর্দেশীয় জলপথ বিভাগে। ব্যবসা বাণিজ্যে গুজরাটি, মাড়োয়ারি ও আর্মানিগণ দলে ভারী ছিলেন। কলকাতার বেশির ভাগ শ্রমজীবীরাই ছিল বিহার, ইউ,পি, এবং উড়িষ্যার। (এ সময় বঙ্গদেশ বলতে শুধু বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলই নয়, বিহার, উড়িষ্যা ও 1874 সাল অবধি আসামকেও ধরা হত)। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টির একটা কারণ এই ছিল যে যাঁরা "সাহেবী বাঙ্গালী'' নন তাঁদের কোনো সুযোগ সুবিধা দেওয়া হত না, আর সরকারী এবং বেসরকারী ইংরেজরা বাঙ্গালী "বাবুদের'' প্রতি একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করতেন, তাঁদের দেশাত্মবোধকে ভয়ও করতেন।

1857 সালের সিপাহী বিদ্রোহ বিশিষ্ট বাঙ্গালী লোকদের ভিতর তেমন কোনো সহানুভূতি জাগায়নি। কিন্তু বাঙ্গালীদের "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান আর্মি''-তে নেওয়া হত না—সিপাহী-বিদ্রোহে বাঙ্গালী সিপাহীদের সক্রিয়তা মনে রেখে বৃটিশ রাজ অবশেষে 1858 সালে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হাতে নিয়ে নিলেন। এরপর দাবি করা হল, অদূর ভবিষ্যতে "ভারত সংক্রান্ত সমস্ত প্রশ্ন ভারতীয়রাই সমাধান করবেন''। বৃটিশ রাজের অধীনে প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন প্রণালী প্রবর্তনের দাবি শুধু বঙ্গদেশে নয়, বোম্বাই, মাদ্রাজেও উত্থিত হল।

নীল-বিদ্রোহ ও তারপর

1860 সাল রাজনৈতিক বিবর্তনের একটা সন্ধিক্ষণ। বঙ্গদেশে ইংরেজ-মালিকদের নীল ক্ষেতের চাষী শ্রমিকরা অমানুষিক শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে একযোগে বিদ্রোহ করলেন। এই অত্যাচারে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশরাও সাহায্য করত। বিদ্রোহটি স্থানীয় সুবন্দোবস্তে ও সহযোগিতায় এবং মোটামুটি অহিংস উপায়েই সফল হয়। কৃষক শ্রমিক ও গ্রামদেশী মাতব্বরদের ভিতর একটা নতুন চেতনার আভাস এই বিদ্রোহ থেকে প্রকট হয়। এই গ্রামদেশীরা একাজ করার পূর্বে কলকাতার বড় লোকদের পরামর্শ নেন নি। ইংরেজ শাসকদের সহৃদয়তা ও সদিচ্ছায় সন্দেহ জাগতে থাকে, আর রাজনৈতিক মতামতে ও তার প্রকাশে একটা সংঘর্ষ ও বিরূপতার ভাব পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গভর্ণমেণ্ট এবং এই "বাবুদের" পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব ক্রমেই বাড়তে থাকে।

পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল 1876 সালে সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি কর্তৃক "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন" প্রতিষ্ঠা। এই সংস্থা ছিল পেশা অবলম্বী এবং ছোটখাটো জমিদারদের মুখপাত্র। সুরেন্দ্র নাথ সিভিল সার্ভিস থেকে প্রায় বিনা কারণে পদচ্যুত হন। তিনি ছিলেন অক্লান্ত পরিশ্রমী। জনপ্রিয়তার শিখরে উঠে তিনি মানসিক দৃঢ়তা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি স্বাদেশিকতার বাণী প্রচারে এবং "অন্যায়ের প্রতিকার ও আমাদের দাবি সংরক্ষণ কল্পে" গণ্যমান্যদের একজোট করবার জন্য ভারতের সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সুরেন্দ্র নাথ ছিলেন বৃটেনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উদারনীতিক মতবাদের সমর্থক। সুশৃঙ্খল প্রগতি এবং নিয়মতান্ত্রিক গণ-আন্দোলনে তাঁর আস্থা ছিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক কর্ম-পদ্ধতি ও সংগঠন শক্তি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী মানসের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ভারতে একটি জাতীয় রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপনের প্রথম চেষ্টায় 1885 সালে "ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠিত হয়। "বিশিষ্ট ও সুশিক্ষিত" লোকদেরই প্রতিনিধি ছিল এই কংগ্রেস। সুরেন্দ্র নাথ এই কংগ্রেসে যোগ দিলেন এবং শীঘ্রই এই সংস্থার একজন কর্ণধার হয়ে পড়লেন।

বঙ্গদেশের জনমতের বেশির ভাগই গোড়ার দিকে কংগ্রেসের কার্যকলাপে তেমন সন্তুষ্ট ছিল না। বাঙ্গলা ও মারাঠার উগ্রপন্থী দল বৃটিশ সাম্রাজ্যকে অজেয় ও অনিন্দনীয় বলে মনে করতেন না। কংগ্রেস নেতাদের আবেদন-নিবেদন নীতিতে এঁদের আস্থা ছিল না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, বৃটিশরা রাজত্ব করতেন নিজেদের স্বার্থে, ভারতীয়দের মঙ্গলের জন্য নয়। এই ভাব থেকে একটা উগ্র চরমপন্থী স্বাদেশিকতার উদ্ভব হল যার নীতি হল সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

1905 সালের বঙ্গভঙ্গ

এই চরমপন্থী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গদেশ দু'ভাগে বিভক্ত হল—পশ্চিম বাঙ্গলা-বিহার-উড়িষ্যা ও পূর্ববাঙ্গলা-আসাম। একথা সত্য যে,

বাঙ্গলার মুসলীম নেতারা বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করতেন, কারণ তাতেই পূর্ববাঙ্গলা-আসাম প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যা গরিষ্ঠ হবেন। তখনকার কংগ্রেস নেতারা এই দেশ বিভাগের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানালেন, কিন্তু কোনো ফল না পেয়ে অবশেষে বাঙ্গলার চরমপন্থীদের বর্জননীতি, স্বদেশী ও অহিংস আইন অমান্য আন্দোলন সমর্থন করতে বাধ্য হলেন।

এ সময় এলেন শ্রী অরবিন্দ, বাঙ্গলার যুব মানসের নেতা হয়ে। তিনি চাইলেন, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন পূর্ণ-স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ নিক। এজন্য তিনি একটা বিপ্লবী দল সৃষ্টি করলেন। তার ভিতর একটি গুপ্ত কর্মী সংঙ্ঘ রাখা হল। অরবিন্দ তাঁর দলীয় লোকদের দ্বারা বৈপ্লবিক সংবাদপত্রও প্রকাশ করতে লাগলেন। এই আন্দোলন অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ল এবং 1914-18 সালের বিশ্বযুদ্ধের সময় সন্ত্রাসবাদীরা রাজতন্ত্রী জার্মান সরকারের অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করলেন। প্রচেষ্টাটি বিফল হয় এবং বিপ্লবী নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি বালেশ্বরের খণ্ডযুদ্ধে নিহত হন। বাংলা ও পাঞ্জাবে হাজার হাজার যুবক বিনা বিচারে জেলে আটক থাকেন। গভর্নমেন্ট এই আন্দোলনটিকে এতটা সাংঘাতিক মনে করলেন যে এর দমনের পন্থা বাৎলাবার জন্য "রাউলাট কমিশন"কে নিয়োগ করলেন। রাউলাট আইন দেশব্যাপী প্রতিবাদের সূচনা করল, যার পরিণতি হল জালিয়ানওয়ালা বাগের গণহত্যাকাণ্ডে। ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রত্যক্ষ গণ-সংগ্রামের অহিংস অসহযোগ কর্মপন্থা প্রবর্তন করলেন মহাত্মা গান্ধী। আর পরিশেষে মিলে গেল ভারতের স্বাধীনতা।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী সংগ্রামের কথায় ফিরে গেলে দেখা যায় যে এটি এতটা বিস্তৃত ও উদ্দীপনাময় ছিল যে গভর্মেন্টের দমননীতি একে দাবিয়ে রাখতে পারল না। লর্ড হার্ডিনজের উক্তিমত একটা প্রায়-রাষ্ট্রবিপ্লবের মুখোমুখী হয়ে দেশভাগ রহিত করা হল 1911 সালের ডিসেম্বরে। বাংলা ভাষাভাষী বাংলা আবার এক হল।

পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি

এ সময় ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তিনটি দলের সুস্পষ্ট আদল নির্ধারণ করা যায়। প্রথমত, জাতীয়তাবাদীরা—যাঁরা চেয়েছিলেন পূর্ণ-স্বাধীনতা। দ্বিতীয়ত, মডারেট বা উদারনীতিকরা—যাঁরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন। তৃতীয়ত, আর একদল—বিশেষ করে মুসলীম নেতা ও দেশীয় রাজগণ—যাঁরা চেয়েছিলেন ব্রিটিশ পরিচালিত রাজত্বের স্থিতি। এঁদের এই ভয় ছিল যে, গণতন্ত্র মুসলমানদের স্বার্থের হানিকর হবে। কারণ, মুসলমানরা গোটা ভারতে সংখ্যালঘু, যদিও বঙ্গদেশে সংখ্যাগুরু এবং গণতান্ত্রিক বিধান বাঙ্গলায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার লাভটুকু মুছে নেবে। বঙ্গদেশে ব্যাপারটা আরো জটিল ছিল। কারণ, সেখানে বড় বড় জমিদারগণ ছিলেন হিন্দু। আর অর্থলিপ্সু মহাজনরাও ছিলেন হিন্দু। এই জমিদারগণ প্রজাস্বত্ব সংশোধন আইনের বিরোধী ছিলেন।

মহাজনরা মুসলমান-প্রধান কৃষক শ্রেণীকে দুর্ভেদ্য ঋণজালে অহরহ আবদ্ধ করে রাখতেন। বাংলার কংগ্রেস নেতা ও স্বরাজ্য দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (1871-1925) এই ক্লেশকর পরিস্থিতি দূর করবার জন্য কতকগুলি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মৌলিক সংস্কারের প্রস্তাব করেন। কিন্তু জমিদার ও আমলাতন্ত্রবাদীরা একজোট হয়ে তাঁকে পরাজিত করে। এই জোট মুসলীম নেতাদের সমর্থন করে যেতে লাগল। এর মিলিত ফলশ্রুতি হল, তাঁবেদার মুসলীম নেতারা মুসলীম জনসাধারণকে নিজেদের আওতায় রেখে ভেদনীতি চালু রাখতে পারলেন। ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় 1906 সালে "মুসলীম লীগ" প্রতিষ্ঠিত হল। লীগ হল মুসলীম ভেদ-নীতির পুরোধা। যখন পরিষ্কার বোঝা গেল যে অদূর ভবিষ্যতে ভারত স্বাধীন হতে যাচ্ছে, তখন উপমহাদেশকে মুসলীম সংখ্যা-গরিষ্ঠ ও মুসলীম সংখ্যা-লঘিষ্ঠ অংশে বিভক্ত করে লীগ পাকিস্তানের দাবি করে বসল।

অগ্রগতির সহযাত্রী

1921 সালের অসহযোগ আন্দোলন, 1930 সালের আইন অমান্য আন্দোলন 1942 সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলন—1921 সাল থেকে একের পর এক কংগ্রেসী আন্দোলনেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে বঙ্গদেশ স্বাধীনতার জন্য দুঃখ কষ্ট বরণ ও স্বার্থত্যাগের গৌরব ও সম্মান অর্জন করেছিল। আর এই স্বার্থত্যাগ ছিল গভর্মেন্টের সন্ত্রাসবাদ সত্ত্বেও--যা বঙ্গদেশেই ছিল সবচেয়ে নিদারুণ। 1930 ও 1942 সালের আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলার লোকদের কৃতিত্ব ও স্বার্থত্যাগ বিশেষভাবে স্মরণীয়।

স্বাধীনতা লাভের আগের পাঁচ বছরে বঙ্গদেশ দু'টি ভীষণ দুর্দৈবের মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথমটা হল, 1943 সালের দুর্ভিক্ষ। এটা ঘটেছিল গভর্মেন্টের যুদ্ধের মালপত্র সংগ্রহ ও যানবাহন বন্ধ করবার নীতি থেকে। অন্তত 30 লক্ষ লোক এ দুর্ভিক্ষে মারা যায়--অধিকাংশই পশ্চিমভাগের 24 পরগণা, মেদিনীপুর, বর্ধমান, হুগলী এবং হাওড়া জেলায়। দ্বিতীয়টা হল, কলকাতার ভীষণ হত্যাকাণ্ড (দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং) যা ঘটেছিল বাঙ্গলার মুসলীম লীগ গভর্মেন্টের প্ররোচনায় 1946 সালের আগস্টের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। লীগ গভর্মেন্ট চেয়েছিল, পাকিস্তান-আন্দোলনের শক্তি দেখাতে। কলকাতার হত্যাকাণ্ডের জের স্বরূপ পূর্ববাঙ্গলার নোয়াখালী জেলায় আর এক আগুন জ্বলে উঠেছিল—এবার হিন্দু নিধনের। বাংলার অন্যান্য অঞ্চল শান্ত ছিল বটে, কিন্তু বিহারে মুসলীম হত্যালীলা ঘটিয়ে এর প্রতিশোধ নেওয়া হল। এই তাণ্ডব লীলায় মর্মাহত হয়ে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ন'মাসেরও অধিককাল নোয়াখালী ও কলকাতায় অবস্থান করেন। তাঁর এই ব্রত সফল হয়েছিল বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে যে-সব রাজনৈতিক ঘটনা দ্রুত ঘটছিল তার পরিণতির উপর তিনি কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।

স্বাধীনতা ও 1947-এর দেশভাগ

কংগ্রেসের চরম পন্থীরা পূর্ণ-স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (1897-1945) ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। তিনি গান্ধীবাদী সংখ্যাগরিষ্ঠ কংগ্রেস-সদস্যদের সঙ্গে নীতিগত মতানৈক্য হেতু 1939 সালে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। অতঃপর সুভাষচন্দ্র 'ফরওয়ার্ড ব্লক' স্থাপন করলেন এবং জার্মানী হয়ে জাপান গমনের উদ্দেশ্যে 1941 সালে বন্দী অবস্থা থেকে উধাও হন। চমকপ্রদভাবে তিনি "ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি" গঠন করলেন। এই সেনাদল গঠিত হয়েছিল ভারতীয়দের নিয়ে—যাঁরা ছিলেন মালয় ও ব্রহ্মদেশের স্থানীয় বাসিন্দা এবং জাপানীদের হাতে যুদ্ধ-বন্দী সেনা। সুভাষ তাঁর সেনাদল সহ ভারতের পূর্ব দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিন্তু 1945 সালে জার্মানী ও জাপানের পরাজয়ে তাঁর মহান প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত সার্থক হতে পারল না।

ব্রিটেন অমিত মাত্রায় আমেরিকান সাহায্য নিয়ে যুদ্ধে জিতলেন। কিন্তু গভর্মেণ্ট বুঝতে পারলেন যে শীঘ্রই তাঁদের ভারত ছাড়তে হবে। কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সঙ্গে প্রস্থে প্রস্থে আলোচনার পর দেশভাগের একটা খসড়া তৈরি করা গেল। অবশেষে দাঁড়াল এই যে, 1947 সালের 15 আগষ্ট বঙ্গদেশের পূর্বভাগ হয়ে গেল পাকিস্তানের একটা অঙ্গ। যে বঙ্গদেশ ভারতের জাতীয় জাগরণে এত গুরুত্বপূর্ণ অংশ নিয়েছিল, যে বঙ্গদেশ এত ক্ষতি স্বীকার ক'রে, এত নির্যাতন সয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে রসদ যুগিয়েছিল—সে-ই বঙ্গদেশকে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বড় দুঃখের ডালি নিবেদন করতে হল!

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল। সেই ব্যবস্থা একেবারে বানচাল হয়ে গেল। শরণার্থী হিন্দুদের দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে আগমন শুরু হল। 1971 সাল পর্যন্ত 89 লক্ষেরও বেশি লোক পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকারের দান ও সাহায্য ভিক্ষা করেছে। অনেক লোক আবার সরকারী সাহায্য ছাড়াই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় চেষ্টিত হয়েছে। 1971 সালের 25 মার্চ পাকিস্তান বাংলাদেশের (পুরাতন পূর্ব-পাকিস্তান) উপর ক্ষিপ্র আক্রমণের পর থেকে হিন্দু মুসলীম এক কোটি লোক পাকিস্তানীদের নৃশংস হত্যা লীলার হাত থেকে বাঁচবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব প্রদেশগুলিতে পালিয়ে এসেছিল। পাকিস্তান পরাজিত হবার পর 1971 সালের ডিসেম্বরে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হল। তখন এই বাস্তুত্যাগী জন-সমুদ্র ঘরে ফিরে যায়। তাঁরা চেয়েছিলেন সমাজবাদী, গণতান্ত্রিক এবং ধর্ম-নিরপেক্ষ বলে ঘোষিত নতুন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ব্যবস্থার ও জীবনযাত্রার উপর যে ব্যাপক চাপ পড়েছিল, তা অতি ক্লেশজনক। কিন্তু জনগণ সাংস্কৃতিক অধঃপতন থেকে সফল ভাবে বেঁচেছে। এই দুর্যোগে পশ্চিমবঙ্গে নানা শ্রেণীর বামপন্থীদের উত্থান হয়। আইন ও শৃঙ্খলার অবনতি এবং শিল্পশ্রমিক চাঞ্চল্যের ফলে 1967 সাল থেকে 1970 সাল অবধি রাজ্যের আর্থিক অবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষিত হতে পারেনি। চাঞ্চল্যের অবস্থা অবশ্য এখন আর নেই এবং আশা করা যায়, স্থিতিশীল পরিবেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির যুগ আগতপ্রায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

জাতির সাহিত্য, সঙ্গীত, লোকরঞ্জক নৃত্য-নাট্য ও চারুকলা এবং হস্তশিল্প তার সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের পরিচয় দেয়। এই ক্রমবিকাশের ধারা ঠিক সোজা পথে চলে না, কিন্তু নদীর গতিপথের মতই এঁকে বেঁকে যায়। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে সমাজের প্রভাব প্রতিপত্তি ও বিভিন্ন উপাদানে তৈরী তার সর্বাঙ্গীন চিত্র প্রতিফলিত করে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি জাতি-ভিত্তিক বঙ্গদেশের অপরিহার্য অঙ্গ।

সাহিত্য

বাংলা ভাষা তার বিশিষ্ট রূপ নেবার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যেরও জন্ম হয়। কিন্তু দশম শতাব্দীর পূর্বে কোনো সাহিত্য রচিত হয়েছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। বিভিন্ন সময়ে হিন্দু রাজত্বের রাজসভার মার্জিত ভাষা ছিল সংস্কৃত, যাতে বহু পুস্তক রচিত হয়েছিল। বাংলা লেখনের সবচেয়ে পুরানো নমুনা মেলে পাল যুগে—বোধহয় দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি। "চর্যাপদ" হল মহাযানী ধর্মমতের বিশিষ্ট প্রচারকদের রচিত ভজন গীতি। এই যুগ এবং 1200 সালের মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা কাহিনী নিয়ে রচিত গীতিকথাও কিছু কিছু দেখা যায়। লোকসঙ্গীতের কিছু কিছু, যা বহুকাল পরে পুঁথিতে লিখিত হয়েছিল, তাও নিশ্চয়ই অনেক পূর্বে রচিত হয়েছিল—কারণ এগুলি নীতি-শিক্ষামূলক এবং বৌদ্ধধর্মমতের দ্বারা প্রভাবিত। লোকসঙ্গীতগুলি তখনকার যুগের ঘটনা ও কাহিনী বর্ণনা করেছে।

সাহিত্যের দিক থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী একেবারেই নিষ্ফল। এটি ছিল তুর্কী আক্রমণের যুগ। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যখন বঙ্গদেশ স্বাধীন মুসলীম রাজ্য হল, তখন শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্যচর্চা পুনরায় সুরু হয়। এই সময়টা (1350--1500) চৈতন্য যুগের পূর্ববর্তী। এ সময়েই চণ্ডীদাস নামের চারজনের এক চণ্ডীদাস--বড়ু চণ্ডীদাস—তাঁর "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" নামে এক অতি বিশিষ্ট কবি-গাথা রচনা করেন। এই কবি-গাথা একটি প্রধান চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব পদাবলী বলে গণ্য হয়। পদাবলীগুলি সুর করে গাওয়া হত এবং 'কীর্তন' জাতীয় বাংলা সঙ্গীত প্রথার একটি প্রধান উপাদান ছিল। এই যুগের পরবর্তী বিশিষ্ট কবি হলেন কৃত্তিবাস ওঝা। কৃত্তিবাস ছিলেন নদীয়ার ফুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি গৌড়ের রাজার—বোধহয় রাজা গণেশ—নিকট থেকে সংস্কৃত "রামায়ণকে" বাংলায় অনুবাদ করবার ভার পান। কৃত্তিবাস রামচরিত অঙ্কনে মূল কাহিনীর অদল বদল

করেন। তিনি রামচন্দ্রকে অতিমানব করে চিত্রিত করেছিলেন যাঁর ভিতর বীরত্ব ও ক্ষমাগুণ অতি সুষমভাবে একত্র হয়ে গিয়েছিল। যদিও অন্যান্য যুগে, কবিরা এই কাব্যের অন্যান্য অনুবাদ করেছিলেন, তবু কৃত্তিবাসের অনুবাদই বাঙ্গালী পাঠকদের বিশেষ প্রিয়। প্রায় সমস্ত হিন্দুর ঘরে ঘরে ও আসরে এই রামায়ণ গীত হয়।

এই যুগের অন্যান্য কবিদের মধ্যে অন্যতম হলেন বর্ধমান জেলার মালাধর বসু। ইনি "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" কাব্য লিখে গৌড় অধিপতি সুলতান সামসুদ্দিন ইয়ুসুফ শার কাছ থেকে শিরোপা পান। "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" ভাগবত পুরাণকে ভিত্তি করে লেখা এবং বাংলা সাহিত্যে প্রথম বর্ণনামূলক কাব্য। আর একজন হলেন শ্রীখণ্ডের (বর্ধমান) যশোরাজ খাঁ। তিনিও সুলতানের কাছ থেকে সম্মান পান কৃষ্ণকথা লিখে। তারপর বিজয়গুপ্ত। ইনি "পদ্মপুরাণ" বা "মনসামঙ্গল" রচনা করেন বৌদ্ধ পাল যুগের পুরানো এক কাহিনী নিয়ে। এরপর এলেন, সঞ্জয়, কবীন্দ্র, পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী—যিনি মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ সম্পন্ন করেন।

লক্ষণীয় বিষয়, একমাত্র চণ্ডীদাস ভিন্ন এ যুগের সমস্ত কবিই স্থানীয় চলতি সংস্কৃত কাহিনী থেকে তাঁদের বিষয়বস্তু আহরণ করেন। চণ্ডীদাসই একান্ত মৌলিক বিষয় কামগন্ধহীন ভাগবতী প্রেমের কথা নিয়ে লিখেন। পরবর্তী শতাব্দীতে যেসব "মঙ্গল" কাব্য রচিত হয়েছিল সেগুলিও পুরানো কাহিনীই সাজিয়ে গুজিয়ে লেখা। তাতে থাকত বৌদ্ধ উপাদান অথবা পুরানো অনার্য প্রথা থেকে উদ্ভূত বঙ্গদেশের দেবদেবীর গুণগান। এরূপ কাহিনী এবং তার ভিত্তিতে লেখা এরূপ কবিগাথা বা "পাঁচালী" ছিল অনেক। এগুলি গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে আসরে আসরে গীত হত।

বৈষ্ণব সাহিত্য

চৈতন্য যুগের (1500--1800) বাংলা কবিতা সাহিত্য-সৃষ্টির সিংহদ্বার মুক্ত করল। কবিতার দু'টি শ্রেণীবিভাগ দেখা যায়—শ্রীচৈতন্যের জীবনকথা নিয়ে, আর রাধাকৃষ্ণের ভাগবতী লীলা বিবৃত করে। স্থানীয় দেবদেবী নিয়ে আগেকার কবি-গাথাও পূর্ণ উদ্যমেই চলছিল। শ্রীচৈতন্যর পরম ভক্ত গোবিন্দদাস কর্মকারের লেখা "কড়চা" চৈতন্যদেবের একখানি সুন্দর জীবন-কাহিনী। জয়ানন্দের "চৈতন্য-মঙ্গল" তখনকার ইতিহাসের কথায় সমৃদ্ধ। বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত" শ্রীমদভাগবতের ছাঁচে রচিত। পুস্তকটিতে শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণের মতো ভগবানের অবতার বলে রূপায়িত করা হয়েছে। মহাপ্রভুর এই ভাব-মূর্তি লোচনদাস আরো গভীর ভাবে চিত্রিত করেন। তিনি কল্পনার সপ্তম স্বর্গে উঠেছিলেন। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বর্ণনা হল কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য চরিতামৃত"। "চরিতামৃত" সরল ভাষায় জীবন কথার সঙ্গে বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিতত্ত্বের মিলন ঘটিয়েছিল। বৈষ্ণব সাহিত্যে "চরিতামৃতের" জুড়ি নেই।

কৃষ্ণ-রাধা কাহিনী—যা ছিল চণ্ডীদাসের বৈশিষ্ট্য—তা আরো উন্নত হল কয়েকজন বিশিষ্ট গীতি-কবির দ্বারা। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন জ্ঞান দাস, গোবিন্দ

দাস, বলরাম দাস ও নরোত্তম দাস। আওয়াল মনোহর দাস, রাধামোহন ঠাকুর ও বৈষ্ণব দাসের সঙ্কলিত ভক্তিগাথাও সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যও লৌকিক দেবদেবীর গুণগাথায় ভরপুর। নিম্নশ্রেণীর লোকদের পূজ্য, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বাইরের দেবতা ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে ষোড়শ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে বহু গীতিকবিতার রচনা হয়। ঘনরাম চক্রবর্তীর "ধর্ম-মঙ্গল" এগুলির মধ্যে বিশিষ্ট। আর্য-পূর্ব ধর্মবিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম, হিন্দুধর্ম, এ সব নিয়ে গ্রথিত ধর্মবাদ রমাই পণ্ডিতের "শূণ্য পুরাণে" বিবৃত আছে (ষোড়শ শতাব্দী)। "মঙ্গলচণ্ডীর" কাহিনীগুলি গীতিকবিতারূপে চৈতন্য যুগের পূর্ব থেকেই প্রচারিত ছিল। কাহিনীগুলিতে লৌকিক দেবী "চণ্ডী" মাতার মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। যে কবি এগুলিকে লিখিতরূপে অমর করে রাখেন, তিনি হলেন মুকুন্দরাম মিশ্র। মুকুন্দরাম ছিলেন সংস্কৃত, আরবী ও ফার্শি ভাষায় পণ্ডিত; অধিকন্তু একজন সঙ্গীতজ্ঞও। সুদীর্ঘ কবিতাটি দুঃস্থদের বর্ষব্যাপী দুঃখ কষ্টের বাস্তব বর্ণনায় সমৃদ্ধ। কবিতাটি তখনকার বঙ্গদেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মবিষয়ক অবস্থার উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করে।

বৈষ্ণব গীতিকাব্য বা "পদাবলী" শাশ্বত প্রেমভক্তির জয়গান, জীবনবেদের উদ্গাতা। প্রেম হল অন্তরের নিবিড় অনুভূতি, রূপে রূপে প্রকাশমান—প্রশান্ত ধ্যানে, সেবার ইচ্ছায়, প্রগাঢ় বন্ধুত্বে, পিতৃমাতৃসেবায়, আর প্রেমাস্পদে আত্ম-সমর্পণে। ভক্তজনের আত্মসমর্পণ যখন কৃষ্ণে নিবদ্ধ হয়, তখন শুরু হয় দেবতার লীলা। এই প্রেমই বৈষ্ণব গীতিগাথার প্রধান বিষয়বস্তু। চৈতন্য-কথিত বৈষ্ণববাদ মতে মানুষের আত্মা হল প্রেমিকা রাধা—যে নিরন্তর যাচঞা করছে প্রেমিক কৃষ্ণের সঙ্গে চিরমিলন। ধর্মনিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখলেও এই গীতিগাথার একটা সর্বজনীন আবেদন আছে জগতের সমস্ত প্রীতিভালবাসার ও প্রেমিকপ্রেমিকার প্রেমের কাছে।

এই যুগের শেষার্ধে শক্তিবাদের উপর লিখিত নীতিগাথা ও কবিতার প্রাচুর্য ছিল। এখানেও একটা বাঙ্গালী সুর দেখা যেত। দেবী এখানে আর সৃষ্টি-প্রলয়ের কর্ত্রী নন, মহাভীমা রূপে আর সৃষ্ট-প্রাণীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রাত্রী নন, কিন্তু এখন তিনি স্নেহময়ী, রক্ষাকারিণী মা বা স্নেহাস্পদা কন্যা—এক পরম সত্ত্বা, যাঁর সঙ্গে ভক্ত সুনিবিড় ব্যক্তিগত সম্বন্ধে আসতে পারেন। এই শ্রেণীর কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট হলেন রামপ্রসাদ সেন। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে জীবিত ছিলেন। তাঁর গীতিগাথা আজও বাঙ্গালী গেয়ে বেড়ান—সে গুলির সাদাসিধে ভাব ও মূলগত ভক্তিরসের জন্য। বাঙ্গলার শক্তিবাদের বিশেষত্ব দেবী দুর্গার রূপায়নে। দেবী হিমালয় রাজের কন্যা; বিবাহ হয়েছিল শিবের সঙ্গে। পিতামাতাকে দেখবার জন্য প্রতিবছর তিন দিন তিনি শ্বশুর বাড়ি কৈলাস পর্বত থেকে নেমে আসেন। রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও রাম বসুর বহুগান আদরিণী কন্যার আসা ও বিদায় নেবার সময় মায়ের হৃদয়াবেগ চিত্রায়িত করে।

গ্রাম্য-কবিতা

গ্রামদেশে একেবারে ভিন্ন এক শ্রেণীর কবিতা রচিত হত। এগুলি হল পার্থিব ভালবাসার গীতিগাথা। সাধারণ ধুলোমাটির পৃথিবীতে সামান্য নরনারীর সুখ-দুঃখের কথা। এই ধরনের কবিতার দেখা মেলে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত ময়মনসিংহ গীতিকায়। তাদের বৈশিষ্ট্য হল সোজাসুজি সাদাসিধে প্রকাশভঙ্গীতে, যা নগরপারের মুখোস পরা কাব্যমালায় দেখা যেত না। এই গীতিকবিতাগুলি সামাজিক বিধিনিষেধের উর্ধ্বে প্রেমের জয়গান গাইত। কবিরা হিন্দু মুসলমান দু'সমাজেরই ছিলেন। কৌতুহলের বিষয়, গীতিকারদের মধ্যে বহু মুসলমানকে রাধাকৃষ্ণলীলা নিয়ে লিখতে দেখা যেত। সহজিয়া বা বাউল শ্রেণীর কিছু কিছু মুসলমান অতি সুন্দর ও ভাব-গম্ভীর কাব্য-গাথা রচনা করেছিলেন। মধ্যযুগের শেষভাগে অনেক মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মমূলক রচনায় যোগ দিয়েছিলেন। এর থেকে স্পষ্ট হয় কী এক রহস্যময়ভাবে ভক্তিরস ভাব সাধারণ্যে বাঙ্গালী-মুসলমানী ধর্মের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

সংস্কৃত থেকে পদ্যে অনুবাদ করার এটাও একটা প্রধান যুগ ছিল। কয়েকজন কবি রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেন। 1600 খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি একটি প্রথম শ্রেণীর অনুবাদ হয় বর্ধমান জেলার কায়স্থ বংশীয় কাশীরাম দাসের দ্বারা। তিনি কাব্যটিকে 18টি সর্গে সমাপ্ত করেন। অনুবাদ তিনি মোটামুটি ব্যাসের মূল গ্রন্থ থেকেই করেছিলেন, কিন্তু মাঝে মাঝে একটু অদল বদল যে না হয়েছিল এমন নয়। এই অনুবাদটি পরে অনেক কবির অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল। তাঁর রচনা ছিল সহজ বাংলায়। মাঝে মাঝে বিশুদ্ধ অনুপ্রাসযুক্ত সংস্কৃত চরণও আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজকবিদের রচনা পদ্ধতির পূর্বাভাস এতে ছিল।

মুসলীম অনুবাদকদের মধ্যে মুখ্য স্থান প্রাপ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে আরাকানের বৌদ্ধ রাজার সভাকবি আলাওলের। এই অনুবাদকদের অনেকেই হজরত মহম্মদের জীবনী ও বিশিষ্ট পার্শী গ্রন্থের উপর কবিতা রচনায় মূল আরবী ও পার্শী ভাষায় লিখিত পুস্তকের সাহায্যই নিয়েছিলেন। আলাওলের প্রধান রচনা হল মালিক মহম্মদ জৈশির হিন্দী "পদ্মাবতী কাব্যের" অনুবাদ। তিনি আলাউদ্দিন খিলজির চিতোর অভিযান ও রাণী পদ্মিনীর জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জনের মূল কাহিনীটির বেশ কিছুটা রদবদল করেন। তাঁর রচনায় সংস্কৃত ও বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রভাব এবং তাঁর বহুমুখী পাণ্ডিত্যের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষ্য করা যায় যে উপরে উল্লিখিত কবিদের অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গের খাস গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী এবং রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কাজ করতেন। রাজারাও ছিলেন প্রায় সকলেই মুসলীম।

ভারতচন্দ্র

"কবিগুণাকর" ভারতচন্দ্র মধ্যযুগীয় কাব্যধারার ধারা বজায় রেখে চলেছিলেন।

ভারতচন্দ্রের যুগ হল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হিসাবে তাঁর খ্যাতির ছিল। ভারতচন্দ্রের প্রধান রচনা তিনখণ্ডের পদ্যগ্রন্থ "অন্নদামঙ্গল"। এর দ্বিতীয় খণ্ডে আছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। বর্ধমানের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর গুপ্ত প্রেমের গল্প বইটিতে আছে। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে কালিকাদেবী বা অন্নদার (ক্ষুধার অন্নদাত্রী) কৃপায় বিদ্যাসুন্দরের উদ্ধার পাবার কথা গল্পের বিষয়বস্তু। পুস্তকের এই অংশে যৌনপ্রেম সংক্রান্ত বর্ণনা আছে যা অবশ্য অশ্লীল বা ইতরতার পর্যায়ে পড়েনি। এটা সম্ভব হয়েছিল কবির রচনাশৈলীর গুণে ও যৌন সম্বন্ধকে একটা রহস্যজালে আবৃত করে দেখাবার সাফল্যে। ভারতচন্দ্রের ছন্দশাস্ত্রে বিস্ময়কর কৃতিত্ব ছিল। অনুপ্রাসের প্রয়োগবিধিতে, সংস্কৃতের সঙ্গে লৌকিক বাংলা শব্দের মিশ্রণে তিনি সুদক্ষ ছিলেন। ভারতচন্দ্র সংস্কৃত কবিতার আদর্শে বাংলা কবিতায় অনেক ছন্দের সৃজন করেন।

1760 সালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এক শতাব্দী ধরে কবিতার মধ্যযুগীয় ধারা আস্তে ধীরে বয়ে চলছিল, প্রায় বদ্ধ হয়ে পড়েছিল নগণ্য খুঁটিনাটিতে, ইতরতা আর অশ্লীলতার নালা নর্দমায়। এগুলিই ছিল কলকাতার ভিতর বা বাইরে ইংরেজ-শাসকদের আশ্রিত এ যুগের অভিজাতদের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য। এ ধরনের নব্য-বাবুদের পৃষ্ঠপোষকতায় একটা জনপ্রিয় খেলা ছিল "কবির লড়াই"। এই লড়াইতে দু'জন (কবি নামধারী) তখন তখন রচিত নিকৃষ্ট কবিতা সুর বেঁধে গেয়ে পরস্পরকে গালি দিয়ে আসর জমাত। "দরবারী গানের" সৃজনও এ সময় হয়, যাতে প্রেম ও ভক্তির বিশেষ ভাবে রচিত গান শাস্ত্রীয় ছন্দে গাওয়া হত। এ ধরনের কবিদের মধ্যে ছিলেন রামনিধি গুপ্ত বা "নিধুবাবু"। ইনিই প্রথম বাংলায় টপ্পা জাতীয় গান রচনা করেন। এ সব কবিতার অধিকাংশই ছিল পার্থিব প্রেম সংক্রান্ত। এগুলি তাঁর সমসাময়িক ও পরবর্তীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে নতুন সামাজিক ও নৈতিক চেতনার উদ্ভবের পর আধুনিক যুগের সূচনা হল। গোঁড়া ও সংস্কারক দলের ভিতর সংঘর্ষের তিক্ততা তীব্রতর হতে থাকলেও একথা সকলেই বুঝেছিলেন যে এই গুরুতর নৈতিক বিকৃতি ও অধঃপতন থেকে শিক্ষিত ভদ্র সমাজকে উদ্ধার করা দরকার। এই সন্ধিযুগের প্রধান সাহিত্যিক হলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (1800-1858)। তিনি ছিলেন কবি ও সাংবাদিক। তাঁর বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যঙ্গ কবিতা দ্বারা সমাজ ও সাহিত্যে অশ্লীলতা ও ইতরামির প্রাবল্য অনেকটা রোধ করা গিয়েছিল। তিনি গদ্যে ও পদ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের নানা দিককার সমস্যা ফুটিয়ে তুলতেন। সমাজ-ব্যবস্থা ক্ষেত্রে তিনি রক্ষণশীলতার পক্ষপাতী ছিলেন। স্থির বিচার বুদ্ধি নিয়ে তিনি সমাজজীবনে শুচিতা রক্ষার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

গদ্যের সৃষ্টি

1800 সালের কাছাকাছি বাংলা ছাপাখানা চালু হওয়ায় সাহিত্য ক্ষেত্রে যে

আমূল পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছিল তা লক্ষণীয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের শিক্ষার জন্য পাঠ্য বই রচনা ও ছাপা হল। খৃষ্টান ধর্মযাজকরাও প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করলেন। এসব থেকেই এসে গেল বাংলা গদ্যের যুগ। গদ্য লেখকদের অগ্রণী হলেন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার (?—1819) ও রেভাঃ উইলিয়ম কেরী (1761-1834)। রামমোহন রায় দর্শনশাস্ত্রে, সাময়িক বিষয়ে, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারে ও বিতর্কমূলক রচনায় সর্বপ্রথম সাধারণ্যে প্রচারের জন্য নবজাত বাংলা গদ্য ব্যবহার করেন। রামমোহন তাঁর বাংলা সাপ্তাহিক "সংবাদ কৌমুদীর" মাধ্যমে এবং বেদান্ত ও কয়েকটি বিশিষ্ট উপনিষদের অনুবাদ ও পুস্তিকা প্রণয়ন দ্বারা বাংলা গদ্যের কাঠামোটি আধুনিক কালের উপযোগী করে ঢালাই করবার কাজে প্রথম অগ্রসর হন। সাহিত্য ও সমাজ ক্ষেত্রে রামমোহনের প্রভাব অগ্রণী ছিল ; সেই থেকেই বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও সাধারণ জ্ঞানে কয়েকজন লেখক ও সংবাদপত্রসেবী গদ্য পুস্তক রচনা আরম্ভ করেন। এঁদের মধ্যে প্রধান অক্ষয় কুমার দত্ত এবং "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"। কিন্তু বাংলা গদ্যের আদর্শ রূপায়নের কৃতিত্ব অবশ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য (1820-91)। তিনি লেখ্য-ভাষার উদ্ভাবন করলেন (কথ্য ভাষার স্থানে)। ব্যকরণগত সুসামঞ্জস্য ও সুচ্ছন্দ শব্দ-বিন্যাস বাক্যের গঠন প্রণালীতে প্রবর্তিত হল। যদিও বিদ্যাসাগরের অধিকাংশ রচনাতেই সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য দেখা যায়, তার মধ্যে কিন্তু কোনো মুনসীয়ানা বা অস্পষ্টতা নেই। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা বহু বিষয় নিয়ে—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই হতে শুরু করে শেক্সপীয়র ও বিশিষ্ট সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত গল্প পর্যন্ত। তাঁরই অনুসরণ করে অনেক লেখকের আবির্ভাব হল যাঁরা পাঠ্য বই, সুকল্পিত গল্প ও ইংরেজী থেকে অনূদিত বা সঙ্কলিত রচনা প্রকাশ করতে লাগলেন।

এর পাশাপাশি আর একটা ব্যাপার ঘটল—সেটা হল রচনায় বাংলা কথ্য-ভাষার ব্যবহার। প্রধানত দু'জন লেখক তা করেন। একজন হলেন প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি খাঁটি "নব্যদের" ক্রিয়কলাপ নিয়ে সুচিত্রিত ব্যঙ্গ রচনা "আলালের ঘরের দুলাল" প্রণয়ন করেন। আর একজন হলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। কলকাতার আধুনিক আভিজাত সমাজের চারিত্রিক কলুষ উন্মেষ করে তাঁর ব্যঙ্গ রচনা হল "হুতুম পেঁচার নক্সা"। প্রথম দিকের কথ্য-ভাষার লেখকরা তাঁদের রচনাভঙ্গী বেশিদূর অগ্রসর করেন নি ; তখনকার অন্যান্য লেখকরাও সে পথে যান নি।

নতুন পদ্য রচনা

1860 সালে শুধু রাজনীতি ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও উন্নয়নের যুগ শুরু হল। এক নতুন লেখক গোষ্ঠীর ভিতর স্বাদেশিকতার উদ্দীপনা দেখা যেতে লাগল। এঁরা কলেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা করে ও পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম ঐতিহ্যের সংস্পর্শে এসেছিলেন।

ইংরেজী সাহিত্য ও ইয়োরোপের মানবিকতাবাদের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য কিছু সংখ্যক মেধাবী যুবকদের ভিতর প্রবল উদ্দীপনা এনেছিল। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (1824-73)। মধুসূদন খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সনাতন হিন্দুধর্মের নিগড় থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। কিন্তু তাঁকে ফিরে আসতে হল বঙ্গদেশে, বাংলা ভাষার সাধনায়—ঘরপালানো ছেলের আবার ঘরে ফিরে আসবার মতো। মধুসূদন বাংলা কবিতায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করেন। ইংরেজী এলিজাবেথান নাটকের ভঙ্গীতে প্রথম আধুনিক নাটক রচনা তাঁর দ্বারাই হয়েছিল। মধুসূদনের সুবিদিত কাব্য হল "মেঘনাদ বধ কাব্য"। এটি একটি সংক্ষিপ্ত মহাকাব্য এবং রামায়ণের একটি কাহিনী থেকে নেওয়া। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিলটন, কৃত্তিবাস ও বাল্মীকির তেজোগর্ভ কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পশ্চিমের নব-মানবিকতাবাদের প্রভাবও যে তাঁর উপর পড়েছিল তা-ও সন্দেহাতীত। এটা প্রমাণ হয় তাঁর রাক্ষসদের চরিত্রাঙ্কনে দরদী মনোভাবের ভিতর দিয়ে। মাইকেলের রচনাশৈলীর মহানতা ও গাম্ভীর্য বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত প্রাণ-শক্তির পরিচয় দেয়। তিনি বাংলাভাষায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতারও প্রবর্তন করেন। এই বিদেশী রচনা পদ্ধতি তাঁর প্রদীপ্ত দেশপ্রেমের স্পর্শে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্র-পূর্ব যুগে মধুসূদনই ছিলেন আধুনিক বঙ্গভাষার শ্রেষ্ঠ কবি।

মধুসূদনের সমসাময়িক হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (1838-1914) ও নবীনচন্দ্র সেন (1846-1909) মধুসূদনের রীতিতে বর্নিত আখ্যানমূলক মহাকাব্য রচনার অনুসরণ করেন। এঁদের রচনা সুস্পষ্টভাবে দেশপ্রেমে রঞ্জিত। "মেঘনাদ বধ"-র মতো হেমচন্দ্রের "বৃত্র সংহার" একটি পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে লেখা। নবীন চন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" অল্পকিছুকাল পূর্বের ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করেছে। এই কাব্য তিনটিতেই বিজয়ী নায়করা ভিনদেশী আক্রমণকারী এবং কবি-গ্রন্থকারদের সহানুভূতি আক্রান্তদের দিকেই। আক্রান্তরা তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বীরত্বের সঙ্গে তাঁদের দেশ ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। হেমচন্দ্র প্রভৃত স্বদেশ-প্রেমের সঙ্গে লোকগীতি ও কাব্যগাথা রচনা করেছিলেন, ভারতবাসীদের জেগে উঠতে, স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে আবেগপূর্ণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। নবীনচন্দ্র মহাভারতের উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁর কাব্য-ত্রয়ীতে কৃষ্ণকে সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক সম্মিলিত ভারতের উদ্গাতা বলে চিত্রিত করেছেন।

এই বিশিষ্ট কবিরা মহাকাব্য সৃষ্টির অনুরাগী ছিলেন এবং পাশ্চাত্যের কবিতা-রচনা পদ্ধতির অনুকরণ করতেন। এর সঙ্গে সঙ্গে এক আবেগ উচ্ছল গীতিরচনার নতুন ধারা বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতায় প্রকাশ পায়। এই কবিতা বৈষ্ণবগীতি গাথা থেকে জীবনীশক্তি আহরণ করে সৌন্দর্যের এক ধ্যানমূর্তি জীবনের আঙ্গিনায় আকুলভাবে খুঁজে ফিরত। বিহারীলালের দরদী কবিতা পুরানো নিগড় থেকে মুক্ত আর তাতে ছিল সীমার মাঝে অসীমের নিবিড় আহ্বান। এই কাব্য-শৈলী ক্রমে

ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিসৌধ, কলিকাতা

শ্যামলী—শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবাসগৃহ
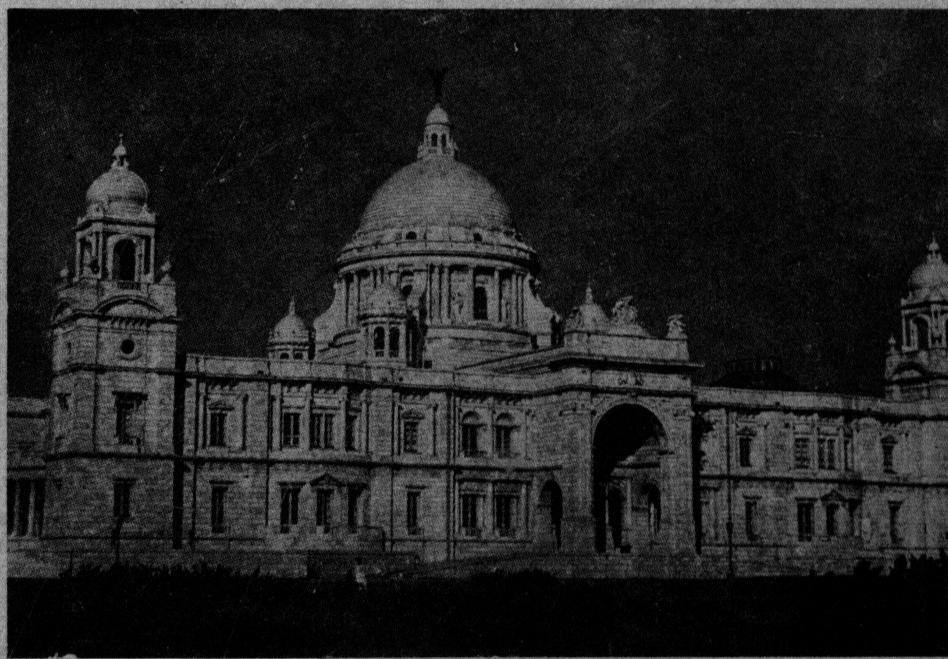
থামের উপর নর্তকীর চিত্র

বহু গীতিকবিতাকার অনুসরণ করে চলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অক্ষয় কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ উদারভাবে স্বীকার করেছেন বিহারী লালের কাছ থেকে তাঁর অনুপ্রেরণা পাবার কথা। বিহারীলালের গীতি কবিতা "সারদা মঙ্গলে" সারদা হলেন প্রকৃতির প্রাণ-রস, সৌন্দর্যের ভাবমূর্তি—মানুষের আনন্দমেলায় যে ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে যায় কিন্তু কখনো তার কালাতীত পরিপূর্ণতায় ধরা দেয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র

পদ্যসাহিত্যের পরবর্তী সাধারণ অগ্রগতির কথা বলার আগে গদ্য-সাহিত্যের দ্রুত উন্নতির কথা বলা দরকার। অনেক লেখকেরই আবির্ভাব হল, তাঁরা পাঠ্যবই অথবা সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা দেশাত্মবোধক বই সর্বসাধারণের পাঠের জন্য লিখতে শুরু করলেন। যে-সব উপন্যাস লিখিত হল, তা দেশপ্রেম সঞ্চারক, কিন্তু আধুনিক উপন্যাসের মূল যে চরিত্র-চিত্রণ, তা তাতে থাকতনা। যিনি ভারতীয় সাহিত্যে প্রথম আধুনিক উপন্যাস উপস্থিত করেন তিনি হলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (1834-94)। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে বাংলা সাহিত্যের শিরোমণি ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু ঔপন্যাসিকই ছিলেন না। কবিতা ও নাটক বাদ দিয়ে—কবিতা লেখা তিনি ছেলেবেলায় কিছু চেষ্টাচরিত্র করবার পর ছেড়ে দেন—সাহিত্যের আর কোনো বিভাগই ছিলনা যেখানে তাঁর ছোঁয়া পড়েনি এবং কৃতিত্ব প্রকাশ পায়নি। ঔপন্যাসিক, দার্শনিক, সমাজ-বিজ্ঞানী, দেশপ্রেমী ও আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আমাদের সাংস্কৃতিক নবজন্মের প্রতীক। তাঁর উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তু মোটামুটি চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—ইতিহাসভিত্তিক কল্পনা, প্রেমঘটিত সঙ্ঘাত, সমাজ সংস্কার ও দেশপ্রেম। উপন্যাস ছাড়া তাঁর অন্যান্য রচনার বিষয়বস্তু অনুরূপ তিনটি মোটামুটি শ্রেণীতে ফেলা যায়—হাস্য ও ব্যঙ্গকৌতুক, সাহিত্য-বিজ্ঞান ও সামাজিক সমস্যা, দর্শন ও ধর্ম। উপন্যাসের প্রথম শ্রেণীটি ছাড়া তাঁর অন্য সব লেখা অতি সুগভীর উদ্দেশ্যমূলক। এ সবের মধ্যে আছে ভারত ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতির ভিতর যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাদের একটা যুক্তিযুক্ত সমন্বয়। আর আছে, আত্মনিবেদনের ভাবে ভাবিত হয়ে দেশাত্মবোধক কর্মপ্রচেষ্টা। বঙ্কিমের উপন্যাসের বেশিরভাগই নীতিশিক্ষামূলক। উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাগণ চিত্রিত হয়েছেন অত্যুজ্জ্বল জীবন্তভাবে। তাঁরা সফল বা বিফল হয়েছেন তাঁদের চারিত্রিক গুণাগুণে। তিনি মধ্যযুগীয় রাজা ও শাসকদের সেকালীন সম্রাটের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধকে তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু করেছিলেন। এরূপ করেছিলেন বঙ্কিমের অনেক সমসাময়িক বা পরবর্তী লেখকরাও। খুবই বোঝা যায়, বঙ্কিম এমনিভাবে পাঠকের চিত্তকে বৃটিশের অধীনতা থেকে মুক্তির সংগ্রামে প্রেরণা দিতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলিতে ব্যঙ্গ ও যুক্তি—এ দু'য়েরই আশ্রয় নিয়েছিলেন, যাতে করে বিশিষ্ট

জনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা ভারতীয়তা বোধ জন্মে। ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক বইতে তিনি কোঁত, মিল, বেনথামের প্রত্যক্ষবাদ ("পজিটিভ হিউমেনিজম") সূক্ষ্মভাবে বিচার করবার পর নিজেকে আস্তিক মানবিকতাবাদের সমর্থক বলে ঘোষণা করেন। এই মতে, দেশবাসীর সেবাই ভগবানের শ্রেষ্ঠ সেবা বলে গণ্য হয়—যদি তাতে নিষ্কাম কর্মের মনোভাব থাকে, অর্থাৎ পুরস্কারের আকাঙ্খা না করে কাজ করা যায়। বঙ্কিম হিন্দুধর্মের মূল সমাজব্যবস্থার প্রতি শ্রদ্ধা রাখতেন কিন্তু সাম্যবাদী সমাজের পক্ষপাতী ছিলেন—যে সমাজে বংশগতির চেয়ে নিজস্বগুণ প্রাধান্য পায়। লেখক হিসাবে এবং প্রভাবশালী মাসিকপত্র "বঙ্গদর্শনের" প্রবীণ সম্পাদক হিসাবে তিনি সে সময়ে শীর্ষস্থানে ছিলেন এবং উন্নতিশীল বাংলা-সাহিত্যরাজ্যে রাজার মত বিরাজ করতেন। তিনি প্রবীণ বুদ্ধিজীবী এবং ভারতের বিশিষ্ট অর্থনৈতিক ইতিহাসপ্রণেতা রমেশচন্দ্র দত্তকে বাংলা ভাষায় ইতিহাস ও সমাজ-বিষয়ক উপন্যাস লিখতে প্রবুদ্ধ করেন। রাজপুত ও মারাঠা ইতিহাসের পটভূমিতে লেখা রমেশ দত্তের উপন্যাসগুলি দেশপ্রেমে ভরা, কিন্তু তিনি নির্ভুল, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও সাম্প্রদায়িক নিরপেক্ষতা রক্ষা করে গিয়েছেন। তিনি যে দুখানা সামাজিক উপন্যাস লিখে গেছেন তা বিস্ময়করভাবে বাস্তবধর্মী, তাঁর ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা ও সহুরে জীবন-যাত্রার কথা বিবেচনা করলে তা একটু আশ্চর্যজনকও।

বঙ্কিম যুগ

বঙ্কিমচন্দ্রের পর বহু ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপন্যাসকারের অভ্যুদয় হয়। তাঁদের মধ্যে একটি কল্পনাবিলাসী দল ভদ্র গ্রাম-জীবনের সৌন্দর্য ও সৌষ্ঠব নিয়ে চিত্র এঁকেছিলেন, আর একদল,—যাঁরা ছিলেন আদর্শবাদী—দুঃখক্লিষ্ট মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীজীবনের বর্ণনা করেছিলেন। শিক্ষিত সমাজকে আধুনিকতার সাজে সাজানোর চেষ্টা থেকে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা আঁকা হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের বড় বোন স্বর্ণকুমারীদেবীর রচনায় (1857-1932)।

বঙ্কিমচন্দ্রের মার্জিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং স্বাদেশিকতার মূল নীতি শিক্ষিত বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের ভাব-ভাবনায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর মতবাদের কিছুটা শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লববাদতত্ত্বে প্রতিভাত হয়। বঙ্কিমের মহান গীত "বন্দেমাতরম" 1905 সালের বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে জয়ধ্বনির কাজ করে এসেছে। কিন্তু একথা অবশ্য বলতে হবে যে তাঁর "ধর্মতত্ত্ব" ও "গীতাভাষ্য"-এ এবং "কৃষ্ণচরিত্র" অঙ্কনে ভারতের বিকাশমান সংস্কৃতিতে খানিকটা হিঁদুয়ানীর রং ফলানো হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্কিমের "গীতাভাষ্য" তেজোদীপ্ত সমাজনীতির পরিবেশক ছিল। তাঁর "কৃষ্ণচরিত্রের" শ্রীকৃষ্ণ একজন আদর্শ মানব, কিন্তু ভগবানের অবতার নন। অনেকে মনে করতে পারেন, বহু পূর্বে রামমোহনের নেতৃত্বে সার্বিক মানবিকতাবাদের

উপর ভিত্তি করে যে যৌগিক স্বাদেশিকতা গড়ে উঠেছিল তা বঙ্কিমের এ ধরণের মতবাদে ব্যাহত হবে।

রাজনারায়ণ বসু (1826—99), শিবনাথ শাস্ত্রী (1847—1919), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (1840—1926) ইত্যাদি সহযোগীদেব সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম সমাজের সংগঠন ও কর্মসূচিতে রামমোহন রায়ের মতধারা অবশ্য বয়েই চলছিল। প্রথমোক্ত দু'জন উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের সাংস্কৃতিক অবস্থার স্মরণীয় বিবরণ রেখে গেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ভারতের অধিবিদ্যা বা "মেটাফিজিক্স" সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যামূলক নিবন্ধ লিখেছেন। এগুলির তুলনা আজও মেলে না। তিনি "স্বপ্ন প্রয়াণ" নামে সুবৃহৎ বিশিষ্ট কাব্য রচনাও রেখে গেছেন।

বঙ্কিম যুগে দেশাত্মবোধক রচনার একটা বিশেষ প্রাচুর্য দেখা দেয়। হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণের অনুবাদ করার কাজও বড় রকম করে নেওয়া হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ ও মহতাব চন্দ্র নামে দু'জন বিশিষ্ট জমিদার বিভিন্ন পণ্ডিত মণ্ডলীকে দিয়ে মহাভারতের দু'টি স্বতন্ত্র আক্ষরিক গদ্যানুবাদ করিয়েছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ বসু অনেকগুলি শাস্ত্র ও পুরাণের অনুবাদ সম্পাদন করিয়ে সস্তা দামে প্রকাশ করেন। রমেশচন্দ্র দত্ত সমগ্র ঋগবেদের অনুবাদ কবেছিলেন। নতুন ও পুরানো যুগের ইতিহাস রচনায়ও মনোযোগ পড়েছিল। রজনী কান্ত গুপ্তই বোধহয় প্রথম ভারতীয় যিনি 1857 সালের বিদ্রোহ-যুদ্ধের ইতিহাস লেখেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ছিলেন একজন বিশিষ্ট লেখক এবং ভারত-তত্ত্ব (ইণ্ডোলজী) বিষয়ে গবেষক ছিলেন। সংবাদপত্র সেবারও খুব তোড়জোড় ছিল। "বঙ্গবাসী" "হিতবাদী" "সঞ্জীবনী" ও "বসুমতী" নামের সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলি প্রথাগত ও প্রগতিমূলক দৃষ্টি নিয়ে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করত। ঠাকুর পরিবার কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "ভারতী" সাহিত্যে একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসে। এই দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাশীলদের ভিতর আস্তে আস্তে গড়ে উঠেছিল। তাঁরা চেয়েছিলেন, বাঙ্গালীয়ানা নয়, ভারতীয়তা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের নয়, ভারতীয়তার মানদণ্ডে বিচার ও গ্রহণ। রামমোহন রায়ের ঐতিহ্য পুনর্জীবিত ও আরো দূর-প্রসারী হল এবং খোলাখুলি ভাবে সাহিত্যের আসরে হিন্দু জাতীয়তা ও ভারতীয় জাতীয়তায় সংঘর্ষের কথা আলোচিত হতে লাগল। সমাজ কল্যাণে সাহিত্য নিযুক্ত থাকবে—বঙ্কিমের এই শিক্ষা লেখক সম্প্রদায়ে বহুলাংশেই গৃহীত হতে লাগল। কিন্তু প্রশ্ন রইল—সমাজ কল্যাণ কিসে হয়? এই তত্ত্বমূলক কৌতূহল যে ক্রমে ক্রমে তীব্রতর হয়ে উঠছিল, তা এ যুগের সাহিত্য রচনায় ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"উত্থিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরাণ নিবোধত" ধ্বনির যুগে আবির্ভাব হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (1861—1941)। বর্তমান জগতে তিনি শুধু একজন প্রথম শ্রেণীর কবিই ছিলেন না, গদ্য সাহিত্যেও তাঁর বৃহদাকার রচনা সম্ভার তাঁর বিস্ময়কর

বহু বিস্তারী প্রতিভার পরিচয় দেয়। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, ছোটগল্প লেখক, সাহিত্য-সমালোচক, নাট্যকার, দেশপ্রেমী, জাতীয়তাবাদী, বিশ্বপ্রেমিক, মানবকতাবাদী, বিশ্বজনীন ধর্মের উদ্গাতা, শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপ্লবী, এবং সমাজনীতিবাদের পুরোহিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রধানত গীতি-কবিতা; কিন্তু তা শুধু ভাব ও ভাবপ্রবণতার অন্তর্মুখী পবিক্রিয়ায়ই শেষ হয়নি, পারিপার্শ্বিক বিশাল জগতের চিন্তা ও কর্মধারার বিভিন্ন পর্যায়েও সমানভাবে সাড়া দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম 1905 সালের বঙ্গ-বিচ্ছেদে গভীরভাবে উদ্দীপ্ত হয় এবং তা প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁর দেশ ও দেশবাসীর প্রতি প্রেম-নিস্যন্দী গানে ও কবিতায়। তাঁর জাতীয়তাবাদে ভারত ও বিশ্বমানব একই সূত্রে গাঁথা। পাশ্চাত্যের স্বার্থসন্ধী উৎকট জাতীয়তাবাদের পুরোপুরি বিরোধী। ভবিষ্যত ভারত-সমাজের চিত্র তাঁর দৃষ্টিতে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থা যা যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, চিরাচরিত বিধির উপর নয়, যা ধর্মকে মাথায় রাখবে, আর জীবনের স্তরে স্তরে অগণিত সাধনায় লিপ্ত হবে ভারতের ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য। বিচিত্র ধর্মের, বিচিত্র মানবক্ষেত্রের এই ভারত; তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ দেখতে পেয়েছিলেন একটা বিবর্তন যা আধারে আলোকে, পতনে অভ্যুদয়ে গড়ে তুলেছে এক প্রোজ্জ্বল ভাবমূর্তি। যখন ভারতের জাতীয় আন্দোলন আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সবকিছু বর্জন করতে শুরু করল, তখন রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করলেন, জগতের প্রগতির আলো হাওয়া থেকে ভারত যেন নিজকে বঞ্চিত না করে।

মানুষে, প্রকৃতিতে, আর মানুষে মানুষে অন্তর্নিহিত মিল ও অচ্ছেদ্য মিলন সূত্রের এত গান কোনো কবিই রবীন্দ্রনাথের মতো গেয়ে যাননি। সাড়ে ছয় দশক ধরে ধাপে ধাপে তাঁর সাহিত্য-সেবার নব নব বিকাশ, দূর থেকে সুদূরের হাতছানি। কবি ভূমার উদ্দেশ্যে মানুষের জয়যাত্রার অবিরাম পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন এবং প্রতি সুখে, প্রতি দুঃখে, প্রতি ভোগে সেই জীবন দেবতার প্রকাশ দেখতে পেতেন— যিনি অন্তরতর, মানুষের সমস্ত চেতনা, প্রেরণা যাঁর সুগভীর পরশে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ অহিংসা নীতিতে এবং অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মহত্তম প্রতিবাদ হিসাবে আত্মাহুতি দেবার বৈপ্লবিক সার্থকতায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

কবির রচিত গানের সংখ্যা প্রায় 2,500—এগুলির অধিকাংশেই তিনি স্বয়ং সুর যোজনা করেছেন। ঐগুলি মোটামুটি এভাবে ভাগ করা যায়:— (1) অতীন্দ্রিয়বাদী ও মরমী কবিতা, (2) প্রকৃতির সান্নিধ্য, (3) নাট্য-কবিতা, (4) দেশপ্রেমাত্মক কবিতা, (5) বিশ্বজনীনতা, (6) প্রেম ও আকুতি, (7) জীবনবেদ, (8) মানুষের নিয়তি। প্রথম ভাগের কিছু কিছু কবিতার স্বকৃত ইংরেজী অনুবাদ নিয়ে "গীতাঞ্জলি" রচনার জন্য 1913 সালে তিনি নোবেল প্রাইজ পান। এর দ্বারা কবির আন্তর্জাতিক বিশ্রুতি মেলে অতীন্দ্রিয়বাদী কবি হিসেবে। ঔপনিষাদিক, বৈষ্ণববাদী ও সহজিয়া ভক্তিতত্ত্ব কবির ধর্মজীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল ঠিকই, তবু মানবিকতাবাদের কবি হিসাবেই তাঁর স্থান শীর্ষদেশে রয়ে গেছে। তাঁর কবিতাগুলি

নতুন থেকে নতুনতর রচনা পদ্ধতি বিস্ময়কর ভাবে গ্রহণ করেছে। চলতি প্রথা থেকে অমিত্রাক্ষর ছন্দের ও ছন্দমুক্ত নতুন নতুন ধাঁচের রচনা শৈলীতে চলে এসেছে। বিচিত্র রচনা শৈলী অনুপ্রাসযুক্ত, ধ্বনি সঙ্গতি সমৃদ্ধ, অতিমাত্রায় সংস্কৃত ঘেষা ভাষা থেকে লোকগীতির সহজ সরল শব্দ বিন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই পরিবর্তনে শব্দ ও অর্থের সংহতিতে কোনো ব্যতিক্রম ঘটত না। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বাংলা ভাষার সুরবিন্যাস শক্তির দক্ষতা অনুপম ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনার সাহিত্যিক উৎকর্ষ তাঁর পদ্য রচনার মতোই গরিষ্ঠ। তিনি বক্তব্য বিষয়ের অতি সূক্ষ্ম তাৎপর্য প্রকাশ করবার জন্য নতুন নতুন শব্দের উদ্ভাবনা করে বাংলার ভাষা-কোষ সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গদ্য রচনায় যে—মাধুর্য ও মূর্ছনার প্রবর্তন করেছিলেন তা তাঁর আগে বা পরে কেউ করেন নি। নিবন্ধে ও বক্তৃতামালায় তাঁর প্রযুক্ত যুক্তি ছিল তীক্ষ্ণ ; রসে রঙ্গে ভরপুর। জ্ঞানবিচার ও শুভ বুদ্ধির দোহাই দেবার রীতি সর্বদাই মার্জিত। এই গুণগুলি তাঁর প্রথম দিকের রচনায় শুদ্ধ ভাষায় ও শেষ দিকের রচনায় কথ্য ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। কথ্যভাষা তিনি রচনায় ব্যবহার করতে শুরু করেন বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির অন্তরে নিবিড় ঘাত প্রতিঘাতে উত্থিত ভাব-ভাবনার অতি মনোহর খেলা দর্শিত হয়েছে। বিশিষ্ট উপন্যাস "গোরা" (1910) ছাড়া তাঁর আর সমস্ত উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাস্তব নরনারীর জগতের উঁচু স্তরের বাঙ্গালী সমাজের। "গোরা" উপন্যাসে প্রকৃত ভারতীয় জাতীয়তা সম্বন্ধে কবির মতামত অতি উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। বিশ্বকবি ছোট গল্পের রাজা ; তিনিই বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ছোট গল্প রচনা প্রবর্তন করেন। এই ছোট গল্প রচনাই বর্তমান বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে একটি প্রধান স্থান নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গ, বিয়োগান্ত নাটক, রূপক ও গীতিনাট্যের কোঠায় পড়ে। প্রত্যেকটিরই একটি একটি নিজস্ব মাধুর্য ও বৈভব আছে। বিশেষ করে, তাঁর রূপক নাটকগুলিতে পাশ্চাত্যের যান্ত্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তীক্ষ্ণভাবে নিন্দা করা হয়েছে— মানুষের আত্মা সেখানে যন্ত্রপীড়িত।

শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর দীপ্ত প্রতিভায় ভাস্বর, তখন উদিত হলেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র (1876—1938)। শরৎচন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে পদক্ষেপ করেই পাঠকদের মন কেড়ে নিলেন। তাঁর রচনার ধরন ধারন রবীন্দ্র-ধর্মী। শরৎচন্দ্র যে সব বিষয় নিয়ে লিখতেন তা রবীন্দ্রনাথ পূর্বে তাঁর ছোট গল্পের বিষয়বস্তু করেছিলেন। গ্রাম্যজীবনের বদ্ধ অলি-গলির কলুষতা, বিশেষ করে হিন্দু সমাজে নারী জাতির উপর নির্মম নিষ্ঠুর আচরণ, এসব ছিল গল্পের উপাদান। তিনি বাস্তব সমাজজীবনকে তাঁর লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন। সামাজিক বাস্তবতাবাদের প্রথম ঔপন্যাসিক তিনিই। যে গ্রাম-জীবনকে তিনি চিত্রিত করেছেন তা তাঁর সুপরিচিত

বিংশ শতাব্দীর। শরৎচন্দ্র নির্ভুল বাস্তব ও দরদী রচনা শক্তির জন্য তাঁর সময়ে ও পরে এতটা জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন।

সংস্কারী দলের যুগ

শরৎচন্দ্রের প্রধান প্রধান উপন্যাসগুলি নারীর পথবিচ্যুতি ও তাঁদের পুনর্বাসনের নৈরাশ্যময় প্রয়াস নিয়ে লেখা। ঐ সময়ে দেখা দিয়েছিল একদল ঔপন্যাসিক, কবি ও সংবাদপত্র সেবী,—যাঁদের নিপুণ লক্ষ্য-বস্তু ছিল শ্রমজীবী সম্প্রদায়, বেকার ও ভ্রষ্টাচারীদের শোচনীয় জীবন, আর পোষাকী জীবন ও বাস্তবে অসামঞ্জস্য। বিচার বুদ্ধিমতো এ লেখকরা স্বাধীনতার গণ-আন্দোলনে সহানুভূতিপূর্ণ ছিলেন। এই আন্দোলন বিপ্লব ঘেষা হয়ে আসছিল 1921 সালে শুরু হবার পরে। নবীনরা সমাজের এবং প্রাসঙ্গিক সব কিছুর আমূল পরিবর্তন চেয়েছিলেন। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম (1899--1976) সাহিত্য ক্ষেত্রে সমুন্নতশির। তাঁর দৃঢ় দাবি ছিল গতানুগতিক আচার বিচারের নিগড থেকে মানুষের মুক্তি। বিপ্লবের ডাকে সাড়া দেবার জন্য যুবকদের প্রতি ছিল তাঁর জ্বালাময়ী আহ্বান। জীবনানন্দ দাশ (1899—1953) বাংলার "মুখ দেখলেন" এবং দেশবাসীর জীবনে এমন একটা কিছু দেখলেন যা তাঁর তাপিত প্রাণে শান্তি নিয়ে এল, "পৃথিবীর রূপ" আর খুঁজতে গেলেন না। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্ন্যাল, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, মনোজ বসু ইত্যাদি তাঁদের উপন্যাসে ও গল্পে নিপীড়িত মানবের গান গেয়ে গেয়ে নবযুগের আগমণী ঘোষণা করলেন। তাঁরা যে ম্যাক্সিম গোর্কীর সমাজতন্ত্রী মানবিকতাবাদ, মারক্সীয় যুক্তিবাদ ও ফ্রয়েডিয়ান মনস্তত্ত্ব দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাঁরা খাঁটি ঘরমুখো ছিলেন। বাস্তববাদ ও স্বভাবজাত স্নেহ-মমতা অতি সুনিপুণভাবে মিলেছে বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (1894—1950) প্রসিদ্ধ উপন্যাস "পথের পাঁচালীতে"। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় (1908--56) অর্থনৈতিক অব্যবস্থায় শৃঙ্খলিত সমাজে মানুষের জীবন যাত্রা চিত্রিত করেছেন, শবব্যবচ্ছেদকারীর কঠোরতা নিয়ে।

এ যুগের প্রধান ঔপন্যাসিক কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (1899—1971)। তাঁর উপন্যাসে ও ছোটগল্পে তিনি বাস্তবভঙ্গী ও সহানুভূতি নিয়ে অভিজাত জমিদার শ্রেণী ও আদিম সমাজ ব্যবস্থার ক্রম অবক্ষয় চিত্রিত করে গেছেন। এ সঙ্গে তাঁর নিজের জেলা বীরভূমে গ্রাম্য জনগণের ভিতর যে পরিবর্তন ও জাগরণ এসেছিল, তার কথাও আছে। তারাশঙ্করের তিন স্তবকের উপন্যাস "গণদেবতার" জন্য তাঁকে 1968 সালে জাতীয় সম্মান হিসেবে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার দেওয়া হয়। তারাশঙ্কর তাঁর সমাজ চেতনা ও বিভিন্ন স্তরের গ্রাম্য লোকদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার জন্য সমকালীন লেখকদের ভিতর অদ্বিতীয়।

নতুন আন্দোলন

এই যুগের কবিতা ছিল অন্তঃদর্শী। ব্যক্তির সঙ্গে দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তব জীবন মানিয়ে চলার বেদনা এসব কবিতার বিষয়বস্তু ছিল। এটা প্রকট হয়েছে দু'জন প্রবীণ বিশিষ্ট কবি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (1901-60) এবং বিষ্ণু দে-র (জন্ম 1909) কবিতায়। সমসাময়িক একজন অগ্রনী কবি হিসেবে বিষ্ণু দে-র বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়েছে তাঁর 1971 সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ায়। জসিমুদ্দিন (জন্ম 1903) তাঁর জন্মস্থান পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) গ্রাম্য-লোকদের জীবন নিয়ে লেখা কবিতার নিপুণ শিল্পী। বুদ্ধদেব বসু উপন্যাস ও কাব্যরচনায় স্বকীয় বৈদগ্ধ প্রকট করেছেন।

1940 সাল থেকে বাংলা সাহিত্যের উপর নানা ঘটনার ভীষণ প্রতিক্রিয়া চলছে। সেগুলি হল—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা, 1943 সালের বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ, 1946 সালের বাঙ্গলার হত্যালীলা, আর 1947 সালে বাঙ্গলার ভাগ। গতানুগতিকস্থিত সমাজব্যবস্থার অবসান হল এবং তারই ফল স্বরূপ মানুষের যে চরম দুর্গতি দেখা দিয়েছিল তাতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নতুন বা পুরানো আদর্শের আর মান্যতা রইল না। বিগত কয়েকদশকে যে নব-আদর্শ আস্তে ও স্থির শৃঙ্খলার সঙ্গে মূর্ত হয়েছিল তার সঙ্গে আপোষে আসবার নৈরাশ্য বেদনা সাহিত্যে রূপ নিয়েছিল। যুদ্ধোত্তর কালের আবহাওয়ার পরিচয় পাওয়া যায় বিমল মিত্র, সন্তোষ কুমার ঘোষ, সমরেশ বসু এবং অন্যান্যদের উপন্যাসে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় (জন্ম 1919) মনীন্দ্র রায় ও অন্যান্যদের কবিতায় সমাজতন্ত্রবাদের ঝোঁক দেখা যায়, কিন্তু এঁরা চান চিন্তার স্বাধীনতা। সাহিত্যক্ষেত্রে সৃজনধর্মী কাজের অভূতপূর্ব প্রসার ঘটেছে, তার সঙ্গে এসেছে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুরূপ বিস্তৃত অনুশীলন। পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশন ক্ষেত্রে উদ্যোগও লক্ষ্যনীয়। অব্যবহিত পূর্ববর্তীদের প্রাণঘাতী নৈরাশ্য থেকে মুক্ত লেখকগোষ্ঠীর আবির্ভাব হয়েছে।

নাটক ও নাট্যশালা

যাত্রা

মুসলমানদের আগমনের পূর্বে বঙ্গদেশের নিজস্ব কোন নাট্যশৈলী ছিল কিনা তা জানা নেই। শ্রীচৈতন্যের পরে একটি লোকরঞ্জক শিল্পকলার পত্তন হয়। এর নাম "যাত্রা" (অনুষ্ঠান), বিষয়বস্তু ছিল কথায় ও গানে শ্রীকৃষ্ণ জীবনের কোনো ঘটনা নাট্যাকারে বিবৃত করা। মঞ্চ আসবাবপত্রহীন ও উন্মুক্ত। শ্রোতৃবর্গ মশালের সুবিন্যস্ত আলোয় চারিদিক ঘিরে বসত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক নাট্যকলার প্রভাবে যাত্রার এই ব্যবস্থার ক্রম-পরিবর্তন হয়। পৌরাণিক কাহিনী থেকে যাত্রার বিষয়বস্তু নেওয়া হতে লাগল, সাজপোষাক প্রবর্তিত হল, ধর্ম ও নীতিমূলক

কথোপকথনের চেয়ে ঘটনা বা অঙ্গমুদ্রা বেশি দেখা গেল, মেয়েদের চরিত্র পুরুষরা অভিনয় করতে লাগলেন। মেয়েপোষাকে ছেলের দলের বা "সখীর" দলের নাচগান যাত্রার একটা অপরিহার্য অঙ্গ ছিল। তেমনি ছিল ঐক্যতান বাদন্—ইয়োরোপীয় হাওয়াযন্ত্রের সঙ্গে ঢোল বাজনা। সর্বাঙ্গীন নাটকের ছাপ অবশ্য বজায় থাকত। কলকাতায় আধুনিক থিয়েটারের হিল্লোল আসবার আগে সহরে গ্রামে যাত্রাই ছিল সাধারণের একমাত্র নাট্যাভিনয়। যুগ-সন্ধিকালে সংস্কৃতির যে দুস্থ অবস্থা ঘটেছিল, এতে তাই ধরা পড়ত। গ্রামাঞ্চলের ঐতিহ্য হতে সম্পূর্ণ আলাদা একটা মার্জিত পৌরসংস্কৃতি কলকাতায় যখন গড়ে উঠল এবং আধুনিক থিয়েটার নগরে চালু হল তখন যাত্রা পিছনে পড়ে রইল। কিন্তু সেটা সহরেই। মফস্বলে এর কদর বেড়েই চলল। সেখানে যাত্রা আগের মতোই লোকরঞ্জনের কাজ ও চিরাচরিত ধর্মনীতির প্রচার করতে লাগল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব যাত্রাতেও এসে গেল। জনগণের ভিতর রাজনৈতিক চেতনার প্রসারও হতে লাগল যাত্রার মাধ্যমে।

স্বাধীনতার পর থেকে নতুন পরিবেশন-শৈলী অবলম্বন করে যাত্রা কলকাতায় ও সহরাঞ্চলে আবার আসর জমিয়েছে। মেয়েদের ভূমিকায় পুরুষের স্থানে এখন মেয়েরাই অভিনয় করে, শ্রোতৃবর্গ রঙ্গমঞ্চের চারদিকে না বসে এখন সামনে বসেন, নাটকের বিষয়বস্তু এখন পৌরাণিক কাহিনীর স্থানে আধুনিক ইতিহাস ও চলতি সমস্যা। জাতির আদর্শপুরুষ ও শহীদদের এবং লেলিন হিটলারের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের জীবনী যাত্রার বিষয়-বস্তু হিসেবে সহুরেদের প্রিয়।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চ

আধুনিক বাংলা থিয়েটারে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে কলকাতার ইংরেজ সমাজ কলকাতায় সৌখিন নাট্যাভিনয় করতেন—নিছক নিজেদের স্ফূর্তির জন্য। এর থেকেই কলকাতার ভদ্রসমাজ প্রেরণা পেলেন তার অনুকরণ করতে। ইংরেজী কায়দার রঙ্গমঞ্চে বাংলায় প্রথম নাটক অভিনয় করবার বন্দোবস্ত করলেন জেরাসিম লেবেডফ নামে জনৈক রুশ দেশীয় আগন্তুক (1795)। কিন্তু নতুন সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছায়াযুক্ত আধুনিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠানের চেষ্টা জোরদার হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের শেষ কোঠায়। কলকাতার ধনী-শিক্ষিত নাগরিকগণ তাঁদের মনোরঞ্জনের জন্য সখের থিয়েটারের পত্তন করলেন, টাকা পয়সার যোগান দিয়ে। 1857 সালে মাইকেল মধুসূদন কর্তৃক এলিজাবেথান শৈলীতে লেখা প্রথম মৌলিক নাটক অভিনীত হল। তারপর শুরু হল একের পর এক অমনি ধারা। এর ভিতরই জন্ম নিল প্রথম বাংলা স্থায়ী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ। এই রঙ্গমঞ্চ গিরিশ চন্দ্র ঘোষের (1844-1911) নির্দেশে, অভিনেতৃত্বে, পরিচালনায় ও সক্রিয় সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

1860 সাল ও পরবর্তী সময়ের স্বদেশী আবহাওয়া নাট্যকারদের বিশেষভাবে

প্রভাবান্বিত করেছিল। প্রথমত পেশাদারী থিয়েটার শুরু হল দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নিয়ে। "নীলদর্পণ" ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচার ও বর্বরোচিত শাসনে চাষীদের নিপীড়িত জীবনের আলেখ্য। দীনবন্ধুর (1828-73) অন্য প্রসিদ্ধ নাটক হল "সধবার একাদশী"। এতে আছে শিক্ষিত সমাজের বিশিষ্ট এক অংশের নৈতিক অধঃপতনের উপর ব্যঙ্গ কৌতুকের নির্মম কশাঘাত। সাধারণ নাট্যমঞ্চে স্ত্রীলোকের ভূমিকায় স্ত্রী অভিনেত্রী নেওয়া হত, তৎকালীন ইংরেজী রঙ্গমঞ্চের প্রথা মতো মঞ্চ গঠিত হত। দৃশ্যপট ও মঞ্চের সাজসজ্জার বাস্তবতার সঙ্গে মিল থাকত। নাটকগুলির বিষয়বস্তু ছিল ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, সামাজিক ও কল্পনা-ভিত্তিক। অনেকগুলিতে জাতীয়তাবাদের ও সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্য থাকত। নাটকগুলি গঠিত হত ইয়োরোপীয় ধাঁচে। ইংরেজী, এমন কি ফরাসী নাটক থেকেও বেশ কিছু সঙ্কলন থাকত। অর্থগত কারণ ও চারুকলা প্রীতি এই দু'টি উপাদানই নাট্যরচনা ও তা মঞ্চস্থ করবার প্রেরণা যোগাত। এখানে উল্লেখ-যোগ্য হল ডি. এল. (দ্বিজেন্দ্রলাল) রায়ের (1863-1913) দেশপ্রেম রঞ্জিত নাটকগুলি।

রবীন্দ্র ধারা

ইতিমধ্যে সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ঠাকুর পরিবারে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর (1849—1925) ব্যাপৃত ছিলেন অতিবিশিষ্ট ও মনোজ্ঞ সংস্কৃত নাটক এবং ফরাসী হাস্য রসাত্মক রচনার অনুবাদে। তিনি বাংলা গীতি কবিতায় শাস্ত্রীয় রাগের প্রবর্তন নিয়েও পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এটা ছিল একটি খাঁটি ভারতীয় নাট্যরীতি রচনার প্রয়াস—যাতে ইংরেজী পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথের গীতি-নাট্য "বাল্মিকী প্রতিভা" (1881) এই প্রচেষ্টার প্রথম ফল। তারপর এল "মায়ার খেলা" (1888)। প্রথম নাটকটি ঘরোয়া ভাবে ঠাকুর বাড়িতে পরিবারের তরুণ-তরুণীদের দ্বারা অভিনীত হয়। কবি নিজেই প্রধান ভূমিকায় নেমেছিলেন। এই গীতিনাট্যগুলির রচনা ও অভিনয় ইয়োরোপীয় অপেরা ও তার অভিনয় ভঙ্গী থেকে একেবারে ভিন্ন রকমের ছিল। এগুলিকে বাংলার নৃত্যনাট্য গীতিবহুল যাত্রার একটা সুমার্জিত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রূপ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর তেজোদ্দীপ্ত বিয়োগান্ত নাটক "বিসর্জনে" (1890) নির্দেশক ছিলেন ও অভিনয় করেন। "বিসর্জন" হল বাংলার নাট্যসাহিত্য ক্ষেত্রের একটি দিগদর্শক। নিগূঢ় অর্থপূর্ণ এবং পাশ্চাত্যের যন্ত্রতান্ত্রিক ও জড়বাদী সংস্কৃতির নিন্দা করে লেখা রবীন্দ্র-নাথের রূপক নাটক মালার আরম্ভ হল গদ্য-নাট্য "রাজা" (1910) দিয়ে এবং পরে এসেছে "মুক্তধারা" (1922—23) ও "রক্তকরবী" (1926)। "রাজা" নাটক পরে নতুন ছাঁচে "অরূপ রতন" নাম নেয় (1919—20)। বিশ্ব প্রকৃতি নিয়ে রচিত কবির সঙ্গীত ও কবিতার রত্ন-খচিত নাটক কয়েক ডজন হবে। এগুলি রচিত হয়েছিল বিশেষ করে তাঁর বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা

অভিনয়ের জন্য। 1926 সালে প্রকাশিত হল কবির বিশিষ্ট নৃত্য-গীতিনাট্য "নটীর পূজা" তার পর "চিত্রাঙ্গদা" (1936—37), "চণ্ডালিকা" (1937—38) ও "শ্যামা" (1939)। এই নাটকগুলি শান্তিনিকেতনের ছাত্রছাত্রীরা জনসাধারণে্য অভিনয় করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের এই নতুন পদ্ধতি প্রথমদিকে পেশাদার নাট্যসমাজ ভাল নজরে দেখেন নি। বর্তমান শতাব্দীর বিশের প্রথম কোঠায় মঞ্চশৈলীর একটা বড় রকমের সংস্কার সাধন হল—নাট্যকলায় নির্দেশক ও অভিনেতাদের এক নতুন দলের আবির্ভাবে। এই নতুন নাট্য কলা-কুশলী গোষ্ঠীর প্রধান নেতা হলেন শিশির কুমার ভাদুড়ী (1889—1959)। বাস্তববাদঘেঁষা এবং প্রয়োজন বোধে রঙ্গমঞ্চের সীমিত ক্ষেত্রে রূপক নাট্য নতুন নতুন প্রথার প্রবর্তনে এই সংস্কার আন্দোলন প্রায় এক দশক কাল প্রচুর প্রাণশক্তি দেখিয়েছিল, কিন্তু শেষকালে নিজের রীতিনীতির নিবন্ধে এবং আর্থিক দুর্দশার দুচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়ল।

নতুন নাট্যকলার প্রবর্তন

চল্লিশের দশকে বাংলার দুর্ভিক্ষ ও সমাজের দ্রুত আর্থিক অবনতির কঠিন প্রতিঘাতে নাট্যজগতে এক নতুন আলোড়ন দেখা দিল। তা শুরু করেন একদল প্রগতিবাদী তরুণ। তাঁরাই স্থাপন করলেন 'ইণ্ডিয়ান পিপল্‌স থিয়েটার এসোসিয়েসন" (1945)। এই আন্দোলন সুঠাম সমাজতন্ত্রী বাস্তবতাবাদের সঙ্গে বিপ্লবের জয়ধ্বনি মিশিয়ে দিয়েছিল। এই করে তাঁরা মৃতপ্রায় বাংলা থিয়েটারকে প্রতিযোগিতা-ক্ষেত্রে সিনেমা শিল্পের গ্রাস থেকে উদ্ধার করেছিলেন। আন্দোলনের প্রধান পুরোহিত হলেন বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভু মিত্র এবং কট্টর মার্কসীয় তত্ত্ববাদী উৎপল দত্ত। সহরে ও গ্রামে এখন থিয়েটার হয়েছে বাঙ্গালীদের একটা বিশেষ সাংস্কৃতিক কর্মোদ্যোগ। পেশাদার নাট্যবিদ ও সখের থিয়েটার দলের কেউ কেউ জনগণের বাস্তব জীবন ভিত্তি করে নতুন নতুন কলা কৌশল এবং বিষয়বস্তুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন। আর্থিক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন। বর্তমানে কলকাতায় আধডজনের উপর স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ, একটি মুক্ত প্রাঙ্গণ রঙ্গমঞ্চ এবং ডজন ডজন গুণী পেশাদার ও সখের অভিনেতার দল আছেন, যাঁরা একটি খাঁটি জাতীয় রঙ্গশালা প্রকল্পনা ও স্থাপনের কাজে লিপ্ত। এই রঙ্গশালা প্রকল্পনায় জীবনের বিভিন্ন স্তরের সদাকারের চিত্র থাকবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সৌন্দর্য উপভোগেরও রসদ যোগাবে। কলাবিদদের কাছে ও শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে রবীন্দ্র নামের নৃত্য-নাট্য ও গীতি-নাট্য তেমনই জনপ্রিয় রয়ে যাচ্ছে। নাট্যকলা ভাণ্ডারে একটি নতুন শিল্প রীতির আমদানী হয়েছে—সেটি হল মনস্তাত্ত্বিক চিত্রাঙ্কন ক্ষেত্রে বাদল সরকারের অবদান।

সিনেমা

প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র নির্মিত হয় 1900 সালে যখন হীরালাল সেন কয়েকখানি ছোট

ছোট নির্বাক চিত্র তোলেন। প্রথম পূর্ণাবয়ব কাহিনী চিত্র প্রস্তুত হয় বর্তমান শতকের কুড়ির কোঠার প্রথম দিকে। প্রস্তুত কর্তা ডি. জি. (ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী), হিমাংশু রায় ও দেবিকা রানী। এঁরা বাংলা ছবিতে সুমার্জিত ও বিজ্ঞানসম্মত প্রযোজনা-ভঙ্গীর প্রবর্তন করেন। 1930 সালের কাছাকাছি সময় যখন সবাক ছবির যুগ এল, তখন একদল বিশিষ্ট চিত্র-পরিচালকের আবির্ভাব হল। তাঁরা হলেন—প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, বিমল রায়, নীতিন বসু ইত্যাদি। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের উপরে এঁদের প্রভাব খুবই বেশি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশের বিশৃঙ্খল অবস্থা ও পণ্যদ্রব্যের অপ্রাচুর্য হেতু কলকাতায় চিত্র উৎপাদন খুবই কমে গিয়েছিল। 1947 সালের দেশভাগে বাংলার দুই তৃতীয়াংশে কলকাতার তৈরি সিনেমার প্রবেশ বন্ধ হওয়ায় এই মনোরঞ্জক দৃশ্যশিল্পের বাণিজ্যগত প্রসার অত্যন্ত হ্রাস পায়।

এই নৈরাশ্যের দিনে কয়েকজন বিশিষ্ট চিত্র নির্দেশকের আবির্ভাব হয়। এঁদের শীর্ষে আছেন সত্যজিত রায়, ঋত্বিক ঘটক, তপন সিংহ, মৃণাল সেন, অগ্রগামী ইত্যাদি যুবক। এঁরা নতুন কলাকৌশল, গভীর ঐকান্তিকতা ও নতুন সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগ করে বাংলা সিনেমায় যে পুনর্জীবন এনেছেন তা বিস্ময়কর। 1953 ও 1970 সালের মধ্যে বাংলা ছবি ভারতের শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে সতেরো বারের মধ্যে ন'বার পুরস্কার পেয়েছে। "সার্টিফিকেট অফ মেরিট পেয়েছে দশ বারের কম নয়। নতুন শিল্প-কুশলীদের প্রচেষ্টা হল বাস্তব জীবন ও জীবন-সমস্যার অবিকৃত ও সুরুচিসম্মত রূপায়ণ করা। আধুনিক বাংলা সিনেমার সাংস্কৃতিক দিকটা ব্যবসাগত লাভক্ষতির ঊর্ধে উঠেছে, কিন্তু বর্তমান কালের প্রতিচ্ছবি বলে একে সামাজিক অণুবীক্ষণ ও পরিবর্তন সাধনের যন্ত্র হিসাবে গণ্য করা যায়।

সঙ্গীত

গানে বাঙ্গালীদের প্রচুর আসক্তি। বাঙ্গালী তার অনুভূতি, আবেগ ও আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসা-উপলব্ধি গানের ভিতর দিয়ে প্রকাশ করে। মুক্ত প্রান্তর, সর্পিল নদী, তরুবীথি সমাচ্ছন্ন গ্রাম যুগ যুগ ধরে গ্রামের কবিদের অনুপ্রাণিত করে আসছে কান্না হাসির গান রচনা করতে, গাইতে। ফেলে আসা সেই বেদনাঘন দিনের গানও সে সঙ্গে তাঁরা গেয়েছেন। গেয়েছেন বাঁশী বাজিয়ে, একতারা বা দোতারায় সুরের মূর্ছনা ঢেলে এবং ঢোল বা খোলের ডমরু নিনাদে।

মুসলমান-পূর্ব যুগে রাগপ্রধান গান-বাজনার চর্চার কথা ইতিহাসে খুবই কম দেখা যায়। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে "চর্যাপদ" এবং "গীতগোবিন্দ" শাস্ত্রীয় রাগে ও ধ্রুপদ শৈলীতে গাওয়া হত। এটাও নিশ্চিত যে, বাঙ্গলার নিজস্ব কিছু কিছু রাগ কোন এক সময় উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী সঙ্গীত ভাণ্ডারে স্থান পেয়েছিল। এ গানগুলি চলত নৃত্যের সঙ্গে। কর্ণাটক সঙ্গীতের কিছু কিছু উপাদানও এসব গানে

দেখা যায়। মনে হয়, শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব শতকে বা তার কাছাকাছি সময় চণ্ডীদাসের "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" সর্বত্র গীত হত—বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় রাগে এবং ধ্রুপদ রীতিতে। এ থেকেই চৈতন্যোত্তর যুগের প্রথম ভাগে বাঙ্গালীর নিজস্ব কীর্তন প্রথার উদ্ভব হয়।

কীর্তন পদ্ধতি

কীর্তন অঙ্গ ধ্রুপদ থেকে উত্থিত কণ্ঠ-সঙ্গীতের একটি মার্জিত পদ্ধতি। বৈষ্ণবদের গীতি কবিতা বা পদাবলী শ্রীকৃষ্ণের কিশোর বয়সের ঘটনাবলী অনুযায়ী কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। গায়ক দলের নেতা কবিতার পদ ধীরে ধীরে ধ্রুপদী তালে বিশুদ্ধ রাগে গান করেন। চরণের তাৎপর্যটি ব্যাখ্যা করে বলা হয় "আঁখের"-এর মাধ্যমে। গানের রেশ বা ধুয়োটি দলের অন্যান্য গায়করা আবৃত্তি করেন দ্রুত থেকে দ্রুততর লয়ে যতক্ষণে না সম্মিলিত কণ্ঠের গান দ্রুততম চরমে পৌঁছে। মূল-গায়ক তখন পরের একটি পদ শুরু করেন। এমনি করে একটির পর একটি চলে যতক্ষণ না কথিকাটি শেষ হয়। তানপুরা এবং পাখোয়াজের পরিবর্তিত রূপ খোল সঙ্গতের জন্য ব্যবহার করা হয়। ইদানীং হারমোনিয়ম এবং বেহালাও কখনো কখনো কাজে লাগান হয়। কীর্তনের বিশিষ্ট হল সমবেত সঙ্গীত এবং মোগল-পূর্ব যুগের জটিল ধ্রুপদী তালের ব্যবহারে। কালক্রমে কীর্তনের চারটি নিজস্ব লৌকিক পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে—মনোহর সাহি, গরাণ হাটি, মন্দারিনী ও রেনেটি ঘরানা। প্রত্যেকটির কিছু কিছু শাস্ত্রীয় পদ্ধতি ভিত্তিক নিজস্ব প্রকাশ-ভঙ্গী আছে। কীর্তনে একাধারে বাণী ও প্রকাশ-ভঙ্গীর সামঞ্জস্য বর্তমান।

বিষ্ণুপুরী ঘরানা

পূর্বেই বলা হয়েছে, চর্যাপদ শাস্ত্রীয় রাগে গাওয়া হত। মোগল সম্রাটদের যুগে উত্তর ভারতের বিশিষ্ট সঙ্গীত বিশারদগণ সুরের যে বাঁধা গৎ তৈরী করেছিলেন তার থেকে চর্যাপদের রাগের গঠন পৃথক ছিল। দিল্লীর বাদশাদের দরবার বিশেষ করে রাগপ্রধান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। মহামতি আকবরের সভাকবি মিঁয়া তানসেন ধ্রুপদে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি তখন উত্তর ভারতের সঙ্গীত সমাজের শিরোমণি। অবশ্য, আমীর খসরু প্রবর্তিত খেয়াল অঙ্গের স্থানও কম ছিল না। মোগলদের কর্তৃত্ব কমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে তানসেনের সাকরেদ ও তাঁদের বংশধররা দিল্লী থেকে চলে আসতে শুরু করলেন। বাংলার সামন্ত রাজারা এঁদের অনেককেই সমাদরে স্থান দিয়েছিলেন। কেউ কেউ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পূর্বাঞ্চলেও চলে এসেছিলেন। বাহাদুর খাঁ নামে তানসেনের একজন ধ্রুপদীয়া বংশধর বিষ্ণুপুরের (বর্তমানে বাঁকুড়া জেলায়) সামন্ত রাজার রাজ-পরিষদে যোগ দিয়েছিলেন। বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরী ঘরানা নামে খ্যাত এক সঙ্গীত-গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা। বহু প্রবীন সঙ্গীত বিশারদের শিক্ষাস্থান এই ঘরানায়। এঁদের অনেকেই

রাগানুগ সঙ্গীতবিলাসী ধনী জমিদারগণ পরিপালন করতেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এইসব পৃষ্ঠপোষকদের ভিতর প্রধান ছিল ঠাকুর পরিবারের বিভিন্ন শাখা ; বিশেষ করে, সৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুর নিজেই ছিলেন একজন সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ। প্রধানত তাঁর এবং তাঁর ভাই যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের চেষ্টাতেই কলকাতা হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। তাঁদেরই চেষ্টায় বাংলার সঙ্গীতের আসরে বিষ্ণুপুরী ঘরানা সম্মানের স্থান পেয়েছিল। এই ঘরানার অন্য কয়েকজন বিদগ্ধ সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতিপালন করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর। এঁদের কাজ দেওয়া হয়েছিল পারিবারিক সঙ্গীত শিক্ষক হিসাবে। ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিতে ধ্রুপদের ভাবগম্ভীর সুর-সংযোগ করাও এঁদের কাজ ছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে ও কিশোর বয়সে তাঁর বাড়িতেই এই সব সঙ্গীতবিশারদরা অবস্থান করতেন। এঁরা গীতিকার রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়কর জীবনের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

টপ্পা নামে একটু হাল্কা ধরনের সঙ্গীতও উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে বিশেষ চলিত ছিল। পূর্ব শতাব্দীতে রামনিধি গুপ্ত বা নিধু বাবু প্রথমত এর চলন করেন। নিধুবাবু প্রথমত মানবিক প্রেম নিয়ে অনেক প্রসিদ্ধ বাংলা গান রচনা করে গেছেন। অল্পকালের মধ্যেই গানগুলি অভিজাত সমাজে একটা ফ্যাশানের মতো হয়ে পড়েছিল। ক্রমে ক্রমে এর ধরন ধারনগুলি বিভিন্ন রকমের জনপ্রিয় সঙ্গীতের সঙ্গে মিশে যায়—যেমন ভক্তিমূলক গানে, যাত্রা গানে এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য গীতিকারদের গানে।

ঠুংরি প্রথা আসে পরে। এর চলন করেন অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলী খাঁ। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে কলকাতায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। ঠুংরি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সবচেয়ে হাল্কা পদ্ধতি। জনপ্রিয় হতে এর বেশ সময় লেগেছিল। এই জনপ্রিয়তা আসে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে—কাজী নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদ সেন এই সুরে অতি মধুর বাংলা প্রেম সঙ্গীত রচনা করবার পর।

লোকগীতি

বাংলা লোকগীতির অমিত বৈভব অবশ্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব থেকে বিশেষ-ভাবে মুক্ত ছিল। এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ সেন ও তাঁর শিষ্যদের টপ্পা ও লোকগীতি মিশ্রিত শাক্ত পদাবলীগুলি ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। লোকগীতিকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়—বাউল, ভাটিয়ালী ও সারি। বাউল গানগুলি বাউলদের রচনা। বাউলরা হলেন ভগবৎ-প্রেম-মাতোয়ারা ভ্রাম্যমাণ সহজিয়া সম্প্রদায়ের লোক। বাউলরা তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতির আরাধনার মধ্য দিয়ে পেতে চান তাঁদের প্রিয়কে—যিনি আবৃত আছেন মানুষের অন্তরের গভীরে—আত্মকেন্দ্রিক কামনা বাসনার অন্ধকারে নিহিত জীবনের চলার পথে ক্ষণিকের ইঙ্গিত জানিয়ে জানিয়ে। এই বাউলগণ সাধারণত নিরক্ষর, কিন্তু তাঁরা ভাবাবেশে গীত রচনা করেন, ভক্তিরসে

আপন ভুলে গানে গানে নৃত্য করেন। সুতরাং গানের সুর-সংযোগ সরল হতেই হয়। উদারায় মুদারায় মূল সুরটির আভাস পাওয়া যায়। স্বর সঞ্চালন দ্রুত ও হাল্কা।

ভাটিয়ালী হল বিস্তৃত নদীবেলা আর ধু ধু প্রান্তরের গান। টানা টানা ধীর বিলম্বিত সুর, সাধারণত দয়িতের ব্যাকুলতায় মরমী। সারি বিশেষ করে মাঝি মাল্লাদের গান। পানসি নৌকা যখন নদীতে চলতে থাকে তখন দাঁড়ের দ্রুতলয়ে ওঠা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণত সমবেত ভাবে, মহোৎসাহে গীত হয়। ভাটিয়ালী ও সারি গানের সুর—গঠন ধারা সহজ, সরল।

রবীন্দ্র গীতিশৈলী

বৈদিক ভাবধারার পুনরুজ্জীবন করতে গিয়ে রামমোহন রায়ের সময় থেকে ব্রাহ্ম সমাজই তাদের সমবেত উপাসনা গীতিতে ধ্রুপদ রীতির প্রযোজনা করেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গীতি রচনার ভিতরই কেবলমাত্র সকল রকম রীতির সমাবেশ ঘটেছে—রাগপ্রধান হিন্দুস্থানী, দেশজ ও ইয়োরোপীয়। আর, তাতে যুক্ত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব পদ্ধতি যা সমস্ত বেঁচে থাকা পুরানো পদ্ধতির সুসমাবেশ। বিষয়বস্তু হিসাবে তাঁর গীতিমালা, যার সংখ্যা প্রায় 2,500, পাঁচটি মোটামুটি শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা—(1) পূজা গীতি (2) প্রেমগীতি (3) প্রকৃতি সম্বন্ধে গীতি (4) দেশপ্রেম গীতি আর (5) বিবিধ গীতি। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গান ধ্রুপদী পদ্ধতিতে গাঁথা। এগুলি চার স্তবকে রচিত (প্রথম স্তবকে গীতির মূল কথাটি থাকে) এবং প্রযুক্ত সুরে গীত হয়। এই সুরের প্রযুক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বয়ং কবির দান। গানগুলির সুর সুষমায় নতুন কিছু যোগ করা বিধেয় নয়। প্রতিটি গানই আবার একটি সম্পূর্ণ গীতি কবিতা।

কবির পূজা গীতিতেত বিশেষ ভাবে ধ্রুপদ ও বাউল পদ্ধতি নেওয়া হয়েছে। প্রেম সঙ্গীতগুলিতে রদবদল করা সুকল্পিত টপ্পা রীতির প্রাধান্য। কবির অনেক দেশপ্রেমের গান বাউল ধরনে রচিত—যেমন, "আমার সোনার বাংলা" গানটি—যা বাংলাদেশ তার জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করেছে। দেশপ্রেমের কিছু কিছু গান সরল টপ্পায়, আবার কিছু কিছু যেমন—ভারতের জাতীয় সঙ্গীত "জনগণ মন অধিনায়ক"—ধ্রুপদী ভিত্তিক এবং সমবেত সঙ্গীতের উপযোগী করে রচিত। প্রকৃতি বিষয়ক গানেই অবশ্য রচয়িতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার চরম উন্মেষ হয়েছে। তিনি বনেদী রাগগুলিকে গীতি-কবিতার সূক্ষ্ম ভাব মাধুরী প্রকাশ করবার জন্য নিপুণভাবে মিশিয়ে নিয়েছেন। এরূপে কবি বিভিন্ন ছন্দে লোকগীতির সঙ্গে রাগের সুষম মিলন ঘটিয়েছিলেন। বিশেষ করে তাঁর বসন্ত ঋতুর গানগুলিতে কবি প্রকৃতির পুনর্জীবনের পালার একটা মনোময় মূর্তি সৃজন করেছিলেন। এ ধরনের গীতি-কবিতার বেশির ভাগই রচিত হয়েছিল সঙ্গীত ও নৃত্যের জন্য।

অন্যান্য রচয়িতা

সংক্ষেপে বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতকলাকে শিক্ষিতদের বৈঠকখানা ও নিভৃত

কক্ষের অবরোধ থেকে জনগণের চিত্ত-বিনোদনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসেন। সমসাময়িক প্রতিভাবান কবিদের ভিতর আছেন নাট্যকার, কবি ও সঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ইনি অনেকগুলি সুমধুর ভক্তিগীতি, প্রেমসঙ্গীত ও প্রাণ মাতানো দেশপ্রেমের গান রচনা করেন। শেষোক্তগুলি ইয়োরোপীয় সমবেত গানের পদ্ধতিতে গীত হয়। সঙ্গীতের নতুন নতুন রূপায়ণ ও পরীক্ষা নিরীক্ষার সময় আবির্ভাব ঘটল অতুল প্রসাদ সেনের (1871-1936)। ইনি প্রেম, ভক্তি ও দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন এবং বাংলা গানে প্রবর্তন করেন লক্ষ্ণৌ ঘরানার ঠুংরি শৈলীর। পরবর্তী প্রজন্মের গীতিকার কবি নজরুল ইসলাম বাংলা গানে গজল ধারার আমদানি করেন তাঁর স্মরণীয় প্রেম গীতিগুলির মধ্যে, আর আনেন তেজোদীপ্ত রণ-সঙ্গীত তাঁর বিপ্লব-গীতিতে। ত্রিশের দশকের মধ্যে রাগপ্রধান সঙ্গীত ও বাংলা সঙ্গীত ধনী ভদ্র সমাজের গণ্ডী থেকে জনসাধারণে প্রবেশ করল। সঙ্গীত সভা বসতে লাগল, ভারতের নানা স্থানের খ্যাতনামা পেশাদার শিল্পীদের আসর জমতে শুরু করল। ক্রমে এগুলি কলকাতার সাংস্কৃতিক মহলের একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। অনেক সঙ্গীতকলাকার বাংলা গানের রূপ ও রীতির রকমারি এবং বিশিষ্ট পরিবর্তন সাধন করে যাচ্ছেন। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতি পুরাতন ও পরিবর্তিত আকারে গীত হচ্ছে। তৃতীয় চতুর্থ দশকে এই পরিবর্তন প্রচেষ্টা বাংলা গানের "আধুনিক" পর্যায়ের অবতারণা করল। সৃষ্ট হল রাগপ্রধান গীতি, লোকগীতি ও পাশ্চাত্যের "পপ" ও "বিট" মিলিয়ে একটা বিভ্রান্তিকর গোল পাকানো জিনিষ। এর অনেকটাই ঠুনকো, কিন্তু কোনো কোনোটা রসের দিক থেকে তৃপ্তিদায়ক। কিন্তু মূল কথাটা এই যে, যুগ ধর্মের রূপায়ণের জন্য উপযুক্ত সুর সঙ্গীত সৃষ্টির প্রচেষ্টা এখনো চলছে—যেমনটা চলছে সাহিত্য ক্ষেত্রে। তবুও বলতে হবে, আগের যুগের বিদগ্ধ সঙ্গীতকলাকারগণ আজও অধিকতর লোকপ্রিয় হয়ে আছেন।

যন্ত্র-সঙ্গীত

যন্ত্রসঙ্গীত ক্ষেত্রে বঙ্গদেশ সেতার, সরোদ ও এসরাজ বাজিয়ে অনেক গুণীর জন্ম দিয়েছে। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে তাঁরই শিক্ষায় রাগপ্রধান গানের রূপায়ণে বাঁশরী বাজনাকে সঙ্গীতকলা বিদ্যার শীর্ষ শ্রেণীতে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রসঙ্গীত চর্চায় গিটারের প্রয়োজন খুব, তেমনি প্রয়োজন ভায়লিন-চেলো প্রভৃতি অন্যান্য পশ্চিমদেশী যন্ত্রের। প্রায় আট দশক পূর্বে কলকাতায় উদ্ভাবিত সুবহ "বকস" হারমোনিয়াম যন্ত্রের আদর এখন সর্বত্র—যদিও গোঁড়া রাগপ্রধান সঙ্গীতজ্ঞরা একে নেকনজরে দেখেন না। ঐক্যতান বাদনের জন্য বেহালা, 'ক্লারিওনেট' ও 'করনেটে'র ব্যবহার খুব। কোনো কোনো যাযাবর গ্রাম্য গায়করা বেহালায়ও সঙ্গত দেন। বাউলরা একতারা, দোতারা, বাঁয়া ও নূপুর ব্যবহার করেন। শুভ কাজে ধনীরা সাধারণত সানাই ও নাকাড়া যোগে নহবতের বাজনা চান। দুর্গাপূজার মতো প্রধান প্রধান সর্বজনীন উৎসবে ব্যবহৃত হয়

জয়ঢাক ও বাঁশী এগুলির বাজনা চলে নানা ছন্দে, নানা তালে। খোল ও করতাল হল কীর্তন গানের নিয়ত সঙ্গী।

নৃত্য

প্রাচীন বঙ্গে নৃত্য একটা বেশ জনপ্রিয় আমোদ প্রমোদের সামিল ছিল। বীরাঙ্গনা ও মন্দির সেবিকাদের (দেবদাসী) ভরত প্রণীত নাট্যশাস্ত্র অনুযায়ী নৃত্যকলায় পারদর্শিনী হতে হত। নিচু জাতীয় নট ও ডোমনীরা (ডোম জাতীয়া স্ত্রীলোক) নাচ ও গান তাঁদের বংশগত পেশা হিসেবে চর্চা করতেন। সাধারণ উৎসবে আনন্দে ও অন্যান্য সময় তাঁদের নৃত্য হত। মধ্যযুগে সম্ভবত দেবদাসী প্রথা অপ্রচলিত হয়ে পড়েছিল এবং নাচ শুধু বারাঙ্গনাদের ভিতরই আবদ্ধ ছিল। ফলে, ভদ্র সমাজে নাচকে ঘৃণার চোখে দেখা হত। বাঈজি বা পেশাদার নাচওয়ালীদের ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধনীলোকরা পৃষ্ঠপোষকতা করতেন একটা পোষাকী ব্যসন হিসেবে। ঐ বাঈজিদের স্থান ছিল সমাজের বাইরে, আর নাচকে মনে করা হত চরিত্রহীনতার প্রকাশ। সভ্য সমাজে প্রকাশ্য নাচ একান্ত নিষিদ্ধ ছিল।

লোক নৃত্য

লোক নৃত্য অবশ্য প্রসারলাভ করতে লাগল। মালভূমি-প্রান্তের অধিবাসী সাঁওতালদের সমবেত নৃত্যের একটা নিজস্ব ধারা আছে। এই নাচের সঙ্গে থাকে গান, বাঁশী ও মাদল (ছোট ঢোলক)। জীবনের উচ্ছলতা প্রকাশই এর উদ্দেশ্য। এই নাচ প্রাণরসে ভরপুর. আনন্দোচ্ছল, কিন্তু অমার্জিত ও অশ্লীল মোটেই নয়। উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ ও বিহারের সিংহভূম জেলার ছৌ নাচের মত পুরুলিয়া জেলার ছৌ নাচ একটা বিশিষ্ট রীতির নাচ। পুরুলিয়া পদ্ধতিতে পুরুষ নর্তকরা মুখোস পরে পুরাণ থেকে যুদ্ধের ঘটনাগুলি অভিনয় করে যায়, সঙ্গে থাকে যথাযোগ্য বাজনার যন্ত্র—বিশেষ করে ঢোলক। বীরভূম জেলার রায়বেঁশে নাচও চিরাচরিত ধাঁচের—একটু সামরিক হাবভাব আছে। রায়বেঁশেতে আছে তালে তালে লাঠি ঘুরিয়ে দ্রুত সবল পদক্ষেপ। এই নাচগুলির সুসম্বদ্ধ নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। ডোমনীদের নাচের কুৎসিত কুরুচির প্রকাশ এতে নেই। ডোমনী নাচের চলন খুবই কমে গেছে।

শান্তিনিকেতনী ধারা

নৃত্যকে চারুকলার পর্যায়ে আবার উন্নীত করে তাকে যুবকদের শিক্ষার বিষয়-সূচির অঙ্গ করবার সম্মান রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, জাতীয় সংস্কৃতি উন্নয়নের বিশিষ্ট উপায় সঙ্গীত ও চারুকলা। তিনি তাঁর বিদ্যালয় শান্তিনিকেতনে, ও পরে বিশ্বভারতীতে, এ রকম শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধের বন্দোবস্ত করেছিলেন। ভারতের প্রাচীন ও সমৃদ্ধ নৃত্যকলায় তাঁর গভীর

সাঁওতালী লোকনৃত্য

রথযাত্রা, মহেশ (হুগলী জেলা)

→

দুর্গাপূজা
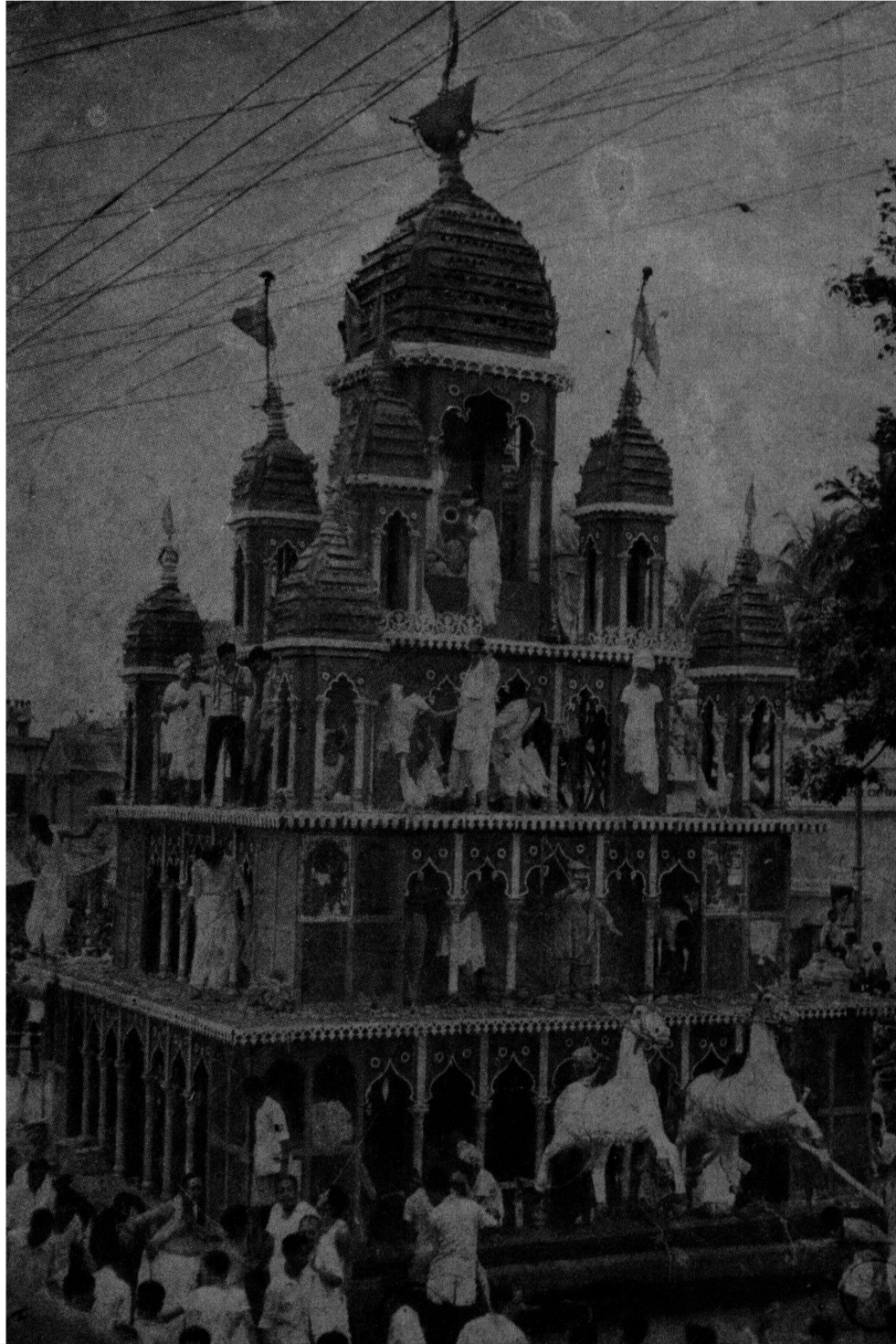
পশ্চিমবঙ্গ
নির্দেশিকা
জেলার সীমা
জাতীয় সড়ক
রেলপথ
নতুন উন্নয়ন এলাকা
বিদ্যুৎ
বন্দর
আন্তর্জাতিক সীমা
রাজ্যসীমা
সিকিম
ভুটান
নেপাল
দার্জিলিং
জলপাইগুড়ি
শিলিগুড়ি
কোচবিহার
আসাম
পঃ দিনাজপুর
মালদা
ফরাক্কা
মুর্শিদাবাদ
বীরভূম
দুর্গাপুর
আসানসোল
সাঁওতালদি
বর্দ্ধমান
নদীয়া
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
কল্যাণী
হুগলী
হাওড়া
কলকাতা
চব্বিশ পরগণা
খড়্গপুর
মেদিনীপুর
হলদিয়া
বিহার
উড়িশ্যা
বঙ্গোপসাগর
Based upon Survey of India Map with the permission of the Surveyor General of India.
© Government of India Copyright, 1980
The territorial waters of India extend into the sea to a distance of twelve nautical miles measured from the appropriate base line.
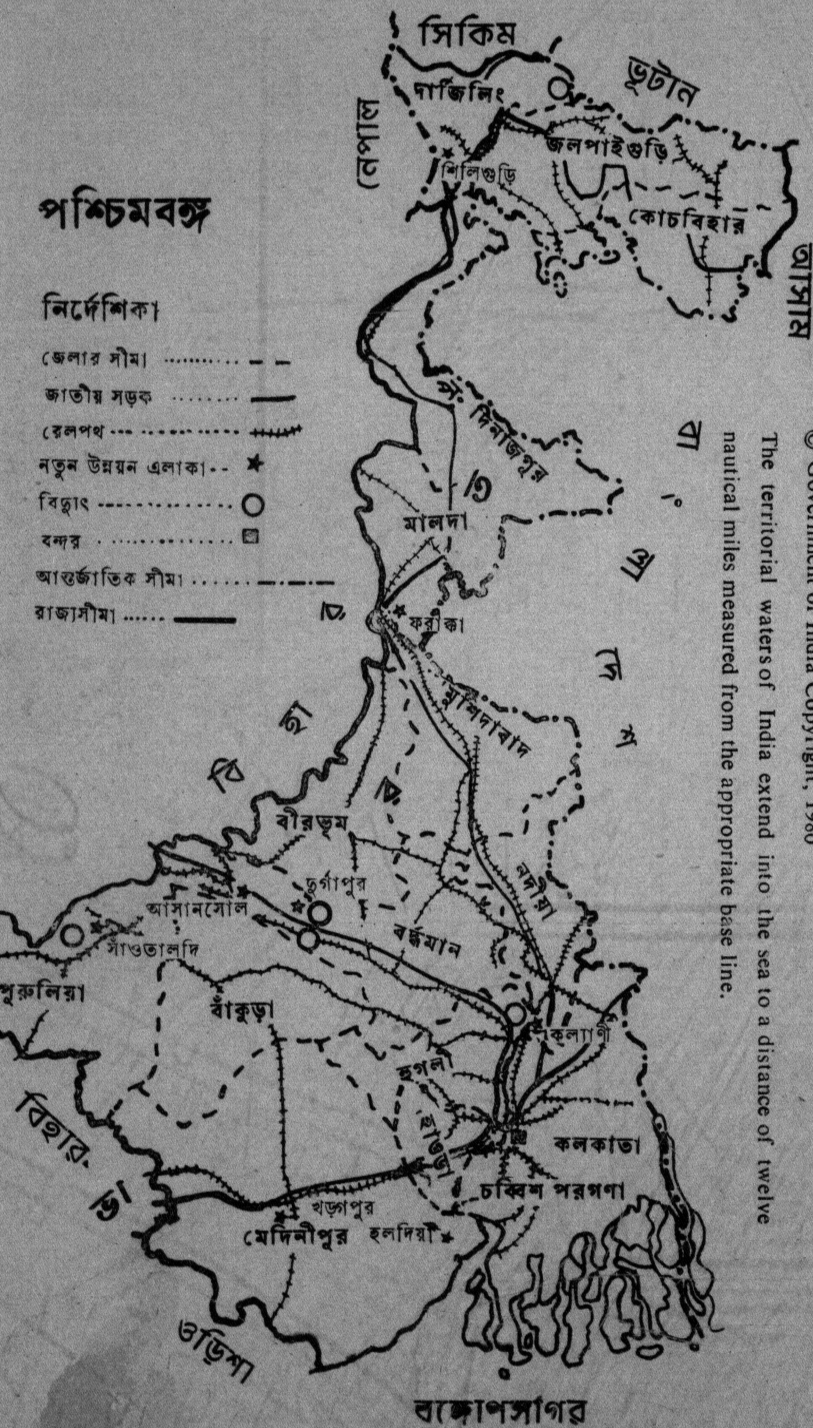
শ্রদ্ধা ছিল বটে কিন্তু তিনি মনে করতেন সেগুলি আয়ত্ত করতে জনগণের খুব বেশি নিয়মকানুন পালনের ও শিক্ষানবিশির দরকার হত। রবীন্দ্রনাথ তাই তাঁর ঋতু-গীতিমালায় নৃত্যযোজনার একটা সহজ শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করলেন। 1926 সাল নাগাদ ওই পদ্ধতিটি ভরত নাট্যম, মনিপুরী, কথক, কথাকলি এবং লোকনৃত্য শৈলী মিশ্রিত বিশিষ্ট সাবলীল নৃত্যকলায় পরিণত হল, যাতে সংশ্লিষ্ট ঋতুর গানটির মর্মার্থ ফুটে উঠত। আহরণ ক্ষমতার জন্য এই নূতন নৃত্য-শৈলীটি বাঙ্গালীর খুব প্রিয় হয়েছে এবং বর্তমানে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের ভিতর গণ্য হয়। বর্তমানে কলকাতা ও মফস্বলের সহরে সহরে বনেদী নাচের মূল সূত্রগুলি শেখাবার ব্যবস্থা সহ 'ব্যালে' ভিত্তিক নৃত্যের প্রযোজনা করে অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। উদয়শঙ্করের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ভারতীয় 'ব্যালে' নৃত্যপদ্ধতির সম্প্রসারণ। উদয়শঙ্কর নিজে ইয়োরোপীয় 'ব্যালে' নাচে সুদক্ষ। এ ক্ষেত্রে তিনি 1929 সালে আত্মপ্রকাশ করেন। পূর্ব দশকের আগে থেকেই কলকাতা তাঁর শিক্ষনোদ্যমের কেন্দ্র স্থান।

গত পঁচিশ বছরে নৃত্যকলার এই নতুন কর্মোদ্যোগ যথেষ্ট উন্নত হয়েছে—শুধু বঙ্গদেশেই নয়, ভারতের অন্যত্র এবং বাংলাদেশেও। বনেদী পদ্ধতির সঙ্গে লোকনৃত্য পদ্ধতিও যুক্ত করা হচ্ছে যাতে করে আধুনিক ব্যষ্টি ও সমষ্টির সমস্যাকে আরো ফুটিয়ে তোলা যায়। জনগণের ভিতর নতুন ও পুরাতন উভয় পদ্ধতির নৃত্যকলারই আদর বাড়ছে।

চারুকলা

হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ-বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত পোড়া-মাটির ফলক ছাড়া প্রাচীন যুগের চারুকলার নিদর্শন বড় একটা দেখা যায় না। এগুলি এবং পাথরে গড়া দেবদেবীর ছোট ছোট মূর্তি থেকে দেখা যায়, উত্তর ভারতীয় শৈলী থেকে আরম্ভ করে পাল রাজাদের যুগে উদ্ভূত বাংলা শৈলীতে এসে কীভাবে ক্রমে ক্রমে এই শিল্পের ধাঁচের পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে পাহাড়পুর ও ময়নামতী বিহারগুলির প্রাচীরের পোড়ামাটির শিল্পকাজ থেকে একটা সুসম্বদ্ধ লোককলার পরিচয় পাওয়া যায়। চিত্রকলার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর। সেগুলি পুঁথির পাণ্ডুলিপি অলংকৃত বা চিত্রিত করবার জন্য তালপাতায় নয়তো একরকম কাগজে অঙ্কিত। কারুশিল্পের দিক থেকে তাতে উল্লেখনীয় কিছু নেই। বোধহয় মধ্যযুগেও এমনধারা চলেছিল, যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে রেখাঙ্কনে কিছুটা অদলবদল দেখা দিয়েছিল।

লোক চিত্রকলা

উনবিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগরণের বিশেষ কোনো প্রভাব চারুকলা শিল্পে পড়েনি। ওই কলাকৃতি তখন আবদ্ধ ছিল গ্রাম্য ও বংশগত প্রথার দ্বারা চালিত

শিল্পে। মাটির তৈরী দেবদেবীর মূর্তি ছিল একই ধাঁচের, সর্বত্র একই বর্ণের, একই সাজসজ্জার। পট নামের লোক চিত্রকলার প্রধান শ্রেণী দু'টি। একটি হল, কাপড়ের উপর সাঁটা গোটানো কাগজ, যাতে চিত্রিত থাকত কাহিনী, পৌরাণিক কথা বা নীতি-কথামালা। আর এক শ্রেণী হল, এক একটি আলাদা আলাদা পাতা। আঁকা ছবিগুলি সাদাসিধে, কোনো পটভূমি থাকত না, রং লাগানো, অর্থাৎ জল-রং অনেক ক্ষেত্রেই থাকত না। তুলির কাজ ছিল সরল, সহজ, থাকে থাকে সাজানো ও সুনিপুণ। শেষের গুণ দু'টিই উনবিংশ শতাব্দীতে লোক চিত্রকলাকে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় করেছিল। বর্তমান কলকাতার সহরতলীতে অবস্থিত কালীঘাটের পট-চিত্র তুলির নৈপুণ্যে ও মূর্তির সৌষ্ঠবে বিশিষ্ট।

বাংলা শৈলী ও অবনীন্দ্রনাথ

পট-চিত্র ও মোগলীয় চিত্রাঙ্কনের যেটুকু স্থান বাংলার শিক্ষিত সমাজে ছিল তাও গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হয়ে পড়ল যখন ভারতে ফটোগ্রাফীর নতুন কলা-কৌশলের আমদানী হতে লাগল। গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের ছাত্ররা এ অবস্থাটার প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিল। এই ছাত্ররা ইংরেজ শিক্ষকদের দ্বারা ভিক্টোরিয় যুগের বাস্তবতাবাদী ও রোমাণ্টিক রীতিতে জল-রং ও তেল-রং চিত্রণে দক্ষতা লাভ করতেন। ঐ নতুন কলা-কৌশলে সৃজনীশক্তি তেমন কিছু ছিল না; ওটা ছিল ভারতেরই দৃশ্যপটে বৃটিশ অঙ্কন পদ্ধতির আরোপ। এটি ছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সংক্ষেপে চিত্রকলার অবস্থা।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, বঙ্গদেশে চিত্রকলার নব-জাগরণ দু'দিক থেকে হয়। ক্রম-বিকাশমান জাতীয়তা-চেতনা ভবিষ্যতের দিকে তাকাতো আধুনিক যুগের পটভূমিতে; আর সাংস্কৃতিক জাগরণ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফিরে তাকাত ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে। কলকাতার ঠাকুর পরিবার ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগের চিত্রকলার ঐতিহ্যে ততটাই সজাগ ছিলেন যতটা ছিলেন ওই যুগের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যে। আবার তাঁরা পাশ্চাত্যের প্রাচীন এবং নবীন সংস্কৃতিতেও সমান কৌতূহল দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (1871-1951) "বেঙ্গল স্কুল অব আর্টে"-র স্রষ্টা। এই স্কুল কলা-চর্চায় সে-ই সুরেরই প্রবর্তন করেছিল যে সুর বেজেছিল বাংলা সাহিত্য জগতে। ইয়োরোপীয় কলাকুশলী অবনীন্দ্রনাথ এমন একটি চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির অবতারণা করলেন যা ছিল একাধারে ভারতীয়, পাশ্চাত্য ও জাপানী পদ্ধতির একটা সুষম মিশ্রণ, যদিও তার একটা একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। তিনি বিষয়বস্তু হিসাবে ভারতীয় মহাকাব্য ও ইতিহাস এবং আরব্য উপন্যাস ইত্যাদির রহস্যপূর্ণ কাহিনী ব্যবহার করতেন। বাস্তবধর্মী মার্জিত আবহাওয়ায় অবনীন্দ্রনাথ এক নতুন 'রোমানটিসিজম'-এর প্রবর্তন করলেন যাতে প্রাচীন কোনো কোনো কাহিনীর ছায়া থাকত, আর যা থেকে পড়ত তাঁর শিল্পী মনের উপর কাব্যগন্ধী ছোঁয়াচ। তিনি

মোগলযুগীয় ক্ষুদ্রকায় চিত্রের আকার ও আয়তন পছন্দ করতেন এবং জল-রং এর "ওয়াশ" পদ্ধতির ব্যবহার করতেন। অবনীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি বাস্তবধর্মী— "কবিতার স্বর্ণ মুঞ্জুষা, সুবেশ, সুচিক্কন।" ব্যবহৃত রংগুলি সুষম ও বর্ণাঢ্য।

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন হিন্দু-চারুকলা শৈলীর সুদক্ষ রূপকার। তিনি কোনো বিশেষ রীতি পদ্ধতির স্তাবক ছিলেন না। বস্তুত, ভবিষ্যৎ ভারতীয় চিত্রকরদের কাছে তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান হল শিল্পীমনের স্বাধীনতা বোধ যা যুক্ত থাকবে সামগ্রিক ভারতীয়তাবোধের সাংস্কৃতিক সুর-সঙ্গমের সঙ্গে। "ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ অরিয়েন্টেল আর্ট"-এ তাঁর যে সব শিষ্য চতুষ্পার্শ্বে ছিলেন তাঁরা সকলেই ওই ভাবের ভাবুক। অবনীন্দ্রনাথের প্রবীণ শিষ্য নন্দলাল বসু (1883-1966) রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন আর্ট স্কুলের প্রধান ছিলেন। 'বেঙ্গল স্কুলে'-র অন্যান্য বিশিষ্ট কলাবিদদের মধ্যে আছেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার, কে. ভেঙ্কটাপ্পা, এ. আর. চুঘতাই, রবিশঙ্কর রাওল, মুকুল দে, মনীষী দে, রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মণিভূষণ গুপ্ত, ভি. এস. মাসোজী, এইচ. এল. দুগার, অর্ধেন্দু ব্যানার্জি ও রামকিঙ্কর। শেষোক্তজন চিত্রকলা ছেড়ে ভাস্কর্য বিদ্যার চর্চায় যোগ দিয়েছেন। এই চিত্র শিল্পীরা বাস্তবকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং তাঁদের অঙ্কন পদ্ধতিতেও নিজস্ব বৈশিষ্ট আছে— যেমন, বিনোদবিহারী ও রামকিঙ্কর তাঁদের শিল্পসৃষ্টিতে আধুনিক কলারীতি মেনে চলেছেন।

প্রসিদ্ধ বৈশিষ্ট্যবাদিগণ

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চার দশকে বেঙ্গল স্কুলই কিন্তু চিত্রকলা জগতে একচ্ছত্র ছিল না। আরো কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর ছিলেন যারা পুরোদস্তুর স্বাতন্ত্র্যবাদী। তাঁরা কোনো বিশেষ স্কুলের নন, কোনো স্কুলও তাঁরা প্রবর্তন করেন নি। অবনীন্দ্রনাথের বড় ভাই গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (1867-1938) ছিলেন একজন মস্ত ব্যঙ্গচিত্রকর, তুলির লিখনে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক, বস্তু নির্বিশেষ, রেখা-চিত্রকর। তাঁর কল্পনাধর্মী ছবিগুলিতে একটা রূপকথার আমেজ থাকত আর থাকত আলোছায়ার রহস্যপূর্ণ খেলা। রবীন্দ্রনাথ 1928 সালে জনসমাজকে হঠাৎ চমকে দিলেন তাঁর চিত্রাঙ্কন দ্বারা। এই চিত্রগুলি কোন জ্ঞাত কলাশিল্প শ্রেণীতে পড়ে না। এগুলি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের প্রকাশ ভঙ্গীতে পরিপূর্ণ এবং স্টেলা ক্রামরিশের ভাষায় "যে ভাব, যে অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না, সাহিত্যের বাইরে তারই নিঃসরণ"। কবির চিত্রাঙ্কনের প্রধান উৎস হল তাঁর অবচেতন মন, প্রধান হল গাঢ় উজ্জ্বল রংএ ডোবানো তুলি। রবীন্দ্রনাথের চিত্রে আধুনিক অভিব্যক্তিবাদ ও অতিবাস্তববাদের কিছুটা মিল আছে কিন্তু জ্ঞাতিত্ব নেই।

যামিনী রায় (1887-1971) ক্যালকাটা আর্ট স্কুলে ছাত্র হিসাবে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বেঙ্গল স্কুল পদ্ধতিতে যামিনী রায় কিছুদিন চিত্রাঙ্কন করেন। যখন চিত্রাঙ্কনে প্রবীণ হলেন, তখন তিনি লোক চিত্রকলা চর্চায় যোগ দেন। এই লোক চিত্রকলায়

তিনি একটা নতুন ভাব, নতুন সম্ভাবনার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর চিত্রণগুলি সাজানো গোছানো এবং প্রাচীন গ্রামীন চিত্রকলার ধাঁচে গড়া। তবু, এগুলিতে আছে প্রখর সক্রিয়তা ও সজীবতা—যে গুণগুলি বেঙ্গল স্কুলের পরবর্তী চিত্রকরগণের এবং সে সময়ের কেতাবী শৈলীর চিত্রকরদের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মতো যামিনী রায় চিত্রকলাকে বিশেষ কোনো পদ্ধতির নিগড থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন কিনা সে নিয়ে কোনো কোনো সমালোচকের যুক্তি বিবেচ্য বিষয়; কিন্তু অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তিনি লোক চিত্রকলা ও লোক চেতনার ভিতর একটা অভাবনীয় সৃজনী প্রেরণার সন্ধান পেয়েছিলেন, যার থেকে বিদগ্ধ সহুরে মনোভাব এতটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় চিত্রকলায় যামিনী রায়ের প্রভাব এখনো তেমন স্পষ্ট নয়, কারণ তিনি ছিলেন এ-ই সেদিনের লোক। কিন্তু নিছক কেতাবী সূত্র থেকে শুভ মুক্তির সম্ভাবনায় ভারতীয় চিত্রকলার ভবিষ্যত উজ্জ্বল।

নতুন ভাবস্রোত

এ যুগের সাহিত্যে যে সমাজচেতনা ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ পেয়েছে তা যুবক চিত্রকরদের মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, জয়নাল আবেদীন। ইনি 1943 সালের বাংলার দুর্ভিক্ষের অনেকগুলি ছোটোখাটো রেখাচিত্র এঁকেছেন। যেসব যুবক শিল্পীরা তখনকার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশেষ বিচলিত হয়েছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। কেতাবী কলা বিশারদদের রীতি পদ্ধতি থেকে এঁরা ঐ কারণে সবলে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর যুবক কলা-শিল্পীরা রেখাচিত্রাঙ্কনে, একালীন অন্যান্য ইয়োরোপীয় চিত্রকলা শৈলীতে এবং বাস্তবরূপবাদ ও অতিবাস্তববাদ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। যুগের হালচাল অনুযায়ী নতুন নতুন ছাঁচ সংগ্রহের প্রচুর চেষ্টা চলছে। ব্যবসায়িক ও প্রচার-চিত্র-শিল্প ক্ষেত্রে চাহিদা খুব বেড়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতিতে চিত্রকলা শিল্পের চর্চায় ক্রমে ক্রমে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

মাটির কারুকার্য

বহু শতাব্দী ধরে এঁটেল মাটি দিয়ে গড়া রং-করা দেবদেবীর মূর্তি ও প্রস্তর মূর্তি নির্মাণ একটা বড় চারুশিল্প। নির্মাতাদের পেশা বংশগত। তাঁরা চারুকলায় নতুন চেতনাবোধের প্রভাবে চলিত সুপ্রাচীন প্রথা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতীয় হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ মতো—মূর্তি গড়তে লেগেছেন, কখনো কখনো বেশ সফলও হয়েছেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীদের ভিতর একটি বৈশিষ্ট শিল্প নিদর্শন হল বাস্তব-ভঙ্গীতে বিভিন্ন কাজে রত মানুষের ছোটো ছোটো দলের ছবি মৃত্তিকায় গড়ে তোলা। এই জিনিষের খুব চাহিদা। মাটি, কাঠ ও গাছের আঁশ দিয়ে লোক-কলা পদ্ধতিতে তৈরী গ্রাম্য কারিগরদের পুতুল ও খেলনা বেশ জনপ্রিয়। বিশেষ করে, বাঁকুড়া জেলার কারিগরদের মৃৎ শিল্পজাত শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, বাইরের লোকদের কাছেও

শিল্প-নৈপুণ্যের জন্য সমাদৃত। বঙ্গদেশে আর একটা বিশিষ্ট চারুকলা হল আলপনা-চিত্রণ। এটা মেয়েরা শুভকাজে এবং ব্রত পার্বণের সময় চালের গুড়ো বা খড়ি জলে গুলে ঘর বা মন্দিরের দেয়ালে বা মেঝেতে রূপসজ্জা হিসাবে আঁকেন। আলপনায় থাকে জটিল রেখাঙ্কন। প্রথমে এর পিছনে হয়ত তান্ত্রিক প্রতীকের যোগাযোগ থাকত, কিন্তু এখন শুধু সৌন্দর্যের কাঠামোটাই আছে। শিল্পরসিক গৃহকর্ত্রীরা তুলোর লেপেও রঙ্গীন সুতো ও সূঁচ দিয়ে এরূপ রেখাঙ্কন কখনো কখনো করে থাকেন।

বোনা কাপড়ে নকশা

তাঁতে বোনা কাপড়ে কারুকাজ করা বাঙ্গলার একটা বহু পুরানো শিল্পকলা। মাকড়সার জালের মতো পাতলা মসলিন, সোনালী রংয়ের ও বিভিন্ন নকশার আঁচলসহ শাড়ি, ছিটকাপড় ও বিচিত্র রকমের সোনালী পাড় যুক্ত রেশমী কাপড় তাঁতিরা বংশগত ব্যবসা হিসেবে বুনে যেতেন। এঁরা অধিকাংশই ছিলেন মুসলীম। ঊনবিংশ শতাব্দী অবধি এই শিল্প রপ্তানী-বাজার জমিয়ে রেখেছিল। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিপীড়ন-নীতির ফলে এই শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হয়। 1906 সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে সাধারণ্যে এই কারুশিল্পের পুনরুজ্জীবন হয়। উৎকৃষ্ট তাঁতের কাপড় তৈরী বাড়াবার জন্য তাঁত বোনবার পুরানো কেন্দ্রগুলি বাঁচিয়ে তোলা হয়, কয়েকটি নতুন কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে এগুলি তৈরি হচ্ছে নদীয়া জেলার শান্তিপুরে, ফরাসডাঙ্গায় (চন্দননগর), বোলপুরের শ্রীনিকেতনে (শান্তিনিকেতনী কাপড় বলে এই কাপড় সাধারণত পরিচিত)। সুরুচিপূর্ণ ও মনোজ্ঞ নকশার জন্য সমজদারদের কাছে এদের খুব চাহিদা। মুর্শিদাবাদী রেশমের কাপড়ের চলতি বেড়ে যাচ্ছে। ঢাকা ও টাঙ্গাইলের জামদানী শাড়ি, যার কদর বহুদিনের, তাও এখন পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হচ্ছে—পূর্বে হতো বাংলাদেশে। হাতে তৈরি চমৎকার নকশার কাজও খাদি উন্নয়ন সংস্থা গুলিতে চালু করা হয়েছে।

অন্যান্য হাতের কাজের ভিতরে আছে বিচিত্র মৃন্ময় পাত্র, সাদাসিধে বা কলাইকরা পেতলের টুকিটাকি বাহারে গৃহসজ্জা, সোনা বা রূপোর তারের কারুকাজ এবং শর, বাঁশ, বেত বা ঘাসের তৈরি ঝুড়ি। আর আছে শোলার আঁশ থেকে তৈরি সাজাবার জিনিষ। এগুলি প্রধানত গ্রামীন শিল্প এবং কারিগরদের বংশগত পেশা। অধুনা চলতি এবং নতুন ধরনের কাঠের আসবাবপত্র এবং অন্যান্য গৃহস্থলীর সাজ-সরঞ্জাম তৈরির কাজ হয় সহর-নগরের জাঁকালো সংস্থাগুলিতে।

খেলাধুলা

যে সব খেলা ও ক্রীড়া কৌতুক নিয়ে জনসাধারণ অবসর বিনোদন করে তার থেকে সে দেশের সংস্কৃতির পরিচয় মেলে। বাঙ্গালীর চিরাচরিত প্রধান প্রধান খেলা হল কাবাডি, কুস্তি, লাঠি খেলা, সাঁতার, নৌকা বাইচ, তীরন্দাজি এবং লাফ প্রতিযোগিতা। ঘরে বসে সময় কাটানোর খেলার মধ্যে হল দাবা, পাশা, তাস (পর্তুগীজদের আমদানী), ছিপে মাছ ধরা—আর সঙ্গীত চর্চা তো আছেই। ইংরেজরা যখন কলকাতায় বসতি করতে শুরু করলেন তখন অবসর-সময় বিনোদনের জন্য তাঁদের জাতীয় খেলাগুলির প্রবর্তন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, টেনিস এবং ব্যাডমিনটন খেলার ক্লাব স্থাপিত হল। গৃহমধ্যে খেলার জন্য তাঁরা প্রচলন করেছিলেন বিলিয়ার্ড, স্নুকার, এবং অক্‌সান ব্রিজ ও পোকার ফ্লাশ জাতীয় তাস খেলা। এগুলি ক্রমে ক্রমে কলকাতাবাসীরা খেলতে শুরু করেন এবং শতাব্দীর শেষে বঙ্গদেশের সহরে সহরে খেলাগুলি চালু হয়।

মুক্তাঙ্গন খেলাগুলির ভিতর ফুটবল এতটা জনপ্রিয় হয়েছে যে খেলাটি জাতীয় খেলার পর্যায়ে উঠেছে। এ খেলা চলছে সহরে, গ্রামে, সর্বত্র সকলশ্রেণীর লোকের ভিতর। ক্রিকেট ও হকির জনপ্রিয়তা ফুটবলের পরেই, কিন্তু এগুলি সীমিত আছে সহরে ও সমৃদ্ধিশালী শিক্ষায়তনে। লন টেনিস বড়লোকি খেলা—যা খেলেন আয়েসী পয়সাওয়ালারা।

কলকাতার বাঙ্গালীরা 1850-এর কোঠায় ফুটবল-ক্লাব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। ফুটবল খেলা সংগঠিত ক্লাবের মাধ্যমে হতে লাগল। প্রথমদিককার ক্লাবগুলি খালি পায়ে খেলত এবং পরে ইয়োরোপীয় সামরিক ও অসামরিক দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় শীঘ্রই তাদের কৃতিত্ব স্বীকৃত হয়। 1900 সালের মধ্যেই কলকাতা ও মফস্বলে বহু সংখ্যক ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল। 1911 সালে দুর্ধর্ষ ইংরেজ টিমের সঙ্গে খেলায় জিতে মোহনবাগান ক্লাবের ভারতীয় ফুটবল খেলার রাজটিকা আই. এফ. এ. শিল্ড পাওয়া একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। এর ফলে কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের রাজধানী বলে গণ্য হল এবং সারা বাংলা ও ভারতের যুবকদের এই খেলা চর্চা করবার প্রেরণা দিল। খেলার সরঞ্জাম তেমন কিছু নয়—একটা খেলার মাঠ, দু'প্রস্থ গোল পোস্ট, আর একটা ফুটবল খালি পায়ে মারবার জন্য। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য ফুটবল ক্লাবও—কলকাতার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব – প্রসিদ্ধি পেয়েছে অনেকবার আই. এফ. এ. ও অন্যান্য সর্বভারতীয় নামকরা প্রতিযোগিতা জিতে। কলকাতার

ফুটবল খেলা কাজেকাজেই সারা ভারতবর্ষ থেকে প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের টেনে এনেছে। ত্রিশ দশক থেকে সমগ্র ভারতের সেরা খেলোয়াড়রা প্রধান প্রধান ক্লাবগুলির হয়ে খেলছেন। বাছা বাছা খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত বাংলা দল 1941 সাল থেকে ন্যাশনাল সন্তোষ প্রতিযোগিতায় 22 বারের ভিতর 14 বার জিতেছে, 22 বারই ফাইন্যালে পৌঁছেছে। প্রত্যেক জেলার নিজস্ব প্রতিযোগিতামূলক খেলা আছে। কলেজ দলগুলি থেকে বাছাই করা ইউনিভার্সিটি টিম গঠিত হয় এবং প্রতিবছরই আন্ত-কলেজ প্রতিনিধিত্বমূলক খেলা হচ্ছে। সর্বভারতের ইউনিভার্সিটি টিমগুলির মধ্যে আবার সর্বভারতীয় ইউনিভার্সিটি প্রতিযোগিতা হয়। স্কুল ফুটবলও তেমনি জেলা, প্রদেশ ও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে সংগঠিত। রেলওয়ে, কাষ্টমস্, পোর্টকমিশনার, পুলিশ ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিরও প্রত্যেকের নিজস্ব দল আছে। ফুটবলের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে গ্রীষ্মকালে ও বর্ষায় যখন এ খেলা হতে থাকে, তখন আসরে আসরে 'কানু বিনে আর গীতি নাই'। স্বীকৃত প্রতিযোগিতাগুলি কলকাতার "ইণ্ডিয়ান ফুটবল এসোসিয়েশন" দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

বঙ্গদেশে ক্রিকেট আগে এলেও জনপ্রিয় হয় পরে। ইয়োরোপীয় নাগরিকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত "ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাবে"র চেষ্টায়ই সহরের সুরম্য ইডেন গার্ডেনস-এর প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়ন হয়েছে। ওখানে সম্প্রতি 70,000 হাজার দর্শক বসতে পারে এমন একটি ক্রীড়াঙ্গন রাজ্যসরকার তৈরি করেছেন। ক্রিকেট খেলায় ভারতের স্থান এত উঁচুতে বেড়ে গিয়েছে যে ঐ ক্রীড়াঙ্গনে একলক্ষ লোক বসাবার বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব বিবেচনাধীন। কলকাতা 'টেষ্ট-ক্রিকেট' খেলার একটি নিয়মিত কেন্দ্র। রাজ্যের ক্লাব, কলেজ ও স্কুল ক্রিকেট ফুটবলেরই মত সুবিন্যস্ত। প্রাদেশিক টিমগুলি বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। "ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল" প্রাদেশিক প্রতিযোগিতাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে।

হকির যুগ আসে আরো পরে। কলকাতার অনেকগুলি ক্লাব অত্যন্ত উঁচুমানের হকি খেলেছে এবং বেশ কয়েকজন খেলোয়াড় জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সুনামের অধিকারী হয়েছে। কলকাতার বড় বড় ভারতীয় ক্লাব যখন এই খেলা তৎপরতার সঙ্গে গ্রহণ করল তখন তারা প্রদেশের বাইরে থেকেও সুদক্ষ খেলোয়াড় পেতে লাগল। এই খেলাটি ব্যাপকভাবে কলকাতায় এবং মফস্বলে কলেজে ও স্কুলে খেলা হয়। ফুটবলের ভিত্তিতে এই খেলাও নিয়ন্ত্রিত হয় "বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশন" কর্তৃক।

সমস্ত সহর কেন্দ্রেই ছেলে মেয়ে উভয়ের ভিতর ব্যাডমিনটনের খুব চলন। কলকাতার ক্লাবগুলিতে অনেক তুখোড় খেলোয়াড় আছেন যাঁরা জাতীয় প্রতিযোগিতায় দক্ষতা দেখিয়েছেন।

আগেই বলা হয়েছে, লন টেনিস হল বড়লোকি খেলা। এর কেন্দ্র কলকাতায়, মফস্বল সহরেও এর সমাদর। বঙ্গদেশে অনেক প্রসিদ্ধ খেলোয়াড় জন্মেছেন যাঁরা

জাতীয় প্রতিনিধি পর্যায়ের। কলকাতায় নিয়মিতভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়।

এই খেলাগুলির সবগুলিই অপেশাদারী। ভালো খেলোয়াড়রা অবশ্য জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য সহজেই অসামরিক কাজ পেয়ে যান যাতে তাঁরা অবসর সময়ে নিশ্চিন্তে খেলার চর্চা করতে পারেন।

কলকাতায় ইংরেজ সমাজ আর একটা প্রমোদের প্রবর্তন করেন যাতে তাঁরা একটা জুয়া খেলার আমেজ পেতে পারতেন। সেটা হল ঘোড়-দৌড়। 1819 সালে নির্মিত ক্যালকাটা রেস কোর্স প্রাচ্য-ভূখণ্ডের সুন্দরতম রেসকোর্সগুলির অন্যতম। বর্ষাকালে ও শীতকালে "দি রয়েল ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাব" ঘোড়-দৌড় প্রতি-যোগিতার ব্যবস্থা করে থাকে। তাতে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সকল শ্রেণীর ভাগ্যান্বেষী হাজার হাজার লোক যোগদান করেন। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে বড়লাট ও দেশীয় রাজাদের উপস্থিতিতে বড়দিন নববর্ষ সপ্তাহ ছিল ঘোড-দৌড মাঠের ঘোডার মালিক ও জুয়াড়িদের চূডামণিযোগ। স্বাধীনতার নূতন যুগে এর জাঁকজমক ও জনপ্রিয়তা কিন্তু কমেনি। অন্য ঘোড-দৌড়েব মাঠটি—দার্জিলিং-এর লেবং—তা আর ব্যবহার করা হয় না। এই দার্জিলিং ছিল প্রথমে বড়লাটদের এবং 1947 সালের পূর্বে ছোট লাটদের—গ্রীষ্মকালীন রাজধানী।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকেই শরীর-চর্চা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাংলার যুবক সমাজের বিজ্ঞ নেতারা শারীরিক সুস্থতা ও ক্রীড়া-নৈপুণ্যকে একটা দেশাত্ম-বোধক গুণ হিসাবে সমাদর করতেন। আত্মরক্ষার সাবেকি ও আধুনিক কৌশল-গুলি—লাঠিখেলা, কুস্তি, মুষ্টিযুদ্ধ ইত্যাদি—শেখাবার আখড়া প্রথমত কলকাতায় এবং কিছু পরে জেলায় জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়—জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে। কাবাডির মতো পুরানো এবং শারীরিক কৌশল-ভিত্তিক খেলা আবার দেখা দিয়েছে। সরকারী পর্যায়ে বহু-দফা-বিশিষ্ট ক্রীড়া চর্চার প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছে।

সাঁতারকাটা বঙ্গদেশের একটি বনেদী খেলা। বাঙ্গলার ছেলেমেয়েরা আধুনিক পদ্ধতির সাঁতারে পারদর্শিতা দেখিয়েছে এবং জাতীয় সম্মানও পেয়েছে। কলকাতার ওয়াটার পোলোর মত জলাশয়েব খেলাও প্রভূত উন্নতমান দেখিয়েছে।

মুক্তাঙ্গন খেলার ক্ষেত্রে দু'টি নতুন খেলা এসেছে—ভলি বল ও বাস্কেট বল। সহরের এবং মফস্বলে স্কুল কলেজের যুবকদের কাছে এগুলি বেশ প্রিয় হচ্ছে।

ধৈর্যশীল ও অধ্যাবসায়ী লোকদের অবসর বিনোদনের জন্য উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি নদীতে মাশির (মহাশোল) এবং সমতল ভূমির নদী ও পুকুরে অন্যান্য রুই গোত্রের মাছ শিকার একটা মস্ত মনোনিবেশের কাজ। বঙ্গদেশ মোটের উপর মৎস্য-শিকারীদের কামধেনু।

মাছধরা যদি একক মানুষের বাতিক হয়, তবে, অকসান ব্রিজখেলা আড্ডাধারী-দের পক্ষে তাই। কলকাতা ও অন্যান্য সহরে শিক্ষিতদের অনেকেই ক্লাবে বা বৈঠকখানায় তাসখেলায় প্রগাঢ় মনোনিবেশ করে বিরামকাল কাটান। শখের

প্রতিষ্ঠান দ্বারা চালিত প্রতিযোগিতামূলক খেলা নিয়মিতভাবে বসে এবং প্রবীণ খেলোয়াড়রা আন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করেন।

ঘরের মধ্যে খেলায় অপেক্ষাকৃত নতুন আমদানী খেলাটি হল টেবল টেনিস (আগের নাম ছিল পিং পং)। একটা বিশ্রামকালীন খেলা হিসেবে সত্বরে ছেলে-মেয়েদের, বিশেষত ছাত্রদের মধ্যে এটি বিশেষ প্রিয় হতে চলছে।

বিলিয়ার্ড ও স্নুকারের ভক্ত হলেন কলকাতার অভিজাত সমাজ। কোনো কোনো খেলোয়াড় এ সব খেলায় জাতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন।

কিন্তু বাঙ্গালীদের বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ ও সবচেয়ে জনপ্রিয় অবসর বিনোদনের উপায় "আড্ডা" দেওয়া। আড্ডা একটা অদ্ভুত বাতিক—যার কোনো নিয়মকানুন নেই। সমভাবের ভাবুকদের চায়ের দোকানে, ক্লাবে, চণ্ডীমণ্ডপে কিম্বা বৈঠকখানায় একত্র হওয়া আর বাজারদর থেকে শুরু করে দেশবিদেশের পরিস্থিতি পর্যন্ত বিবিধ বিষয়ে অকুণ্ঠ আলোচনা করে যাওয়া। সঙ্গে চলে চা, পান, হুঁকো আর বিড়ি সিগারেট—যখন যেটা। এ অভ্যাসটি ছেলেবুড়ো সকলেরই, কিন্তু প্রধানত পুরুষদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এসব আড্ডায় মেয়েদের যোগদান বেশ ইদানীং কালে হচ্ছে।

ফুটবল, ক্রিকেট (যা প্রধানত পুরুষদের খেলা) ও মুষ্টিযুদ্ধ (গুহাবাসীদের খেলা) ছাড়া মুক্তাঙ্গন খেলার একটা বিশিষ্টতা হল এতে মেয়েদের বেশি বেশি করে যোগদান। মেয়েরা সাঁতারে, ব্যাডমিনটনে ও ব্যায়াম ক্রীড়ায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাচ্ছেন। মেয়েদের স্কুল কলেজের অনেকগুলিতেই শরীর চর্চার এবং হকি সহ অন্যান্য খেলাধুলোর বন্দোবস্ত আছে। ফুটবল এবং ক্রিকেটও বাঙ্গালী মেয়েরা অনুশীলন করা শুরু করেছে।

লোক-উৎসব ও মেলা

বাংলায় একটা প্রবাদ আছে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। অর্থাৎ বাঙ্গালীদের কথায় কথায় পালা-পার্বণ লেগেই আছে। এগুলি চিরাচরিত বা আধুনিক, ধর্মগত বা ধর্মনিরপেক্ষ। আর, যে সব পার্বণ সর্বত্র পালিত হয়, সে সব ছাড়াও অনেক পার্বণ আছে যা পালিত হয় স্থানীয় কোন পীর বা সাধুর সম্মানার্থে।

সবচেয়ে বড় সমারোহ হল শরৎকালীন দুর্গোৎসব। আগের দিনে এই পূজা-উৎসব জমিদার বা ধনী ব্যবসায়ীদের দাক্ষিণ্যে অনুষ্ঠিত হত, আর তাতে সকল শ্রেণীর লোকই যোগ দিত। বর্তমানে চলতি প্রথা হল জনসাধারণের চাঁদায় উৎসবের ব্যবস্থা করা। পূজা শুরু হবার অনেক আগে থেকেই তোড়জোড় চলতে থাকে। মূর্তিগুলির বিন্যাস ধাপে ধাপে হয়। এগুলি গঠিত হয় বাঁশ আর খড়ের কাঠামোয় এঁটেল মাটি স্তরে স্তরে বসিয়ে। সবশেষে এতে রং দেওয়া হয় আর পরানো হয় দামী কাপড় আর সাজের গয়না। এক কাঠামোয় সাতটি মূর্তি থাকে। মাঝের মূর্তিটি হল দশভূজা দুর্গা দুর্গতিনাশিনীর। তিনি একটা সিংহের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং আধা-মহিষ আধা-অসুর হিংস্র মহিষাসুরের বুকে বসিয়ে দিচ্ছেন তাঁর এক হাতের বর্শা। প্রতি হাতেই নানারকম সাধারণ অস্ত্র আছে। দুর্গার দু'পাশে আছেন ঐশ্বর্যের দেবী লক্ষ্মী আর বিদ্যার দেবী সরস্বতী। লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা, আর সরস্বতীর বাহন হাঁস। এঁদের একটু সামনে ব্যবসাবাণিজ্যের দেবতা গণেশ ইঁদুরের উপর, আর রণদেব কার্ত্তিক সাড়ম্বরে ময়ূরের উপর উপবিষ্ট। এই চার দেবদেবী হচ্ছেন মা দুর্গার সন্তানসন্ততি। দেবী দুর্গা তাঁর স্বর্গের আবাস কৈলাস পর্বত থেকে ধরাধামে হিমালয়ে নেমে এসেছেন বাপ মায়ের সঙ্গে বাৎসরিক মিলনে। এ-মূর্তিগুলির পেছনে থাকে একটি অর্ধচন্দ্রাকার চালচিত্র যার খোপে খোপে পটে আঁকা ছবির মত দেবীর গৃহস্থালীর জিনিষপত্র এবং যাত্রা-উদ্যোগের নানা স্তরের দৃশ্য। আজকালকার অধিকাংশ মূর্তি সাবেকী ধরন থেকে আলাদা এবং এদের বাহ্যিক গঠনে প্রাচীন হিন্দু কলাশিল্পের প্রভাব দেখা যায়। পূজার সময়েই পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে লম্বা ছুটি। উৎসবের মরশুমটা সকলের মহাস্ফূর্তির সময় হলেও বিশেষ করে আনন্দের হল ছেলেমেয়েদের। তারা পায় রঙ বেরঙের নতুন পোষাক, পায় ভালো ভালো মুখরোচক খাদ্য, মিঠাই মণ্ডা তো এরমধ্যে থাকেই। আসল পূজা থাকে পাঁচ দিন। বিধিমত দেবীর বোধন শুরুর পর থেকে তিন দিন থাকে আনুষ্ঠানিক পূজা। শেষদিন মূর্তির বিসর্জন দেওয়া হয় নদী বা পুকুরে। দুর্গাপূজার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ সমারোহে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকার রেওয়াজ চলে

আসছে। সহরে গ্রামে সন্ধ্যাগুলি মুখরিত থাকে যাত্রা, থিয়েটার, গানবাজনা, নৃত্যাভিনয়, মেলা ও শারীরিক শক্তি প্রতিযোগিতায়। সকলেই এতে যোগদান করতে পারেন। পংক্তি ভোজনও হয়। পূজা সাড়ম্বরে শেষ হয় বিসর্জন (বিজয়া) অনুষ্ঠানে। মূর্তিটি সঙ্গীত ও ঢাক বাজনার সঙ্গে শোভাযাত্রা করে নদী অথবা জলাশয়ের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। বিসর্জনের পর সকলেই সকলকে সৌহার্দ্যের সঙ্গে কোলাকুলি করেন; ঘরে ঘরে আগন্তুকদের মিষ্টি পরিবশন করা হয়। কলকাতা অঞ্চলে বিভিন্ন মহল্লায় হাজার হাজার পূজার অনুষ্ঠান হয় (শুধু কলকাতা সহরেই প্রায় 2,000 পূজা)। কলকাতা তখন রূপময়ী নগরী, রাস্তায় বাজারে যেন কাতারে কাতারে মেলা বসেছে, প্রয়োজনের ও সখের জিনিষের কেনাবেচার ধুন্ধুমার কাণ্ড। হস্তশিল্পের বাজার সরগরম। বিজয়ার দিন মেলা বসে সর্বত্র।

উৎসবের মরশুম তিন সপ্তাহ জুড়ে কালীপূজা অবধি চলে। কালী কৃষ্ণবর্ণা দেবী—সৃষ্টিরক্ষাকল্পে যিনি অশুভের ধ্বংস করেন। এঁর মূর্তি হল নগ্ন স্ত্রীলোকের, চার হাত। এক হাতে খড়্গ, দু'হাতে অসুরের ছিন্নমুণ্ড, চতুর্থ হাতে বরাভয় মুদ্রা। তাঁর গলা থেকে কোমর অবধি ছিন্নমুণ্ডের মালা। দেবী তাঁর স্বামী শিবের চিৎ হয়ে শোওয়া শরীরের উপর দাঁড়িয়ে। এই পদস্থাপনের চেতনা তাঁকে ধ্বংসলীলার মাঝখানে নামিয়ে দিয়েছে, তিনি লজ্জায় জিব কেটে আছেন। কালী আদিম শক্তি-রূপিনীর প্রকাশ। এটি তান্ত্রিক মতবাদের বৈশিষ্ট রূপায়ন। বাঙ্গালী স্নেহময়ী মাতা জেনে যে দুর্গার পূজা করেন, তান্ত্রিক কালী তার বিপরীত। দেবীপূজায় সাধারণত পশুবলি হয়, শুধু বারোয়ারি পূজায় হয় না।

কালীপূজার পূর্ব রাত্রিতে আলোর উৎসব দেওয়ালি। দীপে দীপে প্রতিটি হিন্দু-গৃহ আলোকিত হয়, আর থাকে আতস বাজির খেলা। স্থানীয় যুবক সঙ্ঘগুলির ভিতর এই বাজি খেলার প্রতিযোগিতা প্রায়ই দেখা যায়। হাউই বাজির হিস্ হিস্ ও পটকার ফট্ ফট্ শব্দে সারা রাত্রি মুখরিত থাকে। উত্তর ভারতের মতো বঙ্গদেশে দেওয়ালির দিনটি ব্যবসায়ীদের নতুন বছর বা হালখাতার দিন নয়। বাঙ্গালীর ঐ পুণ্য দিনটি হল নববর্ষের দিন, পয়লা বৈশাখে। দেওয়ালি রাত্রির উৎসব অন্ধকারের দুষ্ট ভূতযোনীকে তাড়িয়ে দেবার পুরাতন প্রথারই সংস্কৃত ও সুসমৃদ্ধ রূপ। গান-বাজনার আসর যত্রতত্র, জুয়াখেলা সেদিন নির্দোষ, মন্দিরে মন্দিরে ধর্মকথা, ধর্মগ্রন্থ থেকে গানে ব্যাখ্যায় সুশ্রাব্য পাঠ। দেওয়ালির সময় থেকেই আনুষ্ঠানিকভাবে শীত ঋতুর আগমন।

শ্রীপঞ্চমী পর্ব শীতের প্রস্থান ঘোষণা করে। এই পর্ব হল হিন্দুস্থানের বসন্ত-পঞ্চমী। মাঘ মাসের কোনো তারিখে এ উৎসব হয়। ঐদিন বিদ্যাদায়িনী সরস্বতী পূজার পবিত্র দিন। ছাত্র ও কারুশিল্পীরা খুব জাঁকজমকের সঙ্গে সরস্বতীর পূজা করেন। ভক্ত পূজারিনী মেয়েরা বসন্তের সূচক জাফরানী রঙে রঞ্জিত পোষাকপত্র পরিধান করে। সন্ধ্যায় থাকে সাংস্কৃতিক আসর। তাতে গান-বাজনা তো থাকেই, আর

থাকে কবিতা আবৃত্তি নাট্যাভিনয় ও নৃত্যানুষ্ঠান। প্রধানত নিরামিষ খাওয়া হয় লুচির সঙ্গে।

বৈষ্ণব ধাঁচের কতকগুলি পর্ব জনপ্রিয় হয়েছে এবং সবশ্রেণীর হিন্দুরাই তা পালন করেন। একটি হল রথযাত্রা উৎসব। এটি পালিত হয় বর্ষা ঋতুর প্রথম অমাবস্যার পর দ্বিতীয় দিনে। জগৎ পিতা জগন্নাথরূপী বিষ্ণুর এক মূর্তি মন্দিরের আকৃতি ও চাকাযুক্ত এক কাঠের রথে বসানো হয়। এই রথ সর্বজাতির জনসাধারণ টেনে নিয়ে যান নির্ধারিত এক স্থানে। দিনটি অতি শুভ বলে গণ্য করা হয়। পূর্ব-ভারত জুড়ে বর্ষাকালীন শস্যের বীজ বোনা এদিন থেকে শুরু হয়। সহরে গ্রামে দু'স্থানেই এই পর্ব পালিত হয়ে থাকে। রথযাত্রার সময় যেসব মেলা বসে তার বৈশিষ্ট্য হল কৃষক ও মালিদের জন্য বীজ ও চারা গাছ কেনা-বেচার ধুম। কলকাতা থেকে কয়েক মাইল দূরে মাহেশে অনুষ্ঠিত এই পর্বে লাখ লাখ লোক যোগ দিয়ে থাকে।

বসন্তের প্রথম দিকের পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হোলি উৎসবে ধর্মের সঙ্গে আদিম লোক-রঞ্জনের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। বসন্তোৎসবে পুরুষ স্ত্রী উভয়েই পরস্পরকে লাল রঙে রাঙিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়। পর্বটির সঙ্গে কৃষ্ণলীলার সম্পর্ক জড়িত। শিক্ষিত মহলে এবং বৈষ্ণবদের ভিতর হোলি পর্ব একটা আধ্যাত্মিক রহস্য রসে আবৃত। বৈষ্ণবরা এ দিনটি শ্রীচৈতন্যের জন্মদিন বলে সাত্ত্বিকভাবে পালন করেন।

নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবদের পর্ব রাসপূর্ণিমা হয় শরতের শেষে, ঝুলন পূর্ণিমা ও জন্মাষ্টমী হয় মধ্য-বর্ষায়, ধূলট পূর্ণিমা শীতের শেষে। এগুলি নবদ্বীপে ও বৈষ্ণব সাধুদের আখড়া-মঠে প্রচুর ভক্ত সমাগমে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে থাকে কৃষ্ণরাধার নৌষ্ঠিক পূজা, পদ কীর্তন, সংকীর্তন (হরি, কৃষ্ণ, রাম, শ্রীচৈতন্য ও তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের সমবেত নামগান) এবং পংক্তি ভোজন।

সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রধানতম পর্ব মাঘী সংক্রান্তির দিন থেকে বীরভূম জেলার কেন্দুলিতে (কেন্দুবিল্ব) অনুষ্ঠিত হয়। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলি। বঙ্গদেশের সব স্থান থেকে সহজিয়ারা (বাউল) এখানে সপ্তাহব্যাপী উৎসবে যোগদান করেন। তাঁরা দীর্ঘকাল ধরে ভাব-আধ্যাত্মিক গানের আসর বসান, ভাব-নৃত্য করেন এবং তাঁদের নিজস্ব পদ্ধতিতে পূজায় অর্চনায় লিপ্ত থাকেন। গ্রামটি ও তার চারপাশ একটা মস্ত মেলার মাঠে পরিণত হয়। প্রয়োজনীয় ও সমদামের সুন্দর সুন্দর বহু জিনিষপত্রের কেনাবেচার সঙ্গে লোকপ্রিয় আমোদ-প্রমোদের ধুম পড়ে যায়। হোলির পরদিন এরূপ একটি ছোটখাটো মেলা কল্যানীর কাছে ঘোষ পাড়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

এ রাজ্যে গঙ্গা নদীর স্থিতি হেতু আর একটা অতিবৃহৎ পর্ব ও মেলার অনুষ্ঠান হয়। মকর সংক্রান্তির দিনে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী ভাগীরথী নদীর সাগরসঙ্গমে সাগরদ্বীপের সৈকতে সমবেত হয়ে পবিত্র গঙ্গাস্নান করেন। রাজ্য সরকার তীর্থযাত্রীদের সুখ সুবিধার জন্য একটা ছোটখাটো অস্থায়ী সহর নির্মাণ করে দেন। তীর্থকামী সর্ব-শ্রেণীর হিন্দুরা নানা জলযানে দলে দলে এখানে উপস্থিত হন। তাঁদের প্রয়োজন

মেটাবার জন্য সম্পূর্ণ একটি বাজারের পত্তন হয়। ডাক্তার ও হাসপাতালের সুবিধাও ওখানে মেলে আর হিন্দুধর্ম-প্রচারক নানা সংস্থা থেকে হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক পাঠানো হয় তীর্থযাত্রীদের সেবার্থে। মেলা যখন শেষ হয়, যাত্রীরা যখন ফিরে যান তখন জায়গাটা একটা নিঃসঙ্গ, নিরানন্দ সমুদ্র তীরের নির্জনতায় আবার ডুবে যায়। গঙ্গাদেবীর পূজার আর একটা সময় হল গ্রীষ্মকালের মাঝামাঝি দশহরা পর্বে। এ সময় ভাগীরথীর দুই তীর ধরে ধরে ভক্তরা নিষ্ঠার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করেন। মা গঙ্গার পূজা হয়, ভিক্ষুকদের দান করা হয়—যাতে করে দাতারা পুণ্য অর্জন করতে পারেন বলে তাঁদের বিশ্বাস।

হিন্দু দেবতাদের মণ্ডলীতে স্বীকৃত মহাদেব বা শিব ঠাকুরের পূজা থেকে শিবরাত্রি পর্বের উদ্ভব। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথির রাত্রি এই উৎসবের সময়। হাজার হাজার পুণ্যার্থী প্রধান প্রধান শিবমন্দিরগুলিতে সমবেত হয়। হুগলী জেলার তারকেশ্বর মন্দিরে মিলিত যাত্রীর সংখ্যা হয় লাখ লাখ। একটা সম্পূর্ণ মেলাও বসে যায়। নীল-রূপী শিবের (আদিতে ব্রাত্যজাতিদের ধর্মঠাকুর) পূজার উৎসব চলে একমাস ধরে। এতে যোগদান করেন তপশিলী সম্প্রদায়গুলির কোনো কোনো শ্রেণীর লোক, বিশেষ করে আদিম জাতির যেসব লোক তাঁদের প্রাচীন এলাকা ছেড়ে এদিকে বসবাস করছেন তাঁরা। আর যোগদান করেন অশুচি পেশার লোক। এই উৎসব চরমে ওঠে বাংলা বৎসরের শেষ দিন চৈত্র সংক্রান্তির দিনে যখন ভক্তি-বিহ্বল শিব ভক্তগণ বিশেষভাবে তৈরি ধারালো পেরেক বসানো কাঠের তক্তার উপরে শয্যাগ্রহণ করেন (কণ্টক-শয্যা) অথবা একটা দণ্ডের অগ্রভাগে বসানো আড়া-কাঠে গাঁথা লোহার ফলক পিঠের চামড়ায় গেঁথে ঝুলতে থাকেন। এই হল চড়ক পর্ব। এতে সব সময়েই হাজার হাজার দর্শক উপস্থিত থেকে এই ভীষণ আত্মপীড়নের অভাবনীয় দৃশ্য দর্শন করে। এই প্রথা আদিম তান্ত্রিক ক্রিয়ার বিকৃত অনবলুপ্ত রূপ বিশেষ। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, বিশেষত মেয়েরা, ঐদিন সম্পূর্ণ উপবাসী থেকে শিবের ভজনা করেন। এই পর্ব উপলক্ষে সহরে ও গ্রামে নিয়মিত মেলা বসে, খেলনা ও হস্তশিল্পীদের তৈরি নানা কাজ বিক্রির জন্য রাখা হয়। ভাঁড় বা বিদূষকরা হাস্যকর বেশে ছন্দহীন এলোমেলো ছড়ায় চলতি কোন ফ্যাশান অথবা ঘটনার ব্যঙ্গ করে দলে দলে বার হয়। জেলে-পাড়া নামে কলকাতার এক অঞ্চলের সং-দের ভাঁড়ামির উৎকর্ষের খ্যাতি আছে। এই দলের বিদূষকরা বেশ আগে থেকেই মহড়া দেন এবং তৈরি হন।

মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান উৎসব হল মহরম, ইদুজ্জোহা, ইদুলফিৎর, ও পয়গম্বরের জন্মদিন। মহরম পর্বে আরবের কারবালা ময়দানের যুদ্ধে হজরত মহম্মদ (দঃ)-এর দৌহিত্র হাসান ও হোসেনের আত্মাহুতির স্মরণে উদ্‌যাপিত হয়। মুসলিমরা যুদ্ধ-যাত্রার ভঙ্গীতে শোভাযাত্রা করে নিহত বীরদ্বয়ের কবরের প্রতিরূপ বহন করেন। ঐ সময় তাঁরা কৃত্রিম যুদ্ধ ও শক্তির খেলা দেখাতে দেখাতে যান। এতে লাঠি ও তরবারির খেলাই বেশি থাকে। কবরের প্রতিরূপগুলি পরে একটা

নির্দিষ্ট জায়গায় গোর দেয়া হয়। ষাট-সত্তর বছর আগে অবধি হিন্দুরাও এই শোভাযাত্রায় যোগ দিতেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা দেখা দেবার পর থেকে তা বিশেষভাবে লোপ পেতে বসেছে। একদল মুসলিমরা কালো রংয়ের পোষাকে সজ্জিত স্ত্রীপুরুষের শোকযাত্রা বার করেন। এ উপলক্ষে রচিত, মার্শিয়া বা শোক গাথাও গীত হয়। সভাসমিতি করেও মার্শিয়া গান অনুষ্ঠিত হয়—সেখানে উর্দু ভাষায় রচিত শোক গাথার গান আবৃত্তিও চলে।

ইদুলফিৎর পর্ব একমাস ধরে দিনে উপবাস (রমজান) করার পর অবসিত হয়। এই অনুষ্ঠানটি জাঁকজমকপূর্ণ হিন্দুদের দুর্গাপূজার সঙ্গে তুলনীয়। এদিন নতুন কাপড় অবশ্যই পরতে হয়। খোলা ময়দানে বা মসজিদের সামনে সকালে বিশেষ নমাজ হয় এবং তাতে সব পুরুষরা যোগ দেন। তারপর পরস্পর কোলাকুলি। এদিনটা খানাপিনার এবং হৈ চৈ শূন্য আনন্দের পরব। ধর্ম কথার আসর এ বৎসরের একটা বিশেষ অংশ।

ইদুজ্জোহা (ইদ-আল্-কোরবান) বা বকর-ঈদ মুসলমানদের অবশ্য করণীয় আর একটা পর্ব। এ উপলক্ষ্যে পশু জবাই করা হয়। এই পর্বটির পৌরাণিক ভিত্তি মুসলমান ধর্মের চেয়েও প্রাচীন, এবং বাইবেলের "ওল্ড টেষ্টামেন্ট"-এর এব্রাহামের পরীক্ষার কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। কোনো কোনো দলের মুসলমানদের গোহত্যায় জেদাজেদির জন্য এ শতাব্দীতে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের ভিতর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা হত। স্বাধীনতার পর অবশ্য ভুল-বোঝাবুঝির শেষ হয়ে এ বিষয়ে পরস্পরে অনেকটা আপোষ মীমাংসা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মদিবস পালন হল আর একটা উল্লেখযোগ্য পুণ্যোৎসব। প্রতি বৎসর মধ্য-ফাল্গুনে বেলুড় মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কেন্দ্রে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই পবিত্র উৎসবে শুধু হিন্দুরা নন, ভিন্ন ধর্মের লোক এবং বিদেশীরাও যোগ দিয়ে থাকেন। এই মহান সাধকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক বেলুড় মঠে সমবেত হন।

পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত অঞ্চলে স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম সাধকদের সম্মানার্থে সংখ্যাতীত মেলা ও উৎসব হয়ে থাকে প্রতিটি পুরানো মন্দিরেরই বাৎসরিক উৎসবের নির্দিষ্ট দিন আছে। তীর্থযাত্রীরা তখন আসেন, আর কাজেকাজেই তখন তার চারদিকে ছোট বড় মেলা বসে যায়। এরমধ্যে দু'জন মধ্যযুগীয় ধর্মযাজকদের সম্মানার্থ মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কথিত আছে, এঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সুন্দরবনের ঘোর জঙ্গলে বসতি স্থাপনের সাহায্য করেছিলেন ধর্মযাজকদের একজন হলেন পীর গাজী মুবারক শা। 24 পরগণা জেলায় ঘুটিয়ার শরীফে তাঁর দরগায় বাংলা বর্ষের শেষে একটা বাৎসরিক মেলা বসে। সে সময় ধর্ম-নির্বিশেষে যাত্রীরা সমবেত হন, আর পীরের কবরে শ্রদ্ধা অর্পণ করেন। আর একজন সাধু হলেন দক্ষিণরায়। ঐ জেলারই ধপধপি নামক গ্রামে তাঁর স্মৃতি-স্থান। ইনি হিংস্র বাঘকে পোষ মানাবার শক্তি রাখতেন। গঙ্গাসাগরে স্নানের পরদিন তাঁর সম্মানে বিরাট মেলা বসে।

যদিও নানা ধর্মোৎসবের জনপ্রিয়তার কমতি নেই এবং জনগণের ধর্মকর্মে মতি আগের মতোই দেখা যায়, তবু আধুনিকতার ছোঁয়াচ এখানেও লেগেছে। কারণ, দেখা যায়, ধর্মগত অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে আবার যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা প্রভৃতি নানারকম আধুনিক আমোদ-প্রমোদের আয়োজনও হয়ে থাকে। ব্যতিক্রম হল শান্তিনিকেতনের পৌষ-মেলা। এটি প্রতি বৎসর 7 পৌষের কাছাকাছি সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। 1891 সালের ওই তারিখে আদি ব্রাহ্ম মন্দির দেবেন্দ্রনাথের আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়। মেলাটি গ্রাম-শিল্পের আদর্শ প্রদর্শনীর পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। এখানে দেখা যায়, গ্রামীণ এবং শান্তি নিকেতন ও শ্রীনিকেতনের কলা ও কারুশিল্প প্রদর্শনী। স্থানটি তখন হয় আদিবাসী, গ্রাম্য ও আধুনিক সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র।

প্রতি বৎসর পঁচিশে বৈশাখ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র ব্যাপকভাবে সংস্কৃতিমূলক রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। সহরে, গ্রামে তাবৎ সংস্কৃতি সম্মিলনী ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলিতে এই দিনটি উদ্‌যাপিত হয়। সঙ্গীত, নৃত্য ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে কবির সর্বতোমুখী ব্যক্তিত্ব সভাসমিতি ও সেমিনারে আলোচিত হয়।

আর এক মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক মেলা হল বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্মেলন। এই মেলা সাধারণত পনের দিন ধরে প্রতিবৎসর কলকাতায় চলতে থাকে। সহরের, গ্রামের, একালের-সেকালের নৃত্য, নাট্যকলার রকমারি রূপ এই মেলায় দেখান হয়। সম্মেলনটি এখন বঙ্গ-সংস্কৃতির প্রতীক বলে গণ্য হয়।

তেইশে জানুয়ারী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের জাতীয়তাবাদী উৎসবের কথা এখানে উল্লেখযোগ্য। এইদিন সহরে সহরে ও বিশিষ্ট গ্রামে গ্রামে একই সাজ পরে সামরিক কায়দায় বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ প্যারেড করে বেড়ায়। কলকাতায় মুখ্য শোভাযাত্রাটি প্রায় তিন কিলোমিটার লম্বা হয়। দলে দলে ছেলেমেয়ে সামরিক বাজনা বাজিয়ে চলে। এই অনুষ্ঠানটি বাংলার বিপ্লবী-চেতনার প্রতীক।

কলকাতা

ভারতের বৃহত্তম নগর কলকাতার ইতিহাস ভারতেরই ইংরেজ রাজত্বের উত্থান পতনের ইতিহাস। হুগলী নদীর পূর্বপারে এর নতুন ও পুরানো দু'শাখার সঙ্গমস্থলে তিনটি পাশাপাশি গ্রাম কালে কালে বৃহৎ সহর কলকাতায় পরিণত হয়। এই গ্রাম তিনটি হল সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলকাতা। সুতানুটিতে জব চারণক যখন বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপনা করলেন তার আগে থেকেই সেখানটা একটা সমৃদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। আরমেনিয়, পর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সুতানুটিতে জমজমাট। এই গ্রামগুলির পূবে তখন ছিল একটা মস্ত জলাভূমি, আর সেই জলাভূমির পাশ ঘেঁষে হিংস্র পশু ও ডাকাত দলে ভরা গহন অরণ্য। ডোবা ও জঙ্গলকে বাস্তুভূমি বানিয়ে কলকাতা সহর পূবদিকে বেড়ে চলে। আর উত্তর দক্ষিণে এবং নদীর অপর পারে সহর বেড়ে চলে বাসকামীদের আগমনে। সুকল্পিত নগর-বিন্যাস হয়নি বলে কলকাতা হয়ে উঠল একাধারে সৌধ আর বস্তি নগরী। বিশেষ করে উত্তর ভাগ—বাগবাজার থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত, অত্যন্ত জনবহুল। অলিগলির গোলকধাঁধায় ছোটো ছোটো শ্রীহীন আস্তানা, আর তারই মধ্যে যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে ধনী জমিদার ও ব্যবসায়ীদের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা।

অনেকটা ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হেতুই কলকাতা নগরীর সমৃদ্ধি। এঁরা ওখানে নিজেদের মহল্লায় 'দেশী' বা 'নেটিভ'দের ছোঁয়া বাঁচিয়ে বাস করতেন। ভারতীয় এলাকায় তিনটি প্রধান প্রধান শ্রেণীর বাসিন্দা ছিল—প্রথমত, ধনী সম্প্রদায়। এঁরা জাঁকজমকে বাস করতেন এবং বদান্যতার দিকে এঁদের ঝোঁক ছিল। দ্বিতীয় হলেন, ইংরেজি শিক্ষিত "বাবুরা"। এঁদের কেউ কেউ ছোটখাটো ভদ্র জমিদার-নন্দনও ছিলেন। শিক্ষিতদের পেশায় এবং সরকারী ও ব্যবসায়ী মহলে "বাবুগিরি" কাজে এঁরা লিপ্ত থাকতেন। আর, তৃতীয় হল, শ্রমিক শ্রেণী; বন্দরে জাহাজ ঘাটায়, শিল্প-প্রতিষ্ঠানে এবং সহুরে জীবনযাত্রা সম্পর্কিত বিবিধ প্রয়োজনীয় কাজে এঁদের দেখা যেত। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকরাই জাতীয় সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনার নবজাগরণের প্রধান উদ্যোক্তা। কলকাতা-জাত এই নতুন সংস্কৃতিটি শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে একটা নতুন ভাবধারার বাহক ছিল। অনেকগুলি পুরানো আচারবিধি পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই পুরানো আচারবিধির প্রভাব রয়ে গেল গ্রামাঞ্চলে—যেখানে বেশির ভাগ লোক বাস করত। খাস কলকাতার এই সুমার্জিত সংস্কৃতির আদলই জেলায় জেলায় গড়ে ওঠা সহুরে সমাজের ও শিক্ষিতদের সংস্কৃতির ভাবাদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কলকাতার প্রাণ-ধর্ম

কলকাতা সহরের প্রতিষ্ঠা ব্যবসা-বাণিজ্যের দৌলতেই যদি হয়ে থাকে, তবে বলতে হবে এর প্রাণশক্তি যুগিয়েছে বুদ্ধিজীবীদের সতেজ কর্ম-চাঞ্চল্য। এই কর্ম-চাঞ্চল্য স্পষ্টভাবে বাণিজ্যিক স্বার্থ ও আমলাতন্ত্রের প্রভাবমুক্ত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায়ের সময় থেকেই এই কলকাতায় ভারতের নবযুগের সূচনা হয়। ভারতের ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিগত শ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য গুলির যে সমন্বয় প্রচেষ্টা তখন শুরু হয়েছিল, তাই ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এখনো অব্যাহত রয়েছে। ভারতের পরবর্তীকালের চিন্তাধারা ও কর্মতৎপরতা যে সব প্রতিষ্ঠানের প্রভাব পেয়েছিল তার অনেকগুলি ইংরেজ বুদ্ধিজীবীরাই স্থাপন করেন (তাঁদের ব্যবসায়ী সমাজ নয়)। কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ইংরেজ ও ভারতীয় উৎসাহী কর্মীদের মিলিত সহযোগিতায় : আর কতকগুলি হয় একমাত্র বাঙ্গালীদের দ্বারাই। স্বাধীনতার পূর্বে বঙ্গদেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রচারের মূলে বিশেষভাবে ছিলেন বাংলার নেতা ও লোকহিতৈষীরা এবং প্রটেস্টান্ট খৃষ্টান ধর্মযাজকগণ।

শীল্‌স ফ্রী পাব্লিক স্কুলের মতো অবৈতনিক স্কুলে প্রচুর বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকগুলি প্রফেসরশিপ ও রিসার্চ ফেলোশিপ, বৃত্তি এবং পুরস্কার ভারতীয়দেরই দান। সেরূপ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ সায়েন্স ও বোস ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় বেসরকারী দানে। 1906 সালে স্থাপিত ন্যাশানাল কাউনসিল অফ এডুকেশন সরকারী অনুমোদন পাবার পূর্বে কলেজ অফ ইনজিনিয়ারিং এণ্ড টেকনলজি চালনা করতেন। এই কাউনসিল দেশপ্রেমী বাঙ্গালীদের অর্থে জীবিত ছিল। স্বাধীনতার পর এটিই বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত ও পরিবর্ধিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্নতির জন্য সৃষ্ট মূল কর্মশালাটি—ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স (1876)—গড়ে উঠেছিল স্বেচ্ছাকৃত দানে। এখানেই সি. ভি. রমন, এ. এস. কৃষ্ণন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ করে গেছেন। বাঙ্গালী-রীতির ললিতকলা নিজে নিজেই গড়ে ওঠে, আধুনিক থিয়েটার সরকারী কু-নজরে পড়েও উন্নীত হয়। সরকার যে সাংস্কৃতিক উন্নতিতে গা করতেন না তা প্রমাণিত হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ব্যাপারে। এই পরিষদটি ইংরেজ সিভিলিয়ান জন বীমসের প্রস্তাব মতো 1893 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্রেন্‌চ একাডেমির ছাঁচে গড়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে একমাত্র লোকহিতৈষীদের প্রদত্ত বৃত্তি ও দানে প্রায় 70 বৎসরের মত চালিত হতে হয়েছে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী মনোভাবের উন্মেষ ও প্রধান বিকাশ কলকাতাতেই হয়েছিল ; পরে তা ভারতময় ছড়িয়ে পড়ে।

এরূপে কলকাতা থেকে উৎপন্ন শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক ক্রিয়াকলাপ নিজস্ব পথে চলে এসেছে। এর শিকড় গভীরভাবে প্রোথিত ছিল জাতীয়-চেতনা মিশ্রিত মানবিকতাবাদে। আধুনিক সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ উপাদানগুলি এখানেই প্রকাশ

পেয়েছিল। আর এগুলি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের একেবারে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচ্ছেদে পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের কাজকর্মে সর্বদাই একটা নিরীক্ষা ও মতবৈশিষ্ট থাকত। নতুন ও পুরাতন উভয়কেই যাচাই করে দেখবার রেওয়াজ স্বাধীনতার পরবর্তী যুগেও চলে এসেছে। উন্নতিকামী সমাজে বুদ্ধিজীবীদের কাজ হল সব ব্যাপারে সায় না দেওয়া, আর বিদ্রোহী দৃষ্টিভঙ্গী রাখা—তাঁদের মধ্যে বয়োঃবৃদ্ধরা সংস্কৃতির নতুন রূপ দেবেন, নতুন দার্শনিক দৃষ্টিতে তাকে দেখবেন। অশোক মিত্র সঙ্গত ভাবে বলেছেন, "কলকাতা ব্যষ্টির মাঝে সমষ্টি। বিশ্বে এর প্রায় তুলনা নেই। অনেক ধারণাতীত সমস্যায় জড়িত কলকাতা এখনো বৃহত্তম সহরগুলির অন্যতম। তবু কলকাতাই হল ভারতের প্রাণোচ্ছল সহর। সংস্কৃতি, শিল্পোদ্যম ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে কলকাতা বরাবরই বিশ্বের বিস্ময়।"

সহর এলাকা

কিন্তু কলকাতা শুধু বড় সহরই নয়। কলকাতা নগর-জীবনের কেন্দ্রবিন্দু। এর অর্থনৈতিক ভিত্তি শিল্প ও বন্দর সংক্রান্ত কাজ কারবারে। খোদ কলকাতা সহরের বিস্তৃতি 1,250 স্কোঃ কিলোমিটারের উপর, লোকসংখ্যা 70 লক্ষের বেশি—পশ্চিম-বঙ্গের মোট লোক সংখ্যার প্রায় এক ষষ্ঠাংশ। এই হচ্ছে কলকাতার পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য এবং আজ কলকাতা একটি জটিল সমস্যা—শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের। এই নগর শুধু ভারতের সর্ববৃহৎ সহর ও সহরতলীর সমাবেশ নয়, ভারতের পূর্বাঞ্চলের ও বর্তমানে উপমহাদেশের শিল্প-বাণিজ্যের নাভিকেন্দ্র। কলকাতার বাণিজ্যিক আওতায় আছে তার পেছন দিকের বহুবিস্তৃত স্থানগুলি—এগুলি শুধু পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নাগাল্যাণ্ড, অরুণাচল, মেঘালয়, মিজোরাম, ত্রিপুরা, বিহার, উড়িষ্যা ইত্যাদি পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি জুড়েই নয়, ছড়িয়ে গেছে উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের বহু অংশে, হিমালয়ের নেপাল, ভুটান, সিকিম আর গণরাজ্য বাংলাদেশে। পূর্ব ভারতে শিল্পোদ্যম প্রথমত কলকাতাকে কেন্দ্র করেই বেড়েছে। এর কারণ, প্রথমত, কলকাতার বন্দর। এই বন্দর আজও ভারতের মোট রপ্তানীর শতকরা 40 ভাগ পরিমাণ এবং আমদানীর 25 শতাংশ পরিমাণ তদারকী করে। আর হল, রেল, রাস্তা ও জলপথের সুবিধা, যাতে করে পূব, পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণে দূরে দূরে সর্বত্র কাঁচা ও তৈরী মাল চলাচল করতে পারে। দ্বিতীয় কারণ হাতের কাছে যথেষ্ট কয়লার সরবরাহ। তৃতীয়ত, এই চড়া বাজারে অল্পমজুরীতে শ্রমিকের যোগান।

1757 সাল থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা নগরীও গড়ে উঠতে থাকে। এই সুরক্ষিত স্থানটির নিরাপত্তা এবং অর্থ উপায়ের সুযোগসুবিধা বিত্তশালী ও ভাগ্যান্বেষীদের জড়ো হতে প্ররোচিত করে। বিদেশী আর্মেনিয়, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও এদেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মানুষ এখানে ব্যবসা বাণিজ্যের

জন্য বসতি করতে থাকেন। 1774 থেকে 1912 অবধি কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। উচ্চাভিলাষী শিল্পী ও বণিকরা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খেটে খাবার লোক দলে দলে কলকাতা সহর ও সহরতলীতে আসতে থাকেন —বন্দরে, বৃহৎ শিল্প সংস্থায় ও সরকারী কাজে বসে যাবার জন্য। 1901 সালের আদমসুমারি অনুযায়ী সহরের 10 লক্ষ বাসিন্দার মধ্যে বাঙ্গালীরা টেনে-মেনে সংখ্যাগুরু মাত্র। আর প্রায় 45% এসেছিল বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশের পূর্বভাগ থেকে। এরা মুখ্যত শ্রমিক শ্রেণীর—শিল্পে, যানবাহন পরিচালনায়, ঘর তৈরিতে এবং অন্যান্য কাজে লিপ্ত। (এখানে উল্লেখযোগ্য, ঐ সময় বিহার ও উড়িষ্যা প্রশাসনিক বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল)। ইংরেজ অধিবাসীরা সংখ্যায় মাত্র 1·3% ছিলেন এবং বাণিজ্য ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্ষমতার একাধিকার তাদের হাতেই ছিল। আভ্যন্তরীন ব্যবসা-বাণিজ্যের অনেকটাই ছিল আর্মেনিয়, ইহুদি, গুজরাটি ও মাড়োয়ারিদের হাতে। সুতরাং, কলকাতা বস্তুত ভিনদেশী আগন্তুকদের দ্বারাই উন্নত। 1957-58 সালের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নিরীক্ষা অনুযায়ী সহরটির মোট রোজগারীদের 54 শতাংশ অন্য প্রদেশ থেকে আগত। 1961 সালের লোকগণনা মতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্থার মোট কর্মীদের 84 শতাংশের কর্মস্থল কলকাতা ও হাওড়ার শিল্প এলাকায়; 2.08 লাখ পাটজাত শিল্প কর্মীদের 74% এসেছেন অন্য প্রদেশ থেকে। অশোক মিত্র হিসাব করে বলেছেন যে একমাত্র কলকাতা সহর থেকেই বৎসরে 28 কোটি টাকা ছোট ছোট অঙ্কে পোষ্টাঅফিসের মাধ্যমে পাঠান হয়। বিভিন্ন প্রদেশের অর্থলিপ্সু ব্যবসায়ীদের কলকাতা থেকে নিজ নিজ প্রদেশে চালান করা লাভের টাকা যদি এর সঙ্গে যোগ করা যায় তবে বঙ্গদেশের আর্থিক অবস্থার চিত্র বেশ স্পষ্ট দেখা যাবে। আরো আছে। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে যানবাহনে ও অন্যভাবে যোগাযোগের সহজ ব্যবস্থা থাকায় কাছের ও দূরের রাজ্যগুলিতে উৎপন্ন দ্রব্যের মস্ত বিক্রয়ের স্থান এই কলকাতা। এই দ্রব্যগুলি হল খাদ্যশস্য, শাকসব্জী, মাছ, মাংস, সংরক্ষিত খাবার, শ্রমশিল্পের বা সাধারণ ব্যবহারের উপযোগী তৈরি অন্যান্য জিনিষ।

পতনের মূল কারণ

কাজের সন্ধানে গ্রাম থেকে সহরে চলে আসা সারা ভারতেরই একটা শোচনীয় সমস্যা। কিন্তু বিশেষ করে কলকাতার সমস্যা আরো মর্মান্তিক এই জন্য যে এখানে শুধু রাজ্যের গ্রামগুলি থেকেই লোক আসে না, আসে ভারতের অন্যান্য স্থান থেকেও। 1951-61 পরিসংখ্যান-দশকে প্রায় 300,000 আগন্তুক একমাত্র অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকেই কলকাতায় প্রবেশ করেছিলেন। এগুলি, তার উপর রাজ্যেরই অন্যান্য জেলা থেকে আগত লোক, এবং আগেকার পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুত্যাগীরা—সব মিলে কলকাতা এলাকায় কাজের উমেদারদের সংখ্যা বিশেষভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। কলকাতা করপোরেশন এলাকায়

(306.6 স্কোঃ কিঃ মিঃ) প্রতি স্কোঃ কিঃ মিটারে জন সংখ্যার গড় ঘনত্ব হচ্ছে 30,497 । জনাকীর্ণ স্থানে আবার আরো বেশি হবে। সমগ্র সি. এম. ডি. এ.এলাকার ঘনত্ব হল 12,419 জন প্রতি স্কোঃ কিঃ মিটারে। এই শ্বাসরোধী জনাকীর্ণতার ফলে নাগরিক মামুলি সুখসুবিধের ব্যবস্থায় অনেক গলদ এসে যাচ্ছে। প্রায় দশ লক্ষ লোকের বাস সহর কলকাতা ও প্রতিবেশী হাওড়ার 3,000 বস্তিতে। সি. এম. ডি.এ-র অন্যান্য মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বস্তির সংখ্যা আরো 5 লক্ষ। আব্রুর বালাই তো নেই-ই, শোচনীয় অভাব আছে জল সরবরাহের, পয়ঃপ্রণালীর, ময়লা নিষ্কাশনের ব্যবস্থার, বাসগৃহের, যান বাহন চলাচলের আর পরিবহন ব্যবস্থার। ফলে সর্বদা মহামারী, সংক্রামক ও ছোঁয়াচে রোগ তো জন্মাচ্ছেই, তা ছাড়া কর্তৃপক্ষকে সম্মুখীন হতে হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা আর অল্পবয়সীদের অপরাধপ্রবণতার ক্রমবর্ধমান সমস্যার। প্রতিবাদমূলক দলবদ্ধ বিক্ষোভ প্রদর্শনের হিড়িকের জন্য মৃত বা মৃতপ্রায় নগর বলে কলকাতার যে বদনাম রটেছে তার মূলে রয়েছে এরকম ঠাসাঠাসির ভিড়, আর বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি। নৈরাশ্য ও ক্ষুধার তাড়নায় মানুষ সহজেই ধ্বংসমূলক প্রচারের কবলে পড়ে।

একদিকে কলকাতায় চারদিক থেকে অনবরত বেকার লোকদের আগমন হচ্ছিল, অন্যদিকে স্বাধীনতার পর আর্থিক অবস্থায় জড়ত্ব ধরে যাচ্ছিল। হুগলী নদীতে পলি-মাটি জমাটের জন্য কলকাতা বন্দরের কার্যক্ষমতার অবক্ষয় হয়েছে। সর্বভারতীয় পণ্যরপ্তানীর কাজ কলকাতার ভাগে নেমে এসেছে 1951-52 সালের 60.5 শতাংশ থেকে 1969-70 সালের 33 শতাংশে। আমদানী নেমেছে 1947-48 এর 28.3 শতাংশ থেকে 1969-70 সালের 18.4 শতাংশে। শিল্প উৎপাদনের হ্রাস ও শ্রমিক বিক্ষোভের দুর্দিনে এটা ব্যবসায়ে অচল অবস্থার লক্ষণ। সম্পূর্ণভাবে সি এম ডি এ এলাকায় অবস্থিত পাট শিল্প সংস্থায় চাকুরীর অঙ্ক 1947 সালের 2.99 লাখ থেকে 1971-72 সালে 2.19 লাখে নেমে এসেছে---যদিও উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় একই আছে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প সংস্থায় চাকুরি, যাতে কলকাতার ভাগ 84 শতাংশ তা 1947 থেকে 1971 এর মধ্যে মাত্র 1.70 শতাংশ বেড়েছে —যদিও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি 60 শতাংশের বেশি। 1947 সালে পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনী মূলধন মোট ভারতীয় মূলধনের 26.45 শতাংশ ছিল। 1967 সালে এর পরিমান কমে হয় 17.5 শতাংশের কম। শ্রমিক চাঞ্চল্য, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রয়োজনীয় কাঁচামালের ভয়ানক ঘাটতির জন্য এ রাজ্য থেকে ব্যবসা বাণিজ্য অনবরত অপসারিত হচ্ছে। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশা অন্যান্য রাজ্য থেকে বেশি। এরই ফলে এখানে আজ শিল্পসংস্থাগুলির এমন অর্ধমৃত অবস্থা।

প্রতিবিধান ব্যাবস্থা

সম্প্রতি খাস কলকাতা থেকে কর্মপ্রার্থীদের নানা জায়গায় ছড়িয়ে দেবার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন নতুন শিল্পসংস্থা স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়েছে। আশা

করা যায়, এতে কলকাতার জনবহুলতা কিছুটা কমবে। অধিকতর সম্ভাবনা আছে সি. এম. ডি. এ. এলাকা আরো ঘিঞ্জি না হবার। কলকাতার হাল আমলের জরুরী সমস্যা হল নাগরিকদের নগরজীবনের স্বাভাবিক সুখসুবিধার বন্দোবস্ত করা। 14,969.12 কোটি টাকা বরাদ্দ করে সি. এম ডি. এ. এলাকার কর্মসূচি মঞ্জুর হয়েছে। রাজ্য সরকার 1970 সালে কলকাতা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করেছেন। তার কাজ এখন শুরু হয়েছে। পাতাল রেল ও দ্বিতীয় হাওড়া সেতু নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সেতু কলকাতা-হাওড়ার মধ্যে যোগাযোগ সাধন করবে। এসবের ফলে চলাচল সহজ হবে, নাগরিকদের উপনগরে স্থানান্তরিত করবার সুবিধাও করা যাবে।

কলকাতার সমস্যা যদিও জটিল, এর সমাধানও হতে পারে যদি জাতির অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কলকাতার গুরুত্ব সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায়। কলকাতা না বাঁচলে ভারত বাঁচতে পারে না। বরাবরই এবং এখনো সমস্যাকীর্ণ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জীয়ন কাঠি কলকাতার হাতে—এটা একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থার যখন উন্নতি হবে, বেকার সমস্যার সুরাহা হবে, তখনই কলকাতা আবার জেগে উঠবে। ভারত রাষ্ট্রের সম্মুখে এটাই একটা জরুরী কর্তব্য এবং অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার সকল দিকে এ কথাটি মনে রেখে চলতে হবে।

সমস্যা ও তার সমাধানের অগ্রপট

ব্যাপক সমীক্ষা

1947 সালে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় পশ্চিম বাংলার আর্থিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-পণ্যের রপ্তানী নিষিদ্ধ হওয়ায় শিল্প বাণিজ্য প্রভৃত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং রাজ্যের অনেক শিল্প ক্রমশ লোপ পেয়ে গিয়েছিল। বঙ্গদেশের পূর্বদিক থেকে আগত অনেক লোক পশ্চিমবঙ্গে কাজকর্মে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরা তাঁদের দেশের জমিজমার আয় থেকে বঞ্চিত হয়ে গরীব হয়ে পড়লেন। উদ্বাস্তুদের বেশির ভাগই রাজ্যের সঙ্গতি-সংস্থানের পক্ষে গুরুভার বিশেষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল—কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য থাকলেও। অন্যান্য রাজ্য থেকে রুজি-রোজগারের জন্য এ রাজ্যে আগমন আগের মতই চলছিল। শাসন কর্তৃপক্ষের সামনে বাস্তব ও মনস্তাত্ত্বিক নানা অভূতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল যা তাঁদের শক্তির সম্বলকে নিঃশেষ করে তুললো। সমস্যা লাঘব করবার কোনো সুচিন্তিত প্রকল্প ছিল না। রাজ্যের শোচনীয় আর্থিক অবস্থাকে সঞ্জীবিত করবার কোনো কর্মসূচী কেন্দ্রীয় সরকারেরও ছিল না—তাঁরা একমাত্র উদ্বাস্তুদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের কিছু ব্যবস্থা করছিলেন। উদ্বাস্তু সমস্যার দেখাদেখি যে-সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল তার পরি-প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ সকল ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত ছিল না। প্রায় 43 লাখ রেজিষ্টার্ড উদ্বাস্তুদের মধ্যে প্রায় 30 লাখ লোকের এখনো পূর্ণ সংস্থান হয়নি। কোনো কোনো জেলায় উদ্বাস্তুদের ভিড় বিশেষভাবে বেশি। পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় লোকস্ফীতি পুরানো জনসংখ্যার হিসেবে শতকরা 94 গুণ, কুচবিহার জেলায় শতকরা 50 গুণ এবং ঘন-সন্নিবিষ্ট 24 পরগনা জেলায় শতকরা 21 গুণ।

এসব প্রতিকূল অবস্থার পুঞ্জীভূত ফল তৃতীয় যোজনার সময়কালে তীব্রভাবে প্রকট হয়েছিল। তখন বেকারসমস্যা, অতিতুঙ্গী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষিজাত উৎপাদনের ঘাটতি ও মন্দা শিল্পোদ্যম এসব একত্র হয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সঙ্গীন অনিশ্চিত অবস্থার সৃজন করেছিল। ধর্মঘট, ঘেরাও, রাজনীতিমূলক বিস্ফোরণ এই সবকয়টি মিলে একটা অরাজক অবস্থা ঘটতে চলেছিল। অবশেষে জনগণ নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল শান্তিশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা কত দরকার। 1971 সালে অবস্থার মোড় ফিরল। পার্লামেন্টারি নির্বাচনে প্রকট হল প্রগতিশীল, লোক-কল্যাণকামী, সুঠাম রাষ্ট্র জনসাধারণের কত কাম্য। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ব্যাপারে গভর্নমেন্টের বলিষ্ঠ নীতি জনসাধারণের আস্থা আরো সুদৃঢ় করল। পাকিস্তানের

ঔপনিবেশিক শাসনে প্রায় 25 বৎসর নিপীড়িত থাকার পর বঙ্গভূমির ঐ অংশে স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্র বাংলাদেশ জন্ম নিল। অবস্থা মোটের উপর অনেকটা সুস্থিত হয়েছে। কিন্তু সমস্যাটির জট এখনো খোলেনি। জট মূলত অর্থনৈতিক পুনর্বাসন সংক্রান্ত।

আগেই বলা হয়েছে কলকাতার সমস্যাটি পশ্চিমবঙ্গের একটা বিশেষ সমস্যা। কিন্তু সমস্যা শুধু এটাই নয়। বহুদিক থেকে গোটা সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে। শ্রমশিল্পের উন্নতি স্পষ্টতই কাম্য এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই, কিন্তু গ্রামীণ কৃষিশিল্পে অনুরূপ, এমন কি বেশি করে, মনোযোগ দেওয়া দরকার। অবস্থা জরুরী—তাই বিবেচনা করতে হবে যে কৃষিশিল্পে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে ফল পাওয়া যায়, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের কথা ভেবে দেখলে শ্রম-শিল্প প্রসারণের ফল পেতে অধিকতর সময়ের দরকার হয়। কৃষি-শিল্প বিভাগের বাইরে অল্পমেয়াদী পরিকল্পনায় ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পে রকমারি ভোগ্যপণ্য ও শিল্পের সহায়ক যন্ত্রপাতি উৎপাদন সম্ভবপর।

শ্রম-শিল্প

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শ্রমশিল্প প্রধান। এখানে সমগ্র শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন-ওয়ারি মূল্য সমগ্র ভারতের ঐ মূল্যের 20 শতাংশ। রাজ্যের শ্রমশিল্পের ভিত্তিগত পাঁচটি প্রধান শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে পাট, চা ও কয়লার কথা আগের এক পরিচ্ছেদে কিছু কিছু বলা হয়েছে। অন্য দু'টি হল ইস্পাত ও ইনজিনিয়ারিং। সমগ্র ভারতের শ্রম শিল্পগত আয়ের ভিতর পশ্চিমবঙ্গের অংশ হল পাটশিল্পে শতকরা 100 ভাগ, মালবাহী রেল বগি তৈরীতে শতকরা 50 ভাগের বেশী, তৈরী ইস্পাতে শতকরা 20 ভাগের বেশি, কাগজ ও কার্ডবোর্ডে শতকরা প্রায় 20 ভাগ, সেলাইয়ের কল ও বিজলী পাখার প্রতিটিতে শতকরা প্রায় 70 ভাগ, বাই সাইকেলে শতকরা 20 ভাগ, সালফিউরিক এসিডে শতকরা 11 ভাগ, বস্ত্রশিল্পে শতকরা 5 ভাগ, এনামেলের জিনিষে শতকরা 97 ভাগ, রেজর ব্লেডে শতকরা 75 ভাগ, বিজলী বাতিতে শতকরা 50 ভাগ, ইস্পাত ঢালাইয়ে শতকরা 36 ভাগ, ষ্টোরেজ ব্যাটারিতে শতকরা 50 ভাগ, রং, এনামেল ও বার্ণিশে শতকরা 48 ভাগ, চীনামাটি শিল্পে শতকরা 50 ভাগ, সাবানে শতকরা 28 ভাগ, ক্রোম ট্যানড চামড়ায় শতকরা 43 ভাগ, রবার জুতায় শতকরা 43 ভাগ, শীট কাঁচ শতকরা 37 ভাগ, মোটর গাড়িতে শতকরা 31 ভাগ। এসব কয়েকটি প্রবীণ শিল্পের কথাই বলা হল।

চায়ের ব্যাপারে অবস্থা অনেকটা স্থিতিশীল। পাটজাত মাল বৈদেশিক রপ্তানীর বাজারে এককভাবে ভারতের প্রধান মুনাফার জিনিষ ছিল। গত কয়েক বছরে পাটের রপ্তানীতে লাভ হয়েছিল বাৎসরিক প্রায় 250 কোটি টাকা। অবস্থা এখন তেমন সুবিধার নয়। আন্তর্জাতিক বাজারে প্যাকিং-এর জন্য কৃত্রিম আঁশের চলন হয়েছে। 1965 থেকে 1970 সাল অবধি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের মোটা চটের

কাপড়ের রপ্তানী 86 শতাংশ থেকে 50 শতাংশের নিচে নেমে এসেছে, আর চটের মালের ক্ষেত্রে নেমেছে 61 শতাংশ থেকে প্রায় 25 শতাংশে। এর প্রতিষেধক হল কাঁচা পাটের একটা উদ্বৃত্ত ভাণ্ডার মজুদ করে রাখা, প্রতিযোগিতামূলক দর বেঁধে দেওয়া, উপজাত দ্রব্য থেকে রকমারি নতুন দরকারী জিনিষ তৈরি করা। আর দরকার, দেশে পাটের ব্যবহার ও চাহিদা আরো বাড়াবার জন্য সক্রিয় হওয়া। এরজন্য প্রয়োজন হবে একটা কেন্দ্রীয় সংস্থা যা পাটের চাষ ও বিক্রী বাড়াবার ও নিয়ন্ত্রিত করবার কাজ হাতে নেবে।

কয়লা উৎপাদন ক্ষেত্রে 1973 সালের 30 জানুয়ারি থেকে সমগ্র শিল্পটিই কেন্দ্রীয় সরকারের তত্ত্বাবধানে এসেছে। পোড়া পাথুরে কয়লা শিল্প আগেই হাতে এসে গিয়েছিল, এখন কাঁচা কয়লা শিল্পও হাতে নেওয়া হল। পশ্চিমবঙ্গে কয়লা শিল্পের দুরাবস্থা এতেই প্রমাণ হয় যে গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নেবার সময় কাঁচা কয়লার 232টি খনির মধ্যে 43টিই চালু ছিল না। ভারতে নতুন নতুন বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কারখানা, ইস্পাত কারখানা ও মোটামুটি সর্বপ্রকার জাতীয় শ্রমশিল্প দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, এদের চালু রাখবার উদ্দেশ্যে কয়লা উৎপাদন বাড়াবার জন্য গভর্ণমেণ্ট এই ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বস্ত্র শিল্পেই নির্জীবতা দেখা গিয়েছিল বেশি। বন্ধ কারখানার সংখ্যা 16-র কম নয়। এর ভিতর 6টি রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধানে ফের খোলা হয়েছে এবং আরো 4টি খোলা হয়েছে ইনড্রাসট্রিয়াল রিকনষ্ট্রাকশন করপোরেশন অফ ইণ্ডিয়ার অর্থ সাহায্যে।

শ্রমিক চাঞ্চল্য

1967 সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পবাণিজ্যে এই নিশ্চল অবস্থার বিশিস্ট কারণ হল ব্যাপক শ্রমিক চাঞ্চল্য। 1961 সালে 275টি শ্রমিক-বিরোধের স্থানে 1969 সালে ঘটে 419টি। এগুলিতে 792,672 জন শ্রমিক লিপ্ত থাকে আর 9,880,856টি কর্ম-দিবস নষ্ট হয়। 1970 সালে ঘটে 405টি বিরোধ যাতে 508,524 জন শ্রমিক লিপ্ত থাকে আর 11,158,031টি কর্মদিবস নষ্ট হয়। 1969 সালে 297টি ধর্মঘট হয়—জড়িত শ্রমিক 719,134 ও নষ্ট কর্মদিবস 7,763,454। 1970 সালে ধর্মঘট 272টি, জড়িত শ্রমিক সংখ্যা 419,328, নষ্ট দিন 7,259,213টি। অবশিষ্ট কর্মদিবসের ক্ষতি মালিকদের কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় ঘটে। মালিকদের এই মারমুখী মনোভাব 1960 সালের পর থেকেই দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে কারখানা বন্ধ করে দেবার ফলে সময়-ক্ষতির হার সমগ্র ভারতের হিসেবে 1966 সালে 64.1 শতাংশ, 1967 সালে 61.8 শতাংশ, 1968 সালে 63.4 শতাংশ, 1969 সালে 59.3 শতাংশ। ঘেরাও-এর জন্য অতি অল্প কয়েকটি লক্-আউট বা কারখানা বন্ধ ঘটে। চরম ঘেরাও-এর বছর হল 1967 সাল। ঐ সালে কারখানা বন্ধের সংখ্যা 123 ও 811টি ঘেরাও—2টি মাত্র বন্ধ হয়েছিল ঘেরাও-র জন্য। স্পষ্টই দেখা যায়, কারখানা প্রধানত বন্ধ হয় অর্থনৈতিক মন্দার জন্য। এই সমস্যা ভারতব্যাপী, যদিও

পশ্চিমবঙ্গেই এর তীব্রতা বেশি পরিমাণে ছিল। কারখানা বন্ধ হবার অন্য কারণ হল উদ্যোগী ব্যবসায়ীদের রাজ্য থেকে ব্যবসায়পত্র গুটিয়ে নেবার ঝোঁক। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা, শ্রমিক সমিতিগুলির উগ্র রাজনৈতিক-চেতনার থেকে এ অবস্থার উদ্ভব হয়। শ্রমিক সমিতিগুলির সংখ্যা 1947 সালে ছিল 1,951 ; 1972 সালে হয়ে দাঁড়ায় 10,496। এটাও দ্রষ্টব্য যে পশ্চিমবঙ্গে সত্যিসত্যিই দক্ষ শ্রমিকদের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম।

1971 সালে অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়। সরকার শিল্প ক্ষেত্রে সদ্ভাব ও শিল্পপতিদের আস্থা রক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী হলেন। শিল্প-সংস্থায় বিরোধ 27.37 শতাংশ কমে গেল। কর্মবিরতি (ধর্মঘট ও লক্ আউট) ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা গেল, ওই ঘটনার সংখ্যা কমল 51.85 শতাংশ। লিপ্ত শ্রমিকের সংখ্যা কমল 58.60 শতাংশ, দিন হিসাবে ক্ষতি কমল 35.73 শতাংশ. 1968-70 সালের গড়পড়তা হিসাব তুলনা করলে লক আউট কমল 36.58 শতাংশ ; ঘেরাও 90.15 শতাংশ, কর্মী-ছাঁটাই 84.34 শতাংশ, পরিচালনা ক্ষেত্রে উন্নত রীতিনীতির নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। শিল্প-জগতে শান্তি ফিরিয়ে আনবার পক্ষে এগুলি একান্ত বাঞ্ছনীয় প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা আরো জোরদার হবে যদি সুকল্পিতভাবে আরো মূলধন কাজে খাটানো যায় এবং সরকার প্রগতিপন্থী শ্রমিক আইন কার্যকরী করেন।

এটা লক্ষ্য করবার যে রাজ্যের বর্তমান শিল্পসংস্থাগুলির অধিকাংশই কলকাতা ও দুর্গাপুর-আসানসোল এলাকায় অবস্থিত। বস্তুত তিনটি ছাড়া আর সমস্ত জেলাই শিল্পোদ্যোগ ক্ষেত্রে অনুন্নত। ইতিমধ্যে বেকারদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে। রাজ্য সরকারের হিসাব মতো 1972 সালের শেষে বেকারদের সংখ্যা ছিল 28 লক্ষ। এটা হয়তো কম করে ধরা হয়েছে, কারণ, আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ মাথা পিছু 0.18 হেকটার হলে গ্রাম্য-বেকারদের চাষবাসে নিযুক্ত করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং বেকারের সত্যিকারের সংখ্যা আরো অনেক বেশি হবে। নতুন বৃহৎ কারবারগুলি প্রধানত ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে। সেখানে নিযুক্তির সম্ভাবনা কর্মপ্রার্থীদের প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। আরো নিয়োগক্ষেত্র চাই যেখানে বহুসংখ্যক লোকের রোজগারের সম্ভাবনা থাকবে, আর সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যেরও অর্থনৈতিক পুনরুত্থান হবে।

নতুন উদ্যোগ-কেন্দ্র

নতুন উদ্যোগ কেন্দ্রগুলি তাই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রথমটি হল দুর্গাপুর অঞ্চল। এ স্থান কয়লার খনির বেষ্টনীর মধ্যস্থলে। কেন্দ্রীয় সরকার এখানে দু'টি সুবৃহৎ প্রকল্প হাতে নিয়েছেন—এইচ. এস্. এল পরিচালিত দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, এবং এফ্. সি. আই পরিচালিত রাসায়নিক সার উৎপাদন কারখানা। এখানে একটি চশমার এবং বিশেষ বীক্ষণ কাঁচের কারখানা ও মাইনস এণ্ড এলাইড মেসিনারি করপোরেশন স্থাপিত হয়েছে। বেসরকারী প্রকল্প কয়েকটি

আছে। প্রধান হল, এ সি সি-ভাইকারস-বেবকক্ কারখানা এবং জেসপস্ প্ল্যাণ্ট। রাজ্যসরকার স্থাপন করেছেন 4টি কয়লা জ্বালানী, 5টি বিজলী উৎপাদক কারখানা; একটি গ্যাস-গ্রিড, একটি কয়লা ধোয়ার কল, একটি আলকাতরা তৈরীর কারখানা, দুর্গাপুর কেমিকেলস লিঃ (মৌলিক রাসায়নিক দ্রব্য তৈরীর কারখানা)—এদের পরিচালক দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লিমিটেড। সহায়ক যন্ত্র তৈরী শিল্পে উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনা এই প্রকল্পগুলিতে রয়েছে। সরকার দুর্গাপুরে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজও স্থাপন করেছেন।

কল্যাণী শিল্পোদ্যোগ সংস্থা সরকারী কল্যাণী স্পিনিং মিল্স-এর দু'টি ইউনিট নিয়ে শুরু হয়। এখন এখানে অনেক বেসরকারী শিল্পোদ্যোগের স্থান হয়েছে। রাজ্যসরকারের কল্যাণী ইনডাস্ট্রিয়াল এস্‌টেট-এর ভিতর প্রধানত ইঞ্জিনিয়ারিং-ভিত্তিক অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি রকমের শিল্পসংস্থা আছে। কল্যাণীতেই পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও শ্রমশিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।

হলদিয়া অঞ্চলে শিল্পোন্নতির সুবৃহৎ সম্ভাবনা আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের হলদিয়া বন্দর পরিকল্পনায় স্থান পেয়েছে একটি সাত বার্থওয়ালা পোতাশ্রয়, একটি জাহাজ তৈরির প্রাঙ্গণ, সম্ভবত একটি নৌ-বিভাগীয় ঘাঁটি, একটি তৈল শোধনাগার, একটি পেট্রোকেমিকেল সংস্থা ও একটি সারোৎপাদন কারখানা। রাজ্য সরকার ঐ পরিকল্পনাগুলির কর্মচারীদের বসতির জন্য একটি গৃহ-নির্মাণ পরিকল্পনাও করেছেন। মনে হয়, হলদিয়া থেকে সবচেয়ে নিকটবর্তী রেল জংশন খড়্গপুর অবধি সমগ্র ভূখণ্ড জুড়ে অনেকগুলি ছোট, বড় রকমের সরকারী ও বেসরকারী প্রকল্পের প্রতিষ্ঠান হবে।

পরবর্তী কেন্দ্র হল পুরুলিয়া জেলার সাঁওতালদি-রামকানালি অঞ্চল। স্থানটি বৃহৎ বৃহৎ ইস্পাত কারখানার নিকটে এবং এখানে মোট 480 মেগাওয়াট-এর বৃহৎ বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানার পরিকল্পনা আছে। এসব কারণে এখানে ছোট, বড়, মাঝারি নানা শিল্প-প্রচেষ্টার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। রাজ্য সরকারের সংস্থা ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডেভেলপমেণ্ট কর্পোরেশন এখানে একটা সিমেণ্ট তৈরির কারখানা স্থাপনের প্রকল্প নিয়ে অগ্রসর হচ্ছেন।

দুর্গাপুর থেকে প্রায় 50 কিঃ মিঃ দূরে ইস্পাত শিল্পের কেন্দ্রস্থলে এবং কয়লা খনির প্রান্তে আসানসোল অঞ্চল। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যবস্থাধীন ইনডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টিল কোম্পানী এখানে অবস্থিত। পরিকল্পনা হচ্ছে রাজ্যের বহুবিধ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের প্রয়োজন মেটাবার জন্য এখানে একটি কয়লা-ভিত্তিক রাসায়নিক কারখানা স্থাপনের।

ফরাক্কা বাঁধ, রেল ও রাজপথ তৈরি শেষ হবার পর ফরাক্কা বাঁধ অঞ্চল এখন উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গের এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে পার্শ্বস্থ পূর্ব অঞ্চলের যোগাযোগ করিয়ে যাতায়াতের একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তস্থলীয় বন্দর ও উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে ফরাক্কার উপযোগিতা শীঘ্রই কাজে খাটানো যাবে বলে আশা করা যায়।

উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি ভূমিভাগ যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। দামী কাঠের গাছ সহ বিস্তীর্ণ বনভূমি ও আবাদযোগ্য স্থানের প্রাচুর্যও এখানে। কৃষিশিল্প, কাগজ-শিল্প, হাল্কা ইনজিনিয়ারিং ও সহায়ক শিল্পের সুযোগ সুবিধা এখানে যথেষ্ট। এই শিল্পগুলি অবশ্য কার্যকরী হতে পারে জলঢাকা হাইডেল প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পেলে।

ছোট পর্যায়ের শিল্প

স্পষ্টই বোঝা যায়, যেসব নতুন উৎপাদন সংস্থা ইতিমধ্যেই শিল্পোদ্যম কেন্দ্রের এলাকায় এসে গেছে সেগুলি ছাড়া অন্যান্য নতুন সংস্থার বেশির ভাগের পরিকল্পনাই সময়সাপেক্ষ। এ সব পরিকল্পনা নির্ভর করবে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংস্থা স্থাপন, কাঁচা মালের নিয়মিত আমদানি, যোগাযোগ ও পরিবহনের সুব্যবস্থার উপরে। প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাবার বন্দোবস্তের প্রশ্নও আছে, —কিন্তু প্রধান প্রধান পরিকল্পনা যখন সরকারী খাতে হবে বলে মনে হচ্ছে তখন প্রশ্ন ওঠবার কথা নয়। রাজ্য সরকার তাই ক্ষুদ্রায়তন ও গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য এক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন কর্মীর প্রয়োজন যাতে আরো বাড়ে।

অগ্রিম অর্থ ও কলকব্জা প্রাপ্তির ব্যাপারে অপ্রত্যাশিত বাধা-বিলম্বের দরুন প্রথম-দিকে প্রকল্পটিকে অনেক ঝামেলা সামলাতে হয়েছে। ব্যাঙ্কের জাতীয়করণে অবস্থার একটু সুরাহা হয়েছে এবং যন্ত্রপাতির খরচ ও মূলধনের টাকা যোগাবার জন্য স্টেট ফাইনান্সিয়াল করপোরেশন কাজ করছে। 1971-72 সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্মল ইনডাস্ট্রিজ করপোরেশন-কে ভার দেওয়া হয়েছে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করবার।

এ যাবৎ (1973) পাঁচটি শিল্পাঞ্চল কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেগুলি হল কল্যাণী, বারুইপুর, হাওড়া, শক্তিগড় ও শিলিগুড়ি। কিন্তু বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে কলকাতার আশে পাশের তিনটি কেন্দ্র মাত্র। কাজের আরো বাধা হচ্ছে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহজে অপ্রাপ্য কাঁচামাল সরবরাহের অভাব—যেমন লোহা ও ইস্পাত সরবরাহ। তবু, সম্প্রতি এক নতুন ষোল-সূত্রী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে যাতে করে গ্রামাঞ্চলের ছোট শিল্প ও কুটির শিল্প উন্নত হতে পারে। প্রতিটি জেলা বা অঞ্চলকে এক বৎসরের লক্ষ্য-মাত্রা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সরকারী নথিভুক্ত ছোট শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা 1972 সালের জুন মাসে হয় 26,281,—1962-তে ছিল 3,517। রাজ্য সরকারের বর্তমান কাজ হল এগুলিতে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও বিজলী শক্তির সরবরাহ।

কুটির গ্রামীণ শিল্প

স্বাধীনতা প্রাপ্তির অল্পদিন পরেই যেসব স্থানে পরম্পরাগত কলা নৈপুণ্য কেন্দ্রীভূত হয়েছে তার একটা মোটামুটি তথ্য নেওয়া হয়। গ্রামীণ কুটির শিল্পের

যেগুলি বিশেষ মনোযোগের পাত্র বলে মনে হয়েছিল তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—অগ্রগণ্যতার হিসেবে—(1) তাঁত, রেশম ও রেশমগুটির চাষ, (2) কারু-শিল্প, যেমন—পেতল, কাঁসা, শাঁখের বালা, কামারের কাজ, ছুতোরগিরি, (3) কাঁচামাল-ভিত্তিক শিল্প, যেমন—মাদুর তৈরি, তৈল-নিষ্কাশন, খেজুর ও আখের চিনি, খেজুর, তাল ও আখের গুড, চামড়ার কাজ ও জুতা তৈরি, (4) হস্তশিল্প, যেমন—কৃষ্ণনগরের (মাটির) পুতুল, কাঠের খেলনা, বাঁশ ও বেতের তৈরি মাল, বোনা কাপড়ে নকশা অঙ্কন, চামড়ায় কারুকাজ, (5) মৃতপ্রায় ও অনুন্নত শিল্প, যেমন—নারকেলের ছোবড়ার আঁশ, লাক্ষা ও হাতের তৈরি কাগজ, আর (6) বিভিন্ন কারুকাজ, যথা—চারু মৃৎশিল্প, প্রয়োজনীয় ও চারুকলা সমৃদ্ধ কাঁচের কাজ ইত্যাদি। তালিকাটি সম্পূর্ণ নয়। এগুলি সমস্ত রাজ্যে ছড়ানো ছিল, সংগঠনের কোনো বন্দোবস্ত ছিল না—বিবেক বুদ্ধিহীন সুদখোর ও ব্যবসায়ীদের উপর কারিগরদের নির্ভর করতে হত। শুধু নিজেদের শিল্পের উপর ভরসা করে শিল্পীদের জীবন ধারণের শক্তি পূর্বের দু'শতকে ইংরেজ শাসকদের শোষণ নীতির ফলে ভীষণ ভাবে সীমিত হয়েছিল।

ব্যবস্থাপনার উন্নতি, কিছু কাঁচা মালের সরবরাহ, শহরে নগরে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন—এসবের দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই কারুশিল্পক্ষেত্রে ভালো ফল পাওয়া গেল। তুলা বা রেশমের বয়ন শিল্পও এসব ব্যবস্থায় লাভবান হল। ভারত সরকারের অল ইণ্ডিয়া হ্যানডিক্রাফট বোর্ড ও খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ ইনডাসট্রিজ কমিশন রাজ্যের বাইরেও বিক্রীর বন্দোবস্ত করায় প্রধানত হস্ত ও শ্রমশিল্প ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি দেখা যাচ্ছে। গ্রামীণ হস্ত ও কলা শিল্পের উন্নতি করা 1952 সাল থেকে কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম-এর একটি অংশ। 1956 সালের সংশোধিত কর্মসূচিতে কারিগরদের প্রয়োজনীয় নিম্নতম মূলধন ধার দেবার ব্যবস্থাই শুধু নেই, উৎপাদনের উৎকর্ষ সাধনের ব্যবস্থাও আছে। আর আছে গ্রামাঞ্চলের আরো লোক যাতে এই শিল্পে যোগদান করে সেজন্য শিক্ষা ও উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের বন্দোবস্ত। কামার, ছুতোর, দরজি, টালি-প্রস্তুতকারক ও বোনা কাপড়ের নকশাকারী ইত্যাদির কাজে সুফল দেখা দিয়েছে। বিশেষ একটা কাজ হয়েছে হস্ত-শিল্পে মেয়েদের শিক্ষাদান। শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কয়েকটি সমবায়-উৎপাদক সমিতি স্থাপন করেছেন। কর্মসূচিটির আবার নবরূপায়ণের চেষ্টা হচ্ছে।

এ সকল উন্নতিমূলক কাজ গ্রাম দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারদের কর্মসংস্থান তেমন ভাবে করে উঠতে পারেনি। প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনের উন্নত কর্মকৌশল, কাঁচা মাল ও গ্রামীণ শিল্পের ব্যাপক ব্যবস্থা—এসবের অভাবে কাজ এগুচ্ছে না।

প্ল্যানিং কমিশনের পরামর্শে রুরাল ইনডাসট্রিজ প্রোগ্রাম সংগঠিত করে 1963 সাল থেকে গ্রামীণ শিল্পায়নের এক ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। প্রথম দিকে কর্মসূচিটি পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিভিন্ন অংশে চালু করা হয়—বারাসত, তমলুক ও দার্জিলিং এ। সরবরাহকারী শিল্পের উন্নতিকল্পে পরে দুর্গাপুরে একটি সহায়ক

পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। এই কেন্দ্রগুলির 3,797টি বিভাগে (ছোট-শিল্পসহ) যেসব কারুশিল্পী ও যন্ত্রবিদরা চাকুরি পেয়েছেন তাঁদের সংখ্যা অন্যূন 28,000। সমবায় সংস্থা গড়ে তোলবার দিকেই বেশি ঝোঁক দেওয়া হয়েছে। এসব কেন্দ্রগুলিতে জেলা পর্যায়ে বিক্রী ও সাহায্যের জন্য সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠিত করা গিয়েছে। তারা প্রধানত সমিতিভুক্ত শিল্পীদের বস্তুগত প্রয়োজন মেটাতে ও গ্রামীণ ছোট, কুটিরশিল্পের সমস্যাগুলি দূর করবার জন্য কর্মসূচি প্রবর্তন করবেন, আর তার কার্যকারীতায় মনোযোগ দেবেন। 1973-74 সাল থেকে প্রযোজনাটি পুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুরেও চালু হবার কথা। গভর্মেণ্টের মতে ষোল-সূত্রী কার্যক্রম অনুযায়ী একবছরে 2,000 নতুন বিভাগ গঠন করার লক্ষ্যটি উৎসাহজনক ভাবে সফল হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদনে উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ শিল্প দ্রব্যের বিক্রীও বাড়তে থাকবে।

বিকেন্দ্রীভূত বিভাগে গ্রামীণ শিল্পের উন্নতি কাঁচা মাল সংগ্রহ ছাড়াও বিদ্যুৎ সরবরাহের বন্দোবস্তের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সুচিন্তিত সেচ ব্যবস্থাও বিদ্যুৎ-শক্তির মুখাপেক্ষী। বিদ্যুৎ ছাড়া সুষ্ঠু কৃষিকাজ সম্ভবপর নয়। 1970-71 সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট 1569.68 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হয়েছে, 1951 সালে ছিল মোট 546.17 মেগাওয়াট। রাজ্যময় ছড়ানো নতুন প্রকল্পগুলি থেকে 1981 সাল নাগাদ আরো 1480 মেগাওয়াট পাওয়া যাবে। একটি প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হল 1955 সালে গঠিত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড। বলা হয়েছে যে সবগুলি উৎপাদন কেন্দ্র থেকে প্রযুক্তি অনুযায়ী প্রাপ্ত বিদ্যুৎ 1970-71 সালের সম্পূর্ণ প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্রমশ সম্প্রসারণ হতে থাকা চাই, যাতে করে ক্রমবর্ধমান চাহিদাই মিটবে না, কিন্তু যন্ত্রশিল্প ও কৃষির দ্রুত উন্নতি সহায়তাও হবে।

কৃষি

কৃষি বিভাগে জরুরী প্রয়োজন হল খাদ্যশস্য উৎপাদন 33 শতাংশ বাড়ানো। একাজ সর্বাগ্রে করনীয়। জোত জমার সুবিন্যাস, সুচিন্তিত সেচ পদ্ধতি, যৌথ কৃষি, আধুনিক প্রয়োগ কৌশল, ভালো জাতের বীজ এবং দু'তিন ফসল চাষের দ্বারা এই উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি অপেক্ষাকৃত কম সময়ে পৌঁছানো খুব অসম্ভব হবে না, কিন্তু খাদ্যশস্যের ও পুষ্টিকর খাদ্যের বাড়তি সরবরাহ ও মাল-মজুদের সংস্থান করে রাখতে হবে। কারণ, জনসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, ভোক্তাদেরও রকমফের আছে। কৃষিজাত দ্রব্যের কেনাবেচার প্রথম স্থান হল নিজদেশে, যেখানে জনসংখ্যার অর্ধেক কৃষিজীবী নয়, অন্যতর কর্মের আয় থেকে তাঁদের খাদ্যদ্রব্য কিনতে হয়। সুতরাং সবদিক দিয়ে দেখতে গেলে, কৃষিশিল্পের উন্নতির প্রশ্নের সঙ্গে অধিকতর কর্মসংস্থানের প্রশ্নও জড়িত।

কৃষিশিল্প ও অন্যান্য যে কোনো অভ্যস্ত পেশার আধুনিক রূপায়নের বাধাবিঘ্নগুলি

গুরুত্বপূর্ণ, তাচ্ছিল্যের যোগ্য অবশ্যই নয়। সাবেকি ধ্যান ধারনা থেকে চাষীদের মুক্ত করে শস্য-ফলানোর নতুন নতুন পদ্ধতির দিকে তাঁদের আকৃষ্ট করবার জন্য ব্যাপকভাবে গণ-প্রচার যন্ত্রের মাধ্যমে—যেমন, খবরের কাগজে, রেডিওতে, ঘরোয়া প্রচারে—গণশিক্ষা জোরদার করা বিশেষ প্রয়োজন। এই প্রচার কার্য সফল করার জন্য গভর্মেন্টের উচিত চাষীদের মধ্যে উৎসাহ যোগাবার বন্দোবস্ত করা, যাতে করে নতুনকে স্বাগত করবার প্রেরণা তাঁদের মধ্যে জাগতে পারে। 1953 সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল এষ্টেট একুইজিশন এ্যাক্ট মধ্যস্বত্ব রায়তি লোপ করে রায়তদের সঙ্গে গভর্ণমেন্টের সরাসরী যোগাযোগ করার বন্দোবস্ত করেছে। কিন্তু প্রতিপত্তিশালী মধ্যস্বত্বাধিকারীরা আদালতে এই আইনটির প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যেন তেন প্রকারেণ এটি কার্যকরী করতে বহু দেরি করিয়ে দিয়েছে। আইনটির প্রধান ত্রুটি হল বর্গাদার বা ভাগ-চাষীদের এর সুফল থেকে বঞ্চিত করা। তাঁদের রায়তি বরাবর জমিদারের খেয়াল মাফিক। প্রেসিডেন্টের এক সাম্প্রতিক আদেশে অবস্থার সুরাহা হয়েছে। এই আদেশ অনুযায়ী ফলিত শস্যের 75 শতাংশ বর্গাদার পাবেন। যেখানে তাঁরা শুধু কৃষি-শ্রমিক মাত্র, সেখানে পাবেন 50 শতাংশ, বর্গাদারী-স্বত্ব স্থায়ী হয়ে গেলে (রায়তদের মতো মালিকানা-স্বত্ব নয়) এই বর্গাদারী স্বত্ব উত্তরাধিকার সূত্রে বর্তাবে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল এষ্টেট একুইজিসন এ্যাক্ট মালিকানা জমির ঊর্দ্ধ পরিমাণ 25 একরে ঠিক করে দিয়েছে। উদ্বৃত্ত জমি স্থানীয় লোকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে যাঁদের জমিজমা নেই বা দু' একরের কম আছে তাঁদের মধ্যে। রিপোর্ট অনুযায়ী 5.9 লাখ একর জমি দখলে নেওয়া হয়েছে এবং 3.5 লাখ একর পত্তন করা গিয়েছে। 1967 সাল থেকে গভর্ণমেন্ট বেনামী অধিকার (মিথ্যা নামে হস্তান্তর করে প্রাপ্তি) দূর করবার চেষ্টা করছিলেন। ফল মোট.মুটি ভালো—এতে 4.5 লাখ একর জমি সরকারী দখলে এসেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ মতো জমির মালিকানায় ঊর্দ্ধসীমা হল 5 হেকটার (12.4 একর) সেচ জমি, আর 7 হেকটার অন্য জমি। বর্গাদাররা এখন ঊর্দ্ধসীমা বাঁধায় উদ্বৃত্ত জমির মালিকানা স্বত্ব পেলেন।

ভূমি-আইন সংস্কার কার্যকরী করা বড় জটিল কাজ বলে দেখা গেছে। এই সংস্কারপদ্ধতি মতে সরকার সক্রিয়ভাবে গরীব, অশিক্ষিত আর ভীতি-বিহ্বল বর্গাদারদের পক্ষ নেবেন—যাঁদের এমন টাকা নেই যে আইনগত প্রতিবিধান চাইবেন, বা উচ্চাঙ্গের কৃষি-কাজের উপাদানের সংস্থান করবেন। আর একটা মুস্কিল হল—জমির খণ্ড খণ্ড গঠন। এটা রায়তদের সেচ ও অন্যান্য বিষয়ে সাজসরঞ্জামের বিধিব্যবস্থার পথে একটা বাধা। সমবায়িক ভিত্তিতে কৃষিকাজ প্রয়োজনীয়—যাতে করে সবুজ বিপ্লব বা শস্যের অমিত বৈভবকে সমাজতান্ত্রিক ন্যায়ানুগ বলা যেতে পারে। সমবায়িক কৃষির একটা নমুনা বীরভূম জেলায় বেসরকারী প্রচেষ্টায় সফল হয়েছে।

পরিশেষে এবিষয়ে একটা বিশেষ ভাববার কথা আছে। পশ্চিমবঙ্গে শিল্পসংস্থায় কর্মসংস্থান চিরদিনই শুধু বাঙ্গালীদের জন্যই নয়, অন্য রাজ্য থেকে আগন্তুকদের

জন্যও খোলা থেকে এসেছে। এ ধারাটা সম্ভবত চলতে থাকবে যতদিন না ঐ রাজ্যগুলির অর্থনৈতিক অবস্থা তথাকার লোকদের ভিন্ন রাজ্যে গমনের প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেয়। সুতরাং পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি, বিশেষ করে শিল্পসংক্রান্ত উন্নতি, সমগ্র জাতির কাম্য। এতে জাতীয় বেকার সমস্যার সুরাহা হবে, আর হবে মোট উৎপাদনক্ষেত্রে সমৃদ্ধি। রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় এটা বিশদভাবে দেখা উচিত হবে যে সর্বত্রই শ্রমের ফল নিরপেক্ষভাবে যথার্থ ফলোৎপাদনকারীদের হাতে পৌঁছায়।